ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ

মোঃ জাহিদুল কবীর

সংগীত বিভাগ

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

mwPcÎ

ভুমিকাঃ ২-৪

c_g Aa¨vq: 5-53

ভাটিয়ালী গানও এর পরিচয়- ৫-২০। ভাটিয়ালীর সংজ্ঞা ও নামকরণ- ২১-৩১। ভাটিয়ালী সঙ্গীতাঞ্চল, বিবর্তন ও শ্রেণিবিন্যাস- ৩২-৫৩।

wØZxq Aa¨vq : 54-80

তুলনামূলক আলোচনা : ভাটিয়ালী ও অন্যান্য ধারার গীতরীতি- ৫৪-৬৬। গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনে রচিত ভাটিয়ালী গান ও এর গঠন- ৬৭-৮০।

ZZxq Aa¨vq : 81-119

ভাটিয়ালী গান উদ্ভবের পটভূমি- ৮১-৯৮। ভাটিয়ালী গান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ- ৯৯-১১২। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে ভাটিয়ালী গানের স্থান- ১১৩-১১৯।

PZ_ Aa¨vq : 120-155

বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনা ও ভাটিয়ালী গান- ১২০-১৪৩। ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য- ১৪৪-১৪৯। ভাটিয়ালী গানে ভাষা ও স্বরের প্রয়োগ- ১৫০-১৫৫ ।

cÂg Aa¨vq : 156-229

ভাটিয়ালী গানের বিকাশ, সুর ও রাগ রূপের পরিচয়- ১৫৬-১৭৫। ভাটিয়ালী গান সংগ্রহ ও স্বরলিপি সংযোজন- ১৭৬-২২৯ ।

Iô Aa¨vq : 230-243

ভাটিয়ালী গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র- ২৩০-২৪২। ভাটিয়ালী গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার- ২৪২-২৪৩।

mßg Aa¨vq : ২৪৪-২৪৫

উপসংহার- ২৪৪-২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভাটিয়ালী গানের ব্যাপক প্রচলন। যদিও বাংলার মানচিত্র আজ আর পূর্ণাঙ্গ নেই। তার অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে অনিবার্য কারণে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশে যখন বৃটিশ সম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ঘটে ঠিক সেই সময় দ্বি-জাতি নামক এক তথাকথিত তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশ যুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। আর পূর্ববাংলার ভূখণ্ড সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হয় পূর্ব পাকিস্তান নামক অবিধায়। ১৯৫২ এ ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলা পুনরায় শোষক পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাসের এমন পরিবর্তন ও পুনর্নির্মাণের জন্য বাঙালি জাতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে লাখো প্রাণ। মুঘল আমল থেকে শুরু হয়ে বৃটিশ ভারতে বাংলা একটি বিশাল প্রদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় অর্জন করেছিল।

এই বৃহৎ বাংলার পূর্বাংশ, পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা নামে পরিচিত ছিল। এ অংশের বিভিন্ন জায়গা যেমন রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে বাংলার গৌরবময় লোকসাংস্কৃতিক বলয়। এ ছাড়াও সিলেট, ত্রিপুরা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষিভিত্তিক ও নানা ধর্মের সহাবস্থানে গঠিত সমাজেও বেড়ে উঠে ছিল গৌরবময় সাংগীতিক ঐতিহ্য। এ দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জাতীয় সীমাবদ্ধতার সময়েও সংস্কৃতির ধারাগুলো নিজ নিজ পথে ধাবিত হয়েছে। উদ্ভব পরবর্তী সময়ে কালের প্রবাহ ও বিবর্তনের ধারায় এ সব লোকসংগীত পরিশীলিত রূপ লাভের মাধ্যমে আরও উন্নততর সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিণত হয়। পরিবেশের ঔদার্য্য আর জীবন চেতনার সমন্বয়ে গঠিত এসব লোকসংগীত সুর ও ভাষাগত দিক থেকে অর্জন করেছে বিশিষ্টতা। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, পালাগান ইত্যাদি গীতরসের ধারায় আমরা এর পরিব্যাপ্তি লক্ষ্য করি। কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত কিছু হালকা গানে এবং সৌখিন গীতি রচয়িতাদের গানে যে কথ্য ভাষার ব্যবহার ও সুরের প্রচলন দেখা যায় তাতে গ্রাম-বাংলার নিজস্বতার ছাপ পাওয়া যায়।

নদীমাতৃক এ বঙ্গভূমির শিরায় শিরায় যে জলের ধারা প্রবহমান তা একদিকে যেমন এ দেশের কৃষিভূমিকে উর্বর করেছে তেমনি জলীয় আবহে বেড়ে ওঠা এ দেশের মানুষের মনে যুগিয়েছে শান্ত ও স্নিগ্ধ ভিন্নমুখী চিন্তা-চেতনার খোরাক। মানব জীবনের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত চিন্তা, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের

কাহিনি, সুখ, দুঃখ, ধর্মীয় অনুভূতি, আধ্যাত্মিক চেতনা সবকিছুই যেন নদীর নিরন্তর বয়ে চলা প্রবাহের মত। নদীর মত চলতে থাকা এই অনুভূতিগুলো মানুষকে ভাবিয়েছে বারবার। বাংলা লোকসংগীতে মানব মনের সার্বিক অনুভূতির সমন্বয়ক এমনই একটি জনপ্রিয় গীত ধারার নাম ভাটিয়ালী গান। ভাটিয়ালী উচ্চ শব্দযুক্ত সুরশৈলী ও গায়নরীতি যা বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রসারিত। নদীর উজান ভাটির সঙ্গে ভাটিয়ালী গানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উজানে নৌকা বা বৈঠা বাইতে নৌকার মাঝির অনেক বেশি শ্রম যায়। আর ভাটির টানে নৌকা চালানোর সময় মাঝিকে শুধু হাল বা হাইল ধরে বসে থাকলেই চলে। যার ফলে এই অবসর সময়ে মানুষের মনের যোগাযোগ ঘটে তার জীবনের ফেলে আসা সময় ও অধ্যায়ের সাথে। অন্যদিকে জীবনের শেষ সময় অর্থ্যাৎ যে সময়ে সমগ্র জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ করার বিষয়টি সামনে এসে উদয় হয়, ভাটিয়ালীকে সেই বিশেষ সময়ের মানব মনের সহজ-সরল অনুভূতির বহিঃপ্রকাশও বলা যায়। জীবন অথবা নদীর উজানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভাটিয়ালী গানে যে চিত্রকল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা কেবলমাত্র গীতরসের উপাদান নয়, এটি সুলিখিত ইতিহাস, বাঙালির চিরায়ত লোকদর্শন এবং সাহিত্যও বটে।

বাংলা একাডেমী প্রণীত 'বাংলা বানান-অবিধান'এ 'ভাটিয়ালী' বানানের ক্ষেত্রে 'ট' ও 'ল' দুটোতেই ি-কার ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গবেষকগণ ব্যবহৃত ও বহুল প্রচলিত এ-কারণে আমার গবেষণাপত্রে ভাটিয়ালী বানানে 'ল' এর ক্ষেত্রে ী-কার ব্যবহার করেছি।

ভাটিয়ালী গানে মানব মনের চিন্তা চেতনার ভাষাগুলো রূপক অর্থে কিংবা প্রতীকী রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সাধনার কথা এখানে অনেক সহজ-সরল ভাবে ফুটে উঠেছে। রূপক-প্রতীকের ভাষায় তত্ত্বারোপ এ গানে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ভবসংসারের যন্ত্রণা হতে মুক্তি কামনায় সৃষ্টিকর্তা, দয়ালগুরু, মুর্শিদের চরণাশ্রয় কামনা করে এ গানের সুর রচিত হয়েছে। এর ফলে ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে বাউল-সুফি-বৈষ্ণব ধারার গানের একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। যার কারণে বাংলা গানের প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান সময়ের প্রায় সকল প্রকার গীতধারার সঙ্গে কোন না কোন পর্যায়ে ভাটিয়ালী সুরের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষের মন যখন একাকিত্ব ও শূন্যতার মর্মপীড়ায় ভুগেছে ঠিক সেই সময় তার কণ্ঠে কথা ও সুরের যুগল মিলনে এটি গীত হয়েছে। ভাটিয়ারী নামক রাগ প্রাচীন সংগীত ধারায় বেশ জনপ্রিয় ও একটি পরিচিত নাম। গবেষকদের ধারণা চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যা ভাটিয়ারী রাগ নামে পরিচিত

ছিল, পরবর্তীতে তা ভাটিয়ালী সুর বা গান নামে পরিচিতি পায়। ভাটিয়ালী গানের বিষয়, পরিবেশ, রূপক-প্রতীকের ব্যবহার, সুর-লয়, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি যে সরাসরিভাবেই নদী-নৌকা, মাঝি-মাল্লার জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সেটি বলা যায়। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি এমনকি বাংলা গানের আধুনিক ধারার গীতরীতির সূচনা ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ পঞ্চ-গীতিকবির গানে এই ভাটিয়ালী সুর বা গীতরীতির প্রভাব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

c_g Aa¨vq

fwUqvjx Mvb I Gi cwiPq

আমাদের সঙ্গীত চর্চার সঠিক উৎসটি ঐতিহাসিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভাবে এখনও পর্যন্ত অনাবিস্কৃত থেকে গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ দুই ধারার সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যাবৃত। এ কারণে আমরা বিভিন্ন লৌকিক উপাখ্যান ও কল্পকাহিনির উপর নির্ভর করে মানুষ প্রথমে কিভাবে গান গাইতো তা বের করার চেষ্টা করেছি। তবে সঙ্গীতের সুর ও বাণীর মত এ সকল কল্পকথাও বাস্তব ঘটনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর হাজার বছর ধরে এ ধরনের কল্পকথার ভিত্তিমূল আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে। সঙ্গীতের উৎপত্তি নিয়ে প্রাচীন এ সকল ধারণা হয়তো আজকের দিনে মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। সনাতন ধর্ম মতে তারা বিশ্বাস করেন যে, সঙ্গীত স্বর্গীয়, সঙ্গীতের চর্চা বা সাধনা করা স্বর্গীয় কর্মধারারই অংশ। এর মাধ্যমে আপনাকে বা আপন হৃদয়কে অলৌকিক ও অবিনশ্বরতার সাথে যুক্ত করা সম্ভব। এক মাত্র ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ সঙ্গীতের স্রষ্টা নন। হিন্দু পৌরাণিক মতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাই স্বয়ং সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছেন।[১] ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'দি ইউনিভার্সেল হিষ্ট্রি অব মিউজিক' গ্রন্থে স্যার এস. এম. ঠাকুর বলেছেন- হিন্দুদের কাছে সঙ্গীতের উৎস স্বর্গে। বস্তুতঃ স্বর্গেরই স্বরূপ বলে বিবেচনা করা হয়।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে পৃথিবী ও ভূ-মৃত্তিকা সৃষ্টির পূর্বে মহাশূন্যে ধ্বনি তরঙ্গের সমষ্টি তরঙ্গায়িত হতো। সনাতন ধর্ম বিশ্বাসে স্রষ্টা ব্রহ্মা, ত্রাণকর্তা বিষ্ণু ও ধ্বংশের দেবতা মহাদেব এই তিন দেবতা যে কেবল মাত্র সঙ্গীতকে ভালোবাসতেন তাই-ই নয়, এরা নিজেরাও হলেন একেকজন সঙ্গীতজ্ঞ। বিষ্ণু এক হাতে ধারণ করতেন শঙ্খ। তরঙ্গ যন্ত্রের আদি রূপ 'পিনাক' এর স্রষ্টা মহাদেব স্বয়ং, সনাতনী সঙ্গীতের পাঁচটি আদিরাগ তাঁরই পঞ্চমুখ এবং ষষ্ঠ রাগটি তাঁর স্ত্রী পার্বতীর মুখ হতে নিঃসৃত। রাগগুলোর নাম ও সনাতন ধর্ম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো যথাক্রমে শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ এবং নটনারায়ণ। সঙ্গীত চর্চার ধারাবাহিকতায় কালে কালে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির আশ্রয়ে এসে সঙ্গীতের এ উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে আরো রসালো গল্প ও কল্প-কাহিনি যুক্ত হয়েছে। বর্ণিত আছে একদা ব্রহ্মা আক্ষেপ করে বলেছিলেন- এ কথা সত্যি যে আমি সব নয়নাভিরাম ও মুগ্ধকর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছি এবং সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছি সুন্দরের এই সমারোহ। অথচ আমার সন্তানেরা, বিশ্বচরাচরের এই মানবেরা এসব সৌন্দর্যকে অবলোকন ও উপলব্ধি না করেই পথ পরিক্রমণ করে। তাদের পারিপার্শ্বিকতার এই নৈসর্গিক রূপসুধা তাদের হৃদয়ে কোন আবেদনই জাগায় না। যেন এ সবই তাদের জন্য অপচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার এই আক্ষেপকে যথার্থভাবে অনুধাবন করলেন এবং ব্রহ্মাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি মানুষের হৃদয়ে সেই অনুভূতির অনুরণন ঘটাবেন, যা দিয়ে মানুষ এই চেতনাকে অনুভব করবে এর মূল্যায়ন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। এ কারণেই দেবী সরস্বতীর হাতে ললিতকলার প্রতীক 'বীণা' সংস্থাপন করেছেন তাঁর ভক্ত ও পূজারিগণ। তবে এই প্রচলিত কাহিনি কল্পকথা হলেও মানুষের মনে হাজার হাজার বছর ধরে তা বিশ্বাসের বীজ বপন করে চলেছে। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তি যত বেশি শক্ত আকার ধারণ করেছে, ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানবার পথ তত বেশি দুরূহ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন যুগের মত মধ্যযুগেও সঙ্গীতের উৎপত্তি ও চর্চার উপর মানুষের এ বিশ্বাস একই রকম থাকার ফলে বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস জানবার বিষয়টি মসৃণ হয়ে উঠেনি। সংস্কার বিরোধী হয়ে অনেকে এ বিষয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনে এগিয়ে আসলেও ধর্ম বিচ্যুত হওয়ার ভয়ে বা সন্দেহে তারা আর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে এ বিষয়ে যত অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে তার বেশিরভাগই হয়েছে পাশ্চাত্যে। সে হিসেবে ললিতকলার উদ্ভব ও বিকাশের যে ধারা তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রায় একই রকম। এ ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণে সঙ্গীতের উৎপত্তি বিষয়ক সংজ্ঞা, তত্ত্ব কিংবা ব্যবহারিক দিকটি পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের মত গ্রহণযোগ্য হলেও সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে এ ধারণা সব সময় চূড়ান্ত মত বলে স্বীকৃতি পায়নি। যুগে যুগে নানা মনিষী ও সঙ্গীতজ্ঞ হতে পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের অনেকেই প্রদত্ত মতামতকে শতভাগ সত্য বলে দাবী না করার ফলে, এ ধরনের মতবাদকে কখনও আংশিক সত্য বলেও মেনে নেয়া হয়েছে। তবে এটা সত্য যে সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিবৃত্তটি এ ধরনের এক অর্ধ-সিদ্ধ ও অর্ধ-স্বীকৃত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম সংজ্ঞা বা ধারণাটি হলো- জীবজন্তুর স্বর বা চিৎকার অবিকল নকল করার প্রবণতা থেকেই মানুষ গাইতে শিখেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মতবাদের আংশিক মেনে নিয়েছেন তবে পুরো তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে এ কথা সত্য যে বহু পাখিই গান গায় এবং তাদের অনেকগুলোই মানুষের মনে দোলা দেয়। তাই বলে এসব পাখিকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায় না। স্তন্যপায়ী প্রাণীর গঠন ও উপাদান মানব জাতির নিকটতম। তারা হয়তো নাকিসুরে কাঁদে, শিস দেয়, গর্জন করে। মানুষের নিকটতম প্রাণী বানর ও হনুমান ঘোৎ ঘোৎ করে এবং কাশে। কিন্তু এ জাতীয় প্রাণী বুলবুলি বা কোকিলের মত ডাকে এমনটি শোনা যায়নি। সুতরাং সঙ্গীতের উৎপত্তি যে পশু-পাখির ডাকের থেকে এসেছে একচেটিয়াভাবে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় মতবাদটি এসেছে একজন জীব ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর থেকে। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বলেছেন- বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে যৌনাকর্ষণ করার চেষ্টা তথা যৌন মিলনের বাসনা থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। তিনি মনে করেন বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে যৌন মিলনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। কিন্তু ডারউইনের এই মতবাদকে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তেমন আমলে নেননি। তাদের মতে সৃষ্টির আদিতে মানুষের সঙ্গীতে যৌন আবেগের বিষয়টি তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারিনি। প্রাচীন কালে এখানকার সঙ্গীতের মধ্যে যৌনাবেগমূলক বিষয়াবলীও তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

তৃতীয় মতবাদটি এসেছে কয়েকজন বিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টা বা ধারণা থেকে। তার মধ্যে ফরাসী বিজ্ঞানী জ্যাঁ জাক রুশো, ইংল্যাণ্ডের হার্বার্ট স্পেনসার এবং ইটালীর সঙ্গীতবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের সমর্থন করেন। তাদের মতে 'উচ্চকণ্ঠে কথা বলার প্রবণতা থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি' পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এ ধরনের কথা প্রধান গান বা একটানা সুর সহযোগে পড়বার রীতি প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, এ ধারা প্রাচীন মানুষের কথা বলবার রীতি হতে উৎসারিত হয়েছে। কারণ এ জাতীয় গানে কিছু অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত হয়েছে যেগুলো কেবল কথা বলার সময় অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উচু স্বরের শব্দ বা শব্দাংশে এক সময় সুর যুক্ত হয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপনার ফলে তা ভালোলাগার উপাদানে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে সঙ্গীতরূপ ধারণ করে।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কিত পঞ্চম ধারণাটি এসেছে এর মধ্যে ব্যবহৃত লয় বা তালরূপের উপর ভিত্তি করে। সঙ্গীত বিজ্ঞানী ওয়ালাসচেক তাঁর 'primitive music'(প্রাচীন সঙ্গীত) গ্রন্থে বলেছেন- 'প্রাচীন মানুষের একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই লয় দিয়েছে সঙ্গীতের জন্ম' জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল বুকার তাঁর 'Arbeit and Rhythmus' গ্রন্থে বলেছেন- সমষ্টিগত কাজের সুবিধার জন্যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল। পেশাগত কাজের ধ্বনি বা লয়ই এর উৎস। তবে কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন মানুষের জীবনে কোন বিষয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি এসেছে অনেক পরে। কিন্তু সঙ্গীতের উদ্ভব ও বিকাশ সভ্যতার আদি থেকেই যুক্ত ছিল। পেশাগত জায়গায় কেবলমাত্র সঙ্গীতের আলাদা আলাদা ধারা বা ঘারানার জন্ম হওয়া সম্ভব, কিন্তু সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভব কি না সে বিষয়ে অনেকেরই ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের দেশে পেশাগত সঙ্গীত হিসেবে সারি, ধামাইল, মালজোড়া, জারি ইত্যাদি গীতরীতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তবে সভ্যতার বিকাশের অনেক পরে এ ধরনের গানের উৎপত্তি।

এর পরবর্তীতে ফাদার ডব্লিউ স্মিথ এবং কার্ল স্টাম্ফ সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে পঞ্চম মত হিসেবে বলেছেন- শব্দের মাধ্যমে ভাষা বা ভাবের আদান-প্রদানের ফলেই সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। চিৎকার বা উচ্চশব্দ সঙ্গীতকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনেকক্ষণ আটকে রাখে বা দীর্ঘস্থায়ী করে ফেলে। স্টাম্ফের মতে সঙ্গীতের উৎপত্তির মূল বিষয় ছিল শব্দ তরঙ্গের বিভাজন করার মত ক্ষমতা অর্জন করা এবং সে উপযোগী কয়েকটি পর্দা বা স্কেল কিংবা স্বরের মাধ্যমে সেগুলোর স্থান নিরূপণ করা। এরপর প্রয়োজন মত নিজ মনের অভিব্যক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে কথা বা সুর বসিয়ে তা গানে পরিণত করা। এভাবে সুর, কথা ও স্বরের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ঘটে। তিনি আরো বলেছেন নারী ও পুরুষের একসাথে শব্দ করার মাধ্যমে নতুন শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ সকল শব্দ তরঙ্গ একসাথে বা পরপর সাজিয়ে উচ্চারণ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলে একটি সুরের রূপ ধারণ করবে।

অনেকে মনে করেন সঙ্গীতের জন্ম ভাষার জন্মেরও অনেক আগে। সঙ্গীত বা গানের শুরু মানুষ যখন গান গাওয়ার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করলো, ঠিক তখন থেকে শব্দের এমন সঙ্গীতরূপে প্রকাশ বলে অনেকে মনে করেন। নির্দেশ, আনন্দ, বেদনা, উত্তেজনা, ভাবাবেগ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে মানুষ শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হলো। পশু-পাখির ডাকের মত বা কণ্ঠে সৃষ্ট যেভাবেই হোক না কেন প্রাচীন এ শব্দ আদান-প্রদান পদ্ধতি মানুষের মনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে ছিল। প্রথম দিকের এসকল গান বা কথা কর্কশ থাকলেও মানুষের বড় ধরনের অংশগ্রহণের ফলে তাতে এক সময় নতুন নতুন শব্দের সংযোজন ঘটে। মানুষের কণ্ঠস্বরে আসে আরো বেশি বৈচিত্র্য ও গতি। ভাবের আদান-প্রদান এক সময় সামাজিক সমঝোতায় পরিণত হলো। আদি মানুষের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা আর পশু-পাখির ডাকের অনুকরণ প্রবণতাই এক সময় সঙ্গীতের উদ্ভব ও বিকাশের মূল কারণ হয়ে উঠে বলে অনেকে মনে করেছেন।

ভাষার মাধ্যমে শব্দাবলির গুরুত্ব যখন মানুষ বুঝতে পারলো, তখন বিভিন্ন যন্ত্রের আঘাত কিংবা মানুষ সৃষ্ট শব্দের পাশাপাশি কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে লয় সৃষ্টির সূচনা করলো এবং তা কাজে লাগাতে শুরু হয়। কণ্ঠ স্বরের পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজেকে আকর্ষণকরাসহ পরিবেশনায় আরো বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হলো। শব্দ পর্দার এই বৈচিত্র্য, উচু-নিচু, ফিস-ফিসানী ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানুষকে সঙ্গীত সৃষ্টির পথে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে তোলে। ভাষা সৃষ্টির পূর্বে মানুষ যে গান পরিবেশন করতো তা অর্থপূর্ণ ছিল না। তবে সুরে আন্দোলিত হওয়ার পর হতেই মানুষ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এ সকল পরির্তনশীল

স্বরের সাথে নিজ মনের আবেগ, অনুভূতিকে যুক্ত ও প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হলো। যখন কোন নতুন শব্দ তারা পেত সে শব্দের চর্চা করার জন্যে উচ্চশব্দে চিৎকার করতো। আবার কখনও আবেগে স্বরের একেবারেই খাদে চলে আসতো। এভাবেই অর্থহীন শব্দকে আবেগের মাধ্যমে উপভোগ্য করে তুলতো। পরবর্তীতে আদিম মানুষের এই আবেগ প্রকাশের পদ্ধতিকে বলা হয় 'আবেগ উৎসারণ পদ্ধতি'[৩]। এই পদ্ধতির আলোকে আদিম মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শব্দ পর্দার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বিষয়ে একটি ধারণা লাভ করলো। তখন শব্দ পর্দার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও ভাষা বা আবেগ সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞাত। তবে কোথাও অর্থপূর্ণ শব্দের সন্ধান খুঁজে পেলে তারা আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়তো। একটি সংক্ষিপ্ত ও অসঙ্গত উপায়ে তারা দুরত্ব ভিত্তিক শব্দ পর্দার পরিবর্তনের মাধ্যমে বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাতে সুরারোপ করে ভাবের আদান-প্রদানে সক্ষম হলো। এটিকে সঙ্গীতের প্রাচীন ধারায় 'সাম গানের' উৎপত্তিস্থল হিসেবে অনেকে মূল্যায়ন করেছেন। এ সময় কথা, শব্দের কিংবা সুরের মাঝামাঝি যে বিরতির প্রয়োজন সে সম্পর্কেও প্রাচীন মানুষ ধারণা লাভ করে। কাল পরম্পরায় এগুলোই সুরের সমন্বিত রূপ ও পর্দা সমষ্টি হিসেবে পরিচিতি পায়। 'আধুনিক সাঙ্গীতিক পরিভাষায় আমরা যাকে স্বরগ্রাম বলে থাকি'।[৪] মনের ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা বা শব্দের সন্ধান মানুষ পেলেও তাতে সুর বসিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে আরো অনেক সময় লেগেছে। সুর সম্পর্কে মানুষের এই অভিজ্ঞতা তাকে সরাসরি সঙ্গীত রূপায়ণে সক্ষম করে তোলেনি। তবে এর ফলে সঙ্গীতের যে চারিত্রিক লক্ষণ যেমন সুর, তাল, লয় এ সম্পর্কে মানুষ বাস্তবমুখী ধারণালাভে সক্ষম হয়। আজকের দিনে আমরা যে সঙ্গীতের চর্চা করি তার পিছনে হাজারো সঙ্গীত সাধক ও স্রষ্টার ভূমিকা রয়েছে। যুগান্তরের পরিক্রমায় যে সঙ্গীত বর্তমান রূপ লাভ করেছে তার ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের। এর জন্য একক কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কোন ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয় নয়। শক, হুন, পারসী, গ্রীক, পাঠান, মোঘল ইত্যাদি একাধিক সম্প্রদায় এখানে এসেছে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। 'এমনকি আর্যদের আসার আগেও এই উপমহাদেশে অনেক বহিরাগত জাতি এসেছে'।[৫] কেউ এখানে এসেছে এখান থেকে সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আবার কেউ এখানে এসেছে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। এখানকার মানুষের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ও হয়েছে। দেশ ছেড়ে আসার সময় তাদের সঙ্গে করে আনা সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে এখানকার মানুষের উপর। বাইরের সংস্কৃতির সাথে এখানকার সংস্কৃতি যুক্ত হয়ে নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় যে প্রায় চার ধরনের জাতি বা মানব গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে এই উপমহাদেশে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১. নিগ্রোয়েড ২. অষ্ট্রালয়েড ৩. মঙ্গোলয়েড ৪. ককেশিয়ান।

ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষ বসবাসের হিসাব করলে দেখা যায় যে, এখানে মানুষের আনাগোনা ঘটেছে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বছর আগে থেকে। তবে সঙ্গীত চর্চা কিংবা সভ্যতার জন্ম হিসাব করলে সিন্ধু সভ্যতার সূচনা থেকেই তা কল্পনা করা যেতে পারে। সঙ্গীতের উদ্ভবের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বা ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি সেগুলো হলো সিন্ধু সভ্যতারই অংশ। কিছু কিছু স্থানে পারসীয় ও গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন শিলালিপি, গুহাচিত্র, এবং মন্দিরগাত্রে খোদিত নৃত্যগীত সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য, বাদ্যযন্ত্রের চিত্র, নর্তক-নর্তকী ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজনের এসব পোড়ামাটির ফলক এখানকার প্রাচীন সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করে। দক্ষিণ ভারত ও পাকিস্তানের গান্ধারা অঞ্চলে মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত পাথরের খোদাই কাজ থেকে, দাক্ষিণাত্যের পর্বত, মন্দির গাত্র ও গুহা থেকে বাঁশি বা ঢোল বাদনরত ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। সিন্ধু যুগের বিভিন্ন সীলমোহর ও মৃৎপাত্রের গায়ের নক্শা থেকে এখানকার সঙ্গীতের উৎসভূমি নিরুপণে অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে জানার একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিপুল সংখ্যক বই ও পাণ্ডুলিপি। এ সকল গ্রন্থ হিন্দু সঙ্গীতের সৌন্দর্য এবং দর্শন, বৈদিক সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং রাগ সঙ্গীতের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এ ধরনের বইয়ের মধ্যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', মাতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী', নারদের 'নারদ শিক্ষা', ২য় নারদের 'সঙ্গীত মকরান্দ', সারঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর', ও লোচনের 'রাগ তরঙ্গিণী'। প্রাচীন ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র যেমন ঋক্বেদ রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি রাম ও সীতার দুই পুত্র লব ও কুশকে চিত্রিত করা হয়েছে সঙ্গীত পরিবেশনরত অবস্থায়। মহাভারত সহ প্রাচীন যে সকল যুদ্ধনির্ভর কাহিনির আমরা সন্ধান পাই তার প্রায় সর্বত্রই বিশেষ বাদ্য-বাদনের বা ড্রাম আকৃতির ঢোল ব্যবহারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও তামিল সাহিত্যে প্রাচীন এই বাদ্য ও গীতরীতির উল্লেখ আছে। তামিল গ্রন্থ পূরান্নানুরু পাট্ট-পাট্টু, পারিপাদল, শিলাপাদিগারাম, টিভাকারাম ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।[৬] এখানে সঙ্গীতের পদ্ধতি, প্রয়োগ, স্বর ও ভাষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মধ্য ও প্রাচীন যুগের সঙ্গীতের ইতিহাস অনেকটা হিন্দু ধর্মনির্ভর হওয়ার ফলে অনেকের মতে সঙ্গীতের বিস্তারিত কোন ইতিহাস এ সকল পুস্তক থেকে পাওয়া যায় না। যার কারণে শুধুমাত্র কথার চলন উদ্ধার করা সম্ভব হলেও প্রাচীন সেই মূলধারার গান আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। পরবর্তীতে উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের ক্রম-ইতিহাস কিছুটা হলেও রচিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে জৌনপুরের শেষ সুলতান হোসেন শাহ্ শারকীর পিতামহ সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ শারকী কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত শিরোমণি'

(১৪০১-১৪৪০) এতে তৎকালীন সঙ্গীত পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ সময়ের আরো একটি মূল্যবান সঙ্গীত গ্রন্থ হলো 'লাহজাতই সিকান্দার শাহী' (সিকান্দার শাহের ছন্দোময় কবিতা) সিকান্দার লোদীর সময়ে তাঁরই নির্দেশে বইটি রচিত হয়। বলা হয়ে থাকে পার্সী ভাষায় রচিত এটিই সর্ব প্রথম সঙ্গীতের পুস্তক। এটির রচয়িতা হিসেবে হাম্মাদ নামক কবির নাম জানা যায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন তিনি ইয়াহিয়া কাবুলী নামেও পরিচিত ছিলেন। এটির পাণ্ডুলিপি লক্ষ্ণৌয়ে এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়।[৭] সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে 'নাগমাতুল অসরার' নামে সঙ্গীত গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে লিখিত হয়। শের মোহাম্মদ খান রচিত মিরাতুল খেয়াল, শাহ্ নাওয়াজ খান রচিত মিরাতই আবতাবনামা, সম্রাট শাহ্জাহানের সময় নিশাত আরা, মীর্জা খান রচিত 'তোয়েফাতুল হিন্দ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত গ্রন্থ। এ সকল বইয়ে সঙ্গীতের প্রয়োগ বা ব্যবহারিক দিকের বর্ণনাসহ এ সম্পর্কীয় নানা বিষয় আলোচনায় এসেছে।

সব যুগেই মানুষ তার নিজের মত করে বেঁচে থাকার ও আনন্দ লাভের মাধ্যম হিসেবে কোন না কোন বিষয়কে আশ্রয় করে নিয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসের ধারণা অনুসারে প্রস্তর যুগ একটি দীর্ঘ সময় ধরে মানব সভ্যতা বিরাজমান ছিল। শেষের দিকে এর বিবর্তন দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দের দিকে সিন্ধু উপত্যকায় নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। সঙ্গীত চর্চার প্রাথমিক স্তর হিসেবে যে উপাদানটিকে আমরা প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে পাবো তাকেই উপমহাদেশের প্রাচীন গীতশৈলী বলে ধরে নেবো। সিন্ধু সভ্যতায় মানুষের জীবন ছিল মূলত শহর কেন্দ্রিক। কিন্তু নীল নদের সভ্যতা ছিল অনেকটা গ্রামীণ। এ কারণে সিন্ধু সভ্যতায় সাংস্কৃতিক বিকাশ ও প্রকাশের কিংবা চর্চার পথ ছিল অনেক মসৃণ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে অনুমান করে এ কথা বলা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বাদ্যযন্ত্র, কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্যকলার সাথে পরিচিত ছিল।

সাত ছিদ্র বিশিষ্ট বাঁশি, বীণা ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যরত, প্রাপ্ত এ সকল ভাস্কর্য হতে অনুমান করা যায় যে এখানকার সঙ্গীতে তখন সাতটি স্বরের প্রচলন ছিল। বাঁশিতে সাতটি ছিদ্র হয়তো সে কারণেই ব্যবহার করা হয়েছে। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় আবিস্কৃত খোদাই করা চিত্র ও পোড়ামাটির ফলকে অঙ্কিত চিত্রে গলায় ঝুলন্ত ঢোলক বা মৃদঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে সে সময়কার বাদ্যযন্ত্রের বাদনরীতি সম্পর্কেও আমরা বিস্তারিত জানতে পারি। প্রাচীন কালে প্রচলিত সঙ্গীতের ক্রীয়াত্মক দিক বা কণ্ঠ সঙ্গীত সম্পর্কে প্রকৃত কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও, সঙ্গীত পরিবেশনার যে আয়োজন ছিল সে বিষয়ের ধারণা এখান থেকে আমরা পেতে পারি। সিন্ধু সভ্যতা এবং মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্য-গীতরীতি মানুষের

দৈনন্দিন জীবনে বিনোদনের মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি ধর্মীয় প্রভাবিত ছিল। মধ্যযুগের গীতরীতিও তারই ধারাবাহিকতার ফসল বলে অনেকে মনে করেন। লিখিত কোন সাহিত্য বা ধর্মীয় কাহিনি যখন সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তখন সেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়টি প্রধান্য পেয়েছে। কিন্তু জনমানুষের চর্চা ও মনের ভাব যখন পরিবেশনকলার সাথে যুক্ত হয়েছে তখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করার ফলে কিছুটা অশ্লীলতাও শিল্পকলার সাথে যুক্ত হয়েছে। এ সময়কার সঙ্গীত পরিশেনকলা হিসেবে উৎকর্ষ সাধন করলেও সুর ধরে রাখার মতো কোন ধরনের পদ্ধতি না জানার ফলে, এক সভ্যতা হতে অন্য সভ্যতার মানুষের কাছে সে সঙ্গীতের আসল রূপ বরাবরই অজানা থেকে গেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতের আদি ভিত্তি রচিত হয়েছে আর্যদের হাত ধরেই। তাদের স্তুতিগান বা ধর্মীয় ভজন গীতিই আমাদের সঙ্গীতের সূচনা। তবে আর্য সমাজে প্রচলিত গীতিধারা কেবল তাদের ধর্মীয় আচারের অংশ ছিল। এখানকার মানুষের কাছে এ ধর্মীয়রীতি বা গান জনপ্রিয় হওয়ার পর তা সমাজের সর্বত্রই চর্চিত হয়েছে। কালক্রমে সে সঙ্গীতরীতি এক সময় ধর্মীয় বেড়াজাল থেকে বাইরে চলে এসেছে। তবে এখানকার সঙ্গীতের চর্চা, বিকাশ ও সাধনার ধারা নির্মাণে আর্যদের ভূমিকাই বেশি। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে আর্যরা আফগানিস্তান ও ইরান অতিক্রম করে হিন্দুকুশ গিরিপথ ধরে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এ সময়ে ঋকবেদের গাঁথা বা স্তোত্রগুলো সংগৃহীত ও কণ্ঠস্থ করা হয়। মূলত আর্যদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত, গীত এবং নিবেদিত। আর্যরা ঋকবেদের স্তোত্রগুলো একটানা সুরে গাইতো। তাদের যাগ-যজ্ঞের সময় এগুলো গাওয়া হতো এবং সেগুলো এক সময় স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হিসেবে প্রকাশ পায়। এ ধরনের গান পরিবেশন করার সময় নৃত্য সহযোগও করা হতো। এটাই আর্য সঙ্গীতের প্রাথমিক যুগ বলে ধারণা করা হয়। সামবেদে সামগান গাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, যা ঋকস্তোত্র গীতি গাইবার রূপকেই বর্ণনা করে। পরবর্তীতে এ গানের থেকেই রাগ সঙ্গীতের উৎপত্তি ও বিকাশ বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে একটি স্বরের আশ্রয়ে গীত সামগানের রীতি অনেকটা কবিতার উচ্চারণের মতো শোনাতো। কালক্রমে একক স্বরে রচিত এ গানের পরিবেশনে কিছুটা পরিবর্তন আসে। তারা উঁচু ও নিচু স্বরের ব্যবহার আয়ত্ত করে। বন-জঙ্গল কেটে তৈরি করা আর্যদের ছোট ছোট গ্রামে বৈদিক সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের যাগ-যজ্ঞ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হতো। বৈদিক প্রার্থনা রীতির আগে এখানে যে রীতি প্রচলিত ছিল তা ছিল অনেকটা নিরস। সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে শ্রোতার মনে বিশেষ ভাবের তৈরি হতো যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জাগ্রত করে রাখতো। স্তোত্রগুলো প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে প্রথম দিকে এর অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ছিল না। এ কারণে মন্ত্রের সাথে

সঙ্গীত ও নৃত্যকলার সংযোগ ঘটানো হয়। আর্যদের ধর্মীয় রীতিতে গান গাইবার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হতো যে, মন্দিরের পুরোহিতরা জনগণের মনে সত্যিকার ধর্মভাব তৈরি করতে সক্ষম না হওয়ার ফলে প্রার্থনায় সঙ্গীতের যুক্ততা সে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিত। এক সময় সঙ্গীত আচারের বেড়াজাল হতে মুক্ত হয়ে আলাদাভাবে সাধনার পথ তৈরিতে সক্ষম হলো। নিয়মিত চর্চার ফলে খ্রীষ্টপূর্ব দশ শতাব্দী নাগাদ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সুরের ব্যবহার মানুষের আয়ত্তে আসে। সবচেয়ে উচু স্বর, সবচেয়ে নিচু স্বর এবং দুই স্বরের মাঝখানের স্থানকে বুঝাতে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। কালক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে সঙ্গীতের স্বরগ্রাম বা সাতটি স্বর সম্পর্কে মানুষ ধারণা লাভে সক্ষম হয়। সেগুলোর নাম ছিল ক্রুষ্ট, মন্দ্র, অতিস্বরা, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম। পরবর্তীতে এই সাতটি স্থানই আজকের দিনের স্বরগ্রামে পরিণত হয়। বৈদিক উপাসনা সঙ্গীত প্রকাশশৈলীর দিক দিয়ে কিছুটা হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশক ছিল। কিন্তু স্বরগ্রাম ও কাব্যিক ছন্দ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বৈদিক উপাসনার মধ্যেও বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এর ফলে তারা সঙ্গীতেও কাব্য রসের সংযোগ ঘটায়, সঙ্গীত পায় নতুন মাত্রা। সঙ্গীতের প্রতি কবিতার এবং কবিতার প্রতি সঙ্গীতের এমন সমর্থনের ফলে অতিদ্রুত সঙ্গীতকে নতুন ফ্রেমে বাঁধতে সক্ষম হন সে সময়ের কবিগণ, যা ছিল সুশ্রাব্য ও মৌলিক আবেদনে পূর্ণ। ক্রমে মানুষ সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে নানামুখী গবেষণায় যুক্ত হলো এবং যন্ত্রসঙ্গীতের বিকাশ এ সময়েই ঘটে। ফলে সঙ্গীত শুধুমাত্র কণ্ঠে ধারণ না করে যন্ত্রে বাদনের মাধ্যমেও চর্চা হতে শুরু করে। তারযন্ত্র কণ্ঠের পাশাপাশি সঙ্গীতে সুরের অনুসঙ্গ বা অনুগামী হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করলো। অনেক সময় গায়কের গান পরিবেশন করার ক্ষেত্রে নিচের কোন স্বর বা খাদের স্বরকে পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্যে বাদ্যযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতো। সঙ্গীত ও স্বর সাধনার জন্য প্রাচীন বা আদিম মানুষেরা উচ্চ স্বর থেকে গান শুরু করতো এবং ধীরে ধীরে তা খাদে এসে পড়তো, এ কারণে উচ্চ স্বরের কথা সবার আগে বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ফলে সঙ্গীতের গতিপথ পাল্টে যায়, কণ্ঠ ও যন্ত্রের সুরের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। শ্রুতি মধুর সুরের আবেশ তৈরি করার জন্য প্রত্যেকে তার অবস্থান থেকে সরে এসে সঙ্গীতের পরিবেশনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে একসময় যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের নিজ নিজ স্থান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঋকবেদে বর্ণিত স্তোত্রগুলো অনেকটা সামগান বা সমন স্তোত্র। এগুলোর সাথে গ্রেগোরিয়ান স্তোত্রের মিল রয়েছে। তবে সামগানের চেয়ে এটি আরো বেশি প্রাচীন ও আভিজাত্যহীন। এগুলো কেবল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা বলিদানের উৎসবে গীত হতো। পাশ্চাত্যের স্তোত্রগীতি বাদ্যযন্ত্রহীন পরিবেশিত হলেও প্রাচ্যের গানে বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ ঘটেছে অনেক দ্রুত।

খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দীর মধ্যে সামগান চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এবং এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতধারা হিসেবে পরিচিতি পায়। কিন্তু এ গানও এক সময় মানুষের চির পরিবর্তনশীল রুচির দাবি মিটাতে পারেনি। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আদেশ-উপদেশ ও একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে দুর্বোধ্য এ ধর্মীয় আচার হতে মানুষ কিছুটা হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। জনসাধারণের এ সঙ্গীত অনাসক্তির কারণে বৈদিক সঙ্গীতের জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়তে থাকে। তখন মানুষের আগ্রহ তৈরির জন্য বৈদিক গানে সুরের দিক দিয়ে আধুনিকিকরণ করা হয়। ফলে পূর্বে যেভাবে মানুষ বৈদিক গানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিল তা কিছুটা হলেও কমে আসে। বৈদিক গানের মধ্যে কোথাও কোথাও লৌকিক সুরের সংমিশ্রণ ঘটে। এ ধরনের বৈদিক গানকে গানা বলা হতো। গানা ছিল চার ধরনের। এগুলো হলো (ক) গ্রাম-গেয়, যা গাঁয়ে গাওয়া হতো, (খ) অরণ্য গেয়, যা বনজঙ্গল বা অরণ্যে গাওয়া হতো, (গ) উঁই গেয়, যা গাওয়া হতো ধ্যান করার জন্য, (ঘ) উহ্যায়া গেয়, যা ছিল মরমি গান। দিবসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। শতাধিক বছর ধরে এ রীতি প্রচলিত ছিল যা পরিণামে রাগ-রাগীনির জন্ম দেয়।[৮] গানা বা গীতার সুর ছিল লোকসঙ্গীত ভিত্তিক। মূল ভাবের স্থান ছাড়া এসব গানের সাথে বৈদিক গানের কোন ধরনের মিল পাওয়া যায়না। প্রাণহীন ও একই সুরের বারবার উপস্থাপনার পরিবর্তে মানুষ পেলো মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ জনপ্রিয় লোকপোকরণ, যা ধর্মীয় গীতি বা অনুষ্ঠানকে আরো বেশি জনমুখী করে তুললো। আর্যরা এত দিন যাবৎ যে ধরনের গীতরীতির অনুসন্ধান করে চলেছিল গানা বা লোকসুরে রচিত গীতা সে স্থান দখল করলো। এটি সামগানের চেয়ে জনপ্রিয় হওয়ার ফলে আর্যরা লোকভিত্তিক গানা বা গীতা রচনার দিকে ঝুকে পড়লো। লোকসঙ্গীতের প্রভাবে রচিত এমন গীতি প্রাচীন বৈদিক গানকেও পুনরুজ্জীবিত করলো। কেউ কেউ এ সঙ্গীত ধারাকে মার্গ সঙ্গীত বলেছেন তবে একে দেশি সঙ্গীতও বলা হয়। আবার মার্গ সঙ্গীতকে গন্ধর্ব সঙ্গীতও বলা হয়। তবে মার্গ বা গন্ধর্ব উভয় সঙ্গীতের মূল ভিত্তি লোকসুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন লেখকগণ মনে করেন ব্রহ্মাই হলো মার্গ সঙ্গীতের রচয়িতা, যা বেদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে ভরত এবং অন্যান্য ঋষিরা গানকে রূপে-রসে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে ব্রহ্ম বলতে বিশ্ব-প্রকৃতির মূল বা স্রষ্টাকে বোঝানো হয়নি। এখানে ব্রহ্ম বলতে যিনি আর্যদের সকল যাগ-যজ্ঞের মূল পরিচালক বা অন্যান্য ব্রাহ্মণ, পুরোহিতদেরকে নির্দেশ দিতেন।[৯] মাটির পৃথিবীর মরণশীল জনৈক ব্রহ্মাই ছিলেন মার্গ সঙ্গীতের জন্মদাতা, চির অমর সর্বশক্তিমান সর্বভূমে বিরাজমান ব্রহ্ম নয়। কেউ কেউ অসতর্ক হয়ে এ দুই ব্রহ্মকে এক করে দেখেন। তবে মার্গ ও দেশি উভয় সঙ্গীতের ভিত্তি রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত থেকে। এ গানের সাথে যুক্ত হলো লোকনৃত্য যা কালক্রমে যাগ-যজ্ঞের একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় আশ্রয়ে না থেকে নৃত্য ধীরে ধীরে তার নিজস্ব রূপ ও গতি বিস্তার করতে সক্ষম হলো। ফলে

লৌকিক নৃত্য নামে একটি স্বতন্ত্র নৃত্য ধারা তৈরি হলো। গবেষকদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ছয়শ অব্দের দিকে ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রভাব কিছুটা হলেও কমে আসে এবং লোকসঙ্গীতের ধারাগুলো প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ধর্মীয় সঙ্গীতগুলো ধর্মীয় বহির্ভূত গীতরীতি হতে উপকরণ সংগ্রহ করে গীতিধারাগুলোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই লোকমুখী হতে শুরু করে। বলতে গেলে প্রকৃত সুর বা সঙ্গীত পদ্ধতির সাধনার পথ মূলত এখান থেকেই শুরু হয়। এরপর সঙ্গীত রীতিগুলো নিজস্ব রূপ বা গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে রাগসঙ্গীত কিংবা লোকসঙ্গীতে পরিচিত হয়েছে। সঙ্গীত পদ্ধতির এ সকল ধারার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতো। কালক্রমে তা লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীত নাম পরিচয়ে দুটি ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

আধ্যাত্মিক বিমূর্ত ভাবাবেগ থেকে বাংলা সঙ্গীতকে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে প্রায় হাজার বছরের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস অতিক্রম করতে হয়েছে। এমনকি আজকের দিনে সৃষ্ট অনেক লোকসঙ্গীতের বক্তব্যে আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয়তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে মানবিক ধ্যান-ধারণা, সুখ-দুঃখ, পার্থিবধন ও ঐশ্বর্য, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি বিষয় লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তবে আধ্যাত্মিক ও বিমূর্ততার প্রভাব আধুনিক ও লোকসঙ্গীতের উভয় ধারার মধ্যে বরাবরই সমানভাবে স্থান করে নিয়েছে। একে সঙ্গীতের বা সুরের সুষ্ঠু সহাবস্থান বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধকেরা 'বজ্র' নামের এক ধরনের গীতি কবিতা গাইতো। বৌদ্ধদের অন্য আরেক সম্প্রদায় 'সহজিয়া' যারা উচ্চাঙ্গ সুর এবং তালে চর্যাগীতিকা গাইতো। এসব গানে এক বা দুই তন্ত্রী বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। এই বৌদ্ধ ধর্মীয় গীতিকাকে 'চর্যা গীতিকা' বাংলা গানের আদি নিদর্শন বলা হয়। এটিকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চর্যা গীতিকার মধ্যে বৌদ্ধ যাজকেরা ইহলৌকিক জ্বরা ও দুঃখ অতিক্রমণের বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন। সমকালীন সমাজের আচার-রীতি-নীতি ইত্যাদি বৌদ্ধ গীতিকবিতায় স্থান পেয়েছে। বিমূর্ত ভাবধারাকে জনসাধারণের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য বৌদ্ধ কবিগণ রূপক বা উপমার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। বজ্র এবং চর্যা উভয়ই বৌদ্ধপণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত পবিত্র ধর্মীয় সঙ্গীত। এর মূল লক্ষ্যই হলো সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন করা। যার কারণে এ গানের বক্তব্যে স্তোত্র বা উপাসনা বাক্যই ছিল প্রধান।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র পর বাংলা গানে যে ধারাটি এখানকার জনগণের কাছে একান্ত আপন গীতশৈলী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে তা হলো কীর্তন গান। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং নান্নুরার কবি বড়ু

চণ্ডীদাসের রচনা ও চর্চার ফলে কীর্তন গান মানুষের কাছে ভক্তি সহকারে গৃহীত হয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর হাত ধরে কীর্তন এক অভিনব রূপ লাভ করে। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য পরিহার করে কীর্তনের আবেদনকে তিনি অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তোলেন। নগর সংকীর্তন গাওয়ার সময় লোকজ বাদ্যযন্ত্র খোল, করতালের ব্যবহার করা হতো। চৈতন্যের প্রধান তিন শিষ্য বৃন্দাবন দাস, মুরারী দাস ও গোবিন্দ দাস অনেক কীর্তন রচনা করেছেন। গান হিসেবে কীর্তনের মধ্যে মানব জীবনের প্রায় সকল বিষয়াবলী উঠে এসেছে। যে কারণে এ গানের সুরে ও কথার ভাবরসে পরবর্তীতে অনেক কবি সাহিত্যিক প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীত ও সাহিত্য রচনা করেছেন। কীর্তনের প্রধান চরিত্র রাধা ও কৃষ্ণ। তাদের জীবনী বর্ণনার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এদেশের নদ-নদীর প্রভাব। নদী তীরবর্তী মানুষের সঙ্গীত সাধনার অংশ হিসেবে যে ভাটিয়ালী সুরের সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন, কীর্তন গানের সুরে তার প্রভাব স্পষ্ট। কীর্তনকে আশ্রয় করে নাটকীয় উপাদানও সমৃদ্ধ হয়েছে। সেখানে সুরের গঠনে ভাটিয়ালী বা লোকসুরের প্রভাব দেখা যায়। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কবি গান নামে একটি গীতধারার উদ্ভব ঘটে। এ রীতির প্রবর্তক হলেন রাসু নৃসিংহ, নালু নন্দলাল এবং রঘুনাথ দাস। নদীয়ার মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এ গানের দল গড়ে উঠে। এতে সঙ্গীত কিছুটা হ্রাস পেলেও কাব্যরস সে সঙ্গীতের মুখ্য উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত লোককবির রচিত এ গানে ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তারই ধারাবাহিকতায় কবিয়াল বিজয় সরকারের গানেও আমরা ভাটিগান বা সুরের প্রভাব লক্ষ্য করি।

এদেশের জনমানুষের চাওয়া পাওয়া হাসি-কান্না এসবেরই অনুরণন ঘটে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সুরে সুরে। পৃথিবীর খুব কম দেশ বা সভ্যতা আছে যেখানে সঙ্গীতের সাথে মানুষের এত বেশি যুক্ততা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার মানুষ ধর্মীয় সাধনার মত সঙ্গীতের মাধ্যমেই তাদের মনের কামনা, বাসনার কথা প্রকাশ করেছে। কর্মের সাথে সঙ্গীতের সংযোগের ফলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এর জনজীবন ও মানুষের স্বভাব-চরিত্রের উপরও সঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। নদী ও বৃষ্টি-বিধৌত উর্বর পলিমাটির কারণে এখানকার মানুষ প্রচুর ফসল ঘরে তোলে। সর্বত্রই রয়েছে প্রকৃতির সবুজ চাদর। মাঝে মধ্যে এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলেও পৃথিবীর অন্য এলাকার মানুষকে টিকে থাকার জন্য যে কত কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সে সম্পর্কে এখানকার মানুষের কোন ধরনের ধারণা নেই। এই ভূখণ্ডের প্রতি প্রকৃতির এমন উদারতার ফলে এদেশের মানুষের হৃদয়ে এক সুর ও ছন্দের অনুরণন, শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি আত্মিক অনুভূতি এবং সহজাত কমনীয়তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা অঞ্চলের মানুষ এক

সময় বছরে বারো মাসের মধ্যে কোন ক্রমেই আট মাসের উপরে কাজ করতো না। এই চার মাস অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে মানুষ অবসর যাপন করতো। এ সময় তারা নানা বিনোদন ও আনন্দের সন্ধান করতো। জীবনের হালকা ও সহজ দিকগুলো খুঁজে বের করে তার উপভোগই এখানকার মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের উৎস ও বিকাশের ক্ষেত্রে এমন উদারতার প্রভাব থাকার ফলে চর্চার সময়ে এসে মানুষকে আরো বেশি ভাবপ্রবণ করে তুলেছে। অবারিত সবুজ মাঠ, বহমান নদী, ঘন সবুজ ফসলের মাঠ, শ্যামল বনানী, ঋতুর এমন দ্রুত পরিবর্তন, আকাশে মেঘের রং বদলানো ইত্যাদি মানুষের হৃদয়কেও বদলে দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। এদেশের সংস্কৃতিকে করেছে কাব্যময়। এই পরিবর্তনের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে, ব্যক্তিজীবনে এবং সামাজিকতায়। রাখালের গরু চরানোর সময় উদাস সুরের বাঁশি বাদন থেকে শুরু করে, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখ পর্যন্ত এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। লোকসঙ্গীতের প্রকৃত উৎস এবং স্রষ্টা কারা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ দাবী করেছেন কৃষকরাই লোকসঙ্গীতের স্রষ্টা। জার্মান সঙ্গীত গবেষকগণ মনে করেন কৃষকদের দিয়ে এমন নতুন সুর তৈরি করা সম্ভব নয়। অন্যান্য শিল্পকলার মত লোকসঙ্গীতও সমাজের বিত্তবানরাই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত এ গান কেবলমাত্র কয়েক শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সর্বজন গ্রহণীয় মতামত হলো সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ যারা অর্থনৈতিক দিকদিয়ে দুর্বল, খেটে খাওয়া এ সকল মানুষেরাই লোকসঙ্গীতের বা সুরের উদ্ভাবক। লোকসঙ্গীতে সাধারণ মানুষের এমন সংযোগের ফলে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ভাষা ও সুরের প্রভাব এ গানে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সকল মানুষের জন্য কখনও কখনও এ গান বোধগম্য হয়ে উঠে না। আবার উৎসকাল হিসাব করলে লোকসঙ্গীতের অনেক গান এত প্রাচীন এবং যুগ ও লোক পরম্পরায় এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, তার আসল রূপ ও উৎস খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন বিষয়। তবে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সৃষ্টির বিষয় হিসেবে এখানকার মানুষের কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়টি বেশ যুক্ত। লোকসঙ্গীত সহজ স্বতঃস্ফূর্ত এবং গ্রামীণ। লোকসঙ্গীতের স্রষ্টারা হলেন পল্লির নিভৃতে বসবাসকারী নাম না জানা গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষের সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবনের মতোই অলংকারবিহীন এখানকার লোকসঙ্গীত। মানুষের সঙ্গীত চর্চার মধ্য দিয়ে তার মনের কথা ব্যক্ত হয়। ফলে মাটির কাছাকাছি বসবাসকারী এ সকল মানুষের হৃদয়ের স্পন্দনে সঙ্গীত যে কত জীবন্ত হতে পারে তা লোকসঙ্গীতের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা লোকসঙ্গীত কিছুটা সুফি মতাদর্শী আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট। এর উদ্দেশ্য হলো প্রেম নিবেদনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ। এই প্রেম সংকীর্ণতার আবর্তে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সৃষ্টিকে ভালোবাসার

মাধ্যমেই এই প্রেমে সফল হওয়া যায়। এখানে শাস্ত্র ও ধর্মাচারের কঠোর ও রক্তচক্ষুর প্রভাব নেই। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব। সাধারণত একতারা বা দোতরা সহযোগে এই গীত সৃষ্টিকর্তার প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদন করা হয়। মারফতি, মুর্শিদি, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী গানে সে আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে। এ সকল গানের মূল বিষয়বস্তুতে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। সেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল প্রেম ও ভালোবাসা উৎসর্গ করা হয়েছে। যে সাধনার জন্য নির্দিষ্ট কোন ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে যে যার ইচ্ছা মতো স্রষ্টাকে ডাকতে পারে। যেখানে ধর্ম পরিচয়কে বড় করে দেখা হয়না। সুতরাং এ জাতীয় আদর্শে যে সঙ্গীতের ভিত্তি রচিত তা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। নদীমাতৃক বাংলাদেশে হাজারো নদ-নদীর কারণে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের সময় একস্থান থেকে খুব সহজেই এ গান অন্য স্থানের মানুষের কাছে পৌছে গেছে। আমাদের জীবনযাত্রার সাথে নদীর এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে নদী নিজেই এক সময় গানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ভাটিয়ালী ও সারি গান উল্লেখযোগ্য দুটি গীতরীতি যার মূল ভিত্তি নদী কেন্দ্রিক। শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী ভাটিয়ালী বলতে নদীর ভাটি বেলার মতো জীবন স্রোতের সাথে মানুষের মিশে যাওয়া বুঝায়। নামের সাথে মিল রেখে এ গানের সুরের গঠনও হয়েছে। জীবনের পূর্বাহ্নে যে তেজিভাব থাকে অপরাহ্নে তা কমে আসে বা মিলিয়ে যায়। ভাটিয়ালী গানের সুরেও আমরা একই ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। গানের শুরুর স্থান সাধারণত অনেক চড়া সুরের এবং দীর্ঘ হয়, যা ধীরে ধীরে কমে আসে। ভাটিয়ালীতে এমন লম্বা সুরের ব্যবহার সম্পর্কে অনেকে নদীর গভীরতা ও বিশালতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার কথা বুঝিয়েছেন। অনেকে মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত লোভ-লালসা, কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্রাম গ্রহণ করার বিষয়কে বুঝাতে এমন সুরের ব্যবহার। কখনও সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মনিবেদন, কখনও প্রেমিকার বিচ্ছেদজনিত অভিব্যক্তি ভাটিয়ালী গানের সুরকে এত বেশি ভারাক্রান্ত করেছে। কোন কোন ভাটি গায়ক মনের মানুষের সন্ধানে নদীর ঘাটে ঘাটে এমন সুরে ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করে চলে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন ধারণ, তাদের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি মানস, আধ্যাত্মিক চিন্তা, সামাজিক চেতনা ইত্যাদি প্রায় সব কিছুরই প্রতিবিম্ব রূপে দেখা দিয়েছে এখানকার লোকসঙ্গীতে। পল্লি-গ্রামের পথে-প্রান্তরে সাধারণ মানুষের মনের ভাবরসে এ ধরনের সঙ্গীতরসের সৃষ্টি বলে এটির মাধ্যমে সব ধরনের মানুষের মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গান এদেশের লোকসঙ্গীতে একটি অন্যতম বিশিষ্ট গীতধারা। যার মাধ্যমে বাঙালির দর্শন চিন্তার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনার বিষয় সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি। প্রাথমিকভাবে ভাটিয়ালী গানের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রামীণ জীবনে বসে রচিত হলেও এর

মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আঞ্চলিক মানস গঠনের রূপ। লোকসঙ্গীতের এই রীতির মধ্যে লিখিত ও অলিখিত দুটি ধারারই সমান প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। গানগুলোর বিকাশ ও প্রকাশ হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের মাধ্যমে। লোক জীবনকে আশ্রয় করে এ গান রচিত হলেও এর মধ্যে আধুনিক যে কোন গীতরীতির মতই কথা ও সুরের যুগল মিলন বা সমন্বিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী গানের যিনি রচয়িতা সাধারণত তিনিই এ গানের সুরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন কোন গানের সুরের রূপ পাওয়া না গেলেও পরবর্তীতে তাতে সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে ভাটিয়ালী গানের যে সর্বজনীন রূপ সে বিষয়টি আরো বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। কোন কোন লোককবি প্রাচীন ধারাশ্রয়ী এ ধরনের গীতরীতির চর্চা করেছেন আবার কেউ কেউ এর সুরে প্রভাবিত হয়ে নিজেই গান রচনা করেছেন। এদেশের অসংখ্য লোককবি মরমী ও বাউল ভাবধারাকে আশ্রয় করে সাধন ভজনের অঙ্গ হিসেবেও ভাটিয়ালী গান রচনা করেছেন। সে সকল গান এখানকার মানুষের হাজার বছরের চেতনায় লালিত লোকদর্শনেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভাটিয়ালী এমন একটি গীতরীতি যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার জলে-স্থলে উভয় স্থানেই সমানভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জনমানুষের গান হওয়ার ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অতি সহজেই এ গান ছড়িয়ে গেছে। প্রচলিত আছে- ভাটিয়ালী নৌকার মাঝি-মাল্লা ও চাষী রাখালের গান। পূর্ববাংলার মাঝিমাল্লারা সর্বদা পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার্জনের জন্য যাতায়াত করিত এবং সেই সূত্রে তাহাদের নিজেদের অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত পশ্চিমবঙ্গেও প্রচার করিবার সহায়তা করিয়াছে।[১০] আমাদের লোকসঙ্গীতের উদ্ভব যেভাবে হয়েছে সেই একই ধারায় এটি জনপ্রিয় গীতরীতি হিসেবেও পরিচয় পেয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা সওদাগর বা মাঝির নৌকাডুবির কথা দেখতে পাই। মঙ্গলকাব্যেও সওদাগরের নৌকাডুবির পর 'বাঙ্গাল মাঝির খেদ' নামে একটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।[১১] তবে নৌকাডুবির পরেই যে শুধুমাত্র মাঝির কণ্ঠে খেদ প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে অনেকে একমত হতে পারেননি। নৌকাডুবির বাইরেও একজন মাঝির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে যা তাকে স্মৃতিকাতর করে ফেলে। তাছাড়া মানুষের দুঃখের যে অনুভূতি তার উপলব্ধি সবার ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের। তবে একজন মাঝি তার মনের কষ্ট লাঘবের জন্য হয়তো গান করতে পারেন, অন্য জনের কাছে যা কোন দুঃখস্মৃতির মন্থন মনে হতে পারে। কিন্তু উপলব্ধির বেলায় দুই জনই বিষাদময় হয়ে উঠে। এভাবে ভাটিয়ালী গান একেক জনের মনের আনন্দ কিংবা দুঃখের সঙ্গী হয়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে প্রচার পেয়েছে। এক সময় ভাটিয়ালী এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে বাংলার কোন কোন নদী বিধৌত অঞ্চল মানুষের কাছে তার মূল নাম হারিয়ে 'আঠারো ভাটির দেশ' নতুন নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ সকল এলাকায় বসবাসকারী কামার, কুমোর, চাষি. তাঁতি, মাঝি, মউলে

ইত্যাদি শ্রেণি-পেশার লোকজন নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থেকেও ঘরের বাইরে কাজের জন্য যখন তারা রওনা করে, তখন এরা যে জাতীয় গান করে তা প্রায় একই ধরনের। সুর বিচারে এটি ভাটিয়ালীর সমগোত্রীয়।[১২] ভাটিয়ালী গান শুধুমাত্র পূর্ববাংলা অঞ্চল নয় বরং বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের কাছে ঐতিহ্যগত ভাবেই একটি জনপ্রিয় গীতরীতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ভাটিয়ালীর সুর পদ্ধতি বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসের সাথে এক সুঁতোয় গাঁথা। আমাদের সঙ্গীত রীতির আদি ও মধ্যযুগের প্রায় সকল শাখার সাথে ভাটিয়ালী গানের সুরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারেও ভাটিয়ালী সুর এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এখনো সমানভাবে জনপ্রিয়। উনিশ শতকের সূচনা লগ্নে যখন বাংলা গান মানুষের কাছে একটি নতুন রূপ গ্রহণ করে মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিণত হলো, সমসাময়িক কবি ও সঙ্গীতকারগণও ভাটিয়ালী সুরে প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। কখনো সেটা একক মনের ভাবকে ধারণ করেছে, আবার কখনো মানুষের দেশাত্মবোধকে জাগ্রতকরার জন্য অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। বাংলা গানের বহু-বিচিত্র আঞ্চলিক শাখার মতো নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাটিয়ালী গান সীমাবদ্ধ না থেকে এর পরিধিকে বাংলার প্রায় সকল মানুষের কাছে বিস্তৃত করেছে।

Z_¨wb‡‘k

১। ম ন মুস্তাফা, আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ২।

২। প্রাগুক্ত, পৃ . ৩।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ . ৭।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ১০।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ . ১৩।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ . ১৪।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১০। ভাটিয়ালী গান, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলতকাতা, পৃ. ৩৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mv‡bi msÁv I bvgKiY

বাংলা সাংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হলো এদেশের লোকসঙ্গীত। এই সঙ্গীতরীতি বলতে এদেশের গ্রামীণ জীবনে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সৃষ্ট গানকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ ধরনের কথা, সুর, প্রকাশশৈলীর সম্মিলিত রূপ হলো ভাটিয়ালী গান। আঞ্চলিক উচ্চারণে গীত এ গান পূর্ববাংলা অর্থ্যাৎ বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি শুনতে পাওয়া যায়। পূর্ববাংলার মোট জনসমষ্টির সবচেয়ে বড় অংশের বসবাস গ্রামে। গ্রামীণ জীবনে ও সমাজের মানুষ যুগ যুগ ধরে সভ্যতার নানাবিধ সুযোগ সুবিধা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে থাকে। মানব জীবনের বহুবিধ দুর্বিপাক, অত্যাচারিত জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনা, দারিদ্র, ব্যাধিতে দিনাতিপাত ইত্যাদি এখানকার মানুষকে খুব সহজেই ভাবিয়ে তুলেছে। গ্রামের স্বভাব কবিগণ তাদের কবিতায় সুর রচনা করে এ জাতীয় বিষয়াবলীকে সঙ্গীত জগতের সাথে সংযোজন ঘটিয়েছেন। মানুষের মনের বক্তব্য আর সুর একই স্থানে যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রামীণ গীতিকায় অনেক বেশি বৈচিত্র্য এসেছে। হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মতো এখানকার সঙ্গীতেরও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। প্রাকৃতিক দিক থেকে এ অঞ্চল মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখানকার সামাজিক ইতিহাসের লিখিত রূপ বেশি দিনের নয়। তার অন্যতম কারণ হলো এ ধরনের বিষয়াবলীর প্রাচীন রূপের লিখিত কোন তথ্য এখানে সংরক্ষিত হয়নি। আর যতটুকু পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই হলো লোক এবং পৌরাণিক সাহিত্য ও সঙ্গীতের উপাদানে পূর্ণ। এদিক থেকে বলতে গেলে বাংলা ভাষায় রচিত যে পদগুলোকে আমাদের আদি সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় তার সবটাই প্রায় সঙ্গীত আশ্রিত। এ কারণে শুধুমাত্র লোকমানস থেকে এ গানের উৎপত্তি ও বিকাশ বললে কম হয়ে যায়। বরং এটিকে সমাজের সার্বিক জনসমষ্টির সৃষ্টিশীল মননের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। যতটুকু জানা যায়, প্রাচীন বাংলায় অতি জনপ্রিয় এ গীতরীতি (ভাটিয়ালী) সাঙ্গীতিক গঠনে ও বৈশিষ্ট্যে আজকের দিনের প্রচলিত ও জনপ্রিয় সঙ্গীতের মতই সুশ্রাব্য এবং সম্পূর্ণ। নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ ও রসপিপাসা মেটানোর জন্য গ্রামের মানুষ তার নিজের ভাষায় কবিতা রচনা করে তাতে সুর প্রয়োগ করেছে। নিজের মতো করে গান প্রকাশ করার ফলে এর মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়েছে। বাইরের কোন জনপ্রিয় গান কিংবা সুরের প্রভাবেও যদি এখানকার কোন গান রচিত হয়ে থাকে তবে সেখানেও এ বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি। গ্রামের সাধারণ মানুষের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পী ও গীতিকার এমন আঞ্চলিকতার প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এ কাজটি তার বা তাদের ইচ্ছাকৃত নয়। সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মত তারা

নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করেছে মাত্র। গ্রামীণ এ সকল গীতিকবিদের সঙ্গীত রচনার সময় রাগ সঙ্গীতের ধারা, বিষয়াবলী, নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজনও পড়েনি। তবে বেশিরভাগ জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সময় এবং প্রহরকে ধারণ করে যে সকল বর্ণনামূলক লোকগীত রচিত হয়েছে সেগুলোর সাথে একই সময়ে গীত রাগের রূপ ও চলনের মিল রয়েছে। রাগসঙ্গীতের ভিত্তিমূলের এমন প্রভাব কিংবা লোকসঙ্গীতের মধ্যে রাগসঙ্গীতের এমন সন্ধান প্রাপ্তির কারণ হিসেবে সঙ্গীত গবেষকগণ মনে করেন, এদেশের লোকসঙ্গীতের ইতিহাস হাজার বছরের। অল্প দিনের চর্চায় এ গীতিধারা গড়ে উঠেনি। সুরের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মধ্যদিয়ে লোকসঙ্গীতের এ ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সাধুভাষা কিংবা রাগসঙ্গীতের সাথে এর পরিচয় ঘটেনি এমন বিষয় অবান্তর। গ্রামীণ সমাজমানসে সঙ্গীতরসের যোগান দিতে যে ধরনের সুর ও কথা ব্যবহার করা প্রয়োজন গীতিকবিগণ তা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করেছেন। সৃষ্টির কালে হোক অথবা আধুনিক কালেই হোক না কেন গ্রামীণ এ গীতিকা সব সময়ের জন্যেই সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সঙ্গীত রসের সকল প্রকার বিষয়াবলী লোকসঙ্গীতের মধ্যে এমন সুষ্ঠু সমন্বয় হয়েছিল বলেই এ ধারার গীতরীতি এত বিচিত্র আকার ধারণ করেছে। তবে এই দীর্ঘ সময়ে গ্রামীণ গীতিকা তার নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি থেকে কোন ভাবেই বিচ্যুত হয়নি। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতে folklore বা গ্রামীণ গীতিকা communally recreated। সুর সৃষ্টি ব্যক্তি বিশেষের হলেও communally গোটা সমাজ কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। আমাদের লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞরাও গ্রামীণ গীতির সাহিত্যিক অংশ সমাজের অবদান বলেই বিবেচনা করেন। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ লোকসাহিত্য সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন, গ্রামীণ সুরের ক্ষেত্রে তার অন্যথার কোন কারণ নেই। তাঁদের মতের পরিপ্রেক্ষিতে এ ভাবাই স্বাভাবিক যে একজন সুর আরোপ করে থাকলেও, সে সুর ক্রমান্বয়ে সংস্কার ও সংশোধনের ভিতর দিয়ে বর্তমান সুরে এসে দাঁড়িয়েছে। কতটুক সংস্কৃত বা সংশোধিত হয়েছে, নির্ভর করে কোন বিশেষ সমাজের বা অঞ্চলের রসানুভূতি কতটুকু ছিল তার উপর। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামীণ গীতির সাঙ্গীতিক গঠন স্থুল ও অপরিণত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুষ্ঠু, সাবলীল ও পরিণত, কোন কোন ক্ষেত্রে সাত স্বরের প্রয়োগ হয়নি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাত স্বরের সালঙ্কারিক প্রয়োগ ও পরিলক্ষিত হয়।[১]

বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এ ধরনের লোকগীতিকার বিকাশ ঘটেছে। তবে এ শ্রেণির গীতিকা সঠিকভাবে কত সময় যাবৎ প্রচলিত কিংবা মানুষ চর্চা করে আসছে সে সম্পর্কে জানা যায় না। দু-তিনশো বছরের বা তারও আগে লক্ষ্য করলে একইভাবে এ গীতরীতির চর্চা হতে দেখা যায়। আমাদের লোকসঙ্গীতে যতগুলো ধারা রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এদেশের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রচলিত ও প্রতিনিধিত্বকারী উল্লেখযোগ্য ধারাগুলোর মধ্যে জারি, সারি,

ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, তর্জা, পাঁচলী, খেউর, আখড়াই, গম্ভীরা, বাউল, ভাদু, টুসু, ঘাটু, পালা, রয়ানি, কীর্তন, রামায়ণ গান, গীতিকা, কবি গান ইত্যাদি। এ সকল ধারার গীতরীতির মধ্যে বিষয়গত পার্থক্যই মৌলিক উপজিব্য হলেও ভাটি সুরের প্রভাবের কারণে অনেক গীতরীতির সুর এ ধারার সঙ্গীতের সাথেও মিশে গেছে। ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গীতরীতি তাদের মধ্যে অন্যতম। কখনো কথায়, কখনো সুরের মাধ্যমে এরূপ প্রভাবের প্রমাণ মিললেও ভাটিয়ালীর মৌলিকত্ব নির্ভর করেছে কথা ও সুরের যুগল মিলনের মধ্যদিয়ে। এদেশীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ধারাগুলোর অন্যতম হলো ভাটিয়ালী গান।

গবেষকগণ ভাটিয়ালীর সংজ্ঞা প্রদানে ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। ভাটিয়ালী গান গাওয়ার সময় নদী, নৌকা, মাঝি, নদীর পানি ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও অনেকে ভাটিয়ালীকে প্রেমসঙ্গীত হিসেবে গণ্য করেন। অনেকে নৌকার মাঝির নিজের মনের সুখ, দুঃখানুভূতির সহজ সরল বহিঃপ্রকাশ মনে করেছেন।

কেউ কেউ ভাটির টানে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিয়ে অবসর সময়ে মনের আনন্দে যে লম্বা সুরের গান পরিবেশন করে থাকে তাকে ভাটিয়ালী গান বলেছেন।

ভাটিয়ালীকে রূপক অর্থে ব্যবহৃত মানব মনের বিশেষ ধরনের উপলব্ধি সূচক (ঈশ্বর সম্পর্কে) গানও বলা হয়েছে। ভাটি অর্থ নিম্ন বা মূলের টানে ফিরে যাওয়া। অর্থ্যাৎ যে উৎস থেকে তার উৎপত্তি সে দিকে ধাবিত হওয়া। সে অর্থে মানুষের জীবনে যে সময় স্রষ্টা সম্পর্কে বিশেষ ধরনের আগ্রহ বা ভালোবাসা জন্মায়, স্রষ্টার অনুগ্রহ পাওয়ার ইচ্ছা জাগে এবং সেই লক্ষ্যে মানুষ জগৎ-জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অনর্থক মনে করে ও এই ভবদুঃখ পারাপারের জন্য সুরের মাধ্যমে স্রষ্টাকে স্মরণ করে এবং তার করুণা লাভে আশাবাদী হয়ে উঠে, এমন আকুতিভাব প্রকাশসূচক লম্বা সুরের তাল বিহীন গানকে ভাটিয়ালী বলা হয়।

ভাটিয়ালী গানের বাণীতে যে প্রেমদর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে তার সবখানেই আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া অনুভূত হয়। দৃশ্যত মানব-মানবীর মনের কথা প্রকাশ করা হলেও এ যেন অদৃশ্যমান নদীর দুই পারে অপেক্ষারত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা বিরহেরই প্রকাশ গাঁথা। সৃষ্টির আদিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, পরিচিত ছিল, ভাটিয়ালী গানে ঠিক সেই রূপ মিলনের আকাঙ্ক্ষা পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভাটি বা নিম্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই নানা সময়ে বৈরী পরিবেশের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার কথা ভাবতে হয়। জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে এমন কিছু দিক যুক্ত থাকার ফলে এসব নদী বহুল এলাকার মানুষ রীতি অনুসারেই মানসিক ভাবে পরিশ্রান্ত থাকে। এর ফলে তাদের সৃষ্ট সঙ্গীতে অতিরিক্ত জৌলুস বা পাণ্ডিত্য স্থান পায় না। ভাটির এ সকল গান মানুষের মনে কেবল প্রশান্তি আনে। কোন কোন এলাকায় এ গানকে বলা হয় ভাটিয়াল বা ভাইট্যাল। অন্যান্য গীতরীতির মতো এ গানে তালের ব্যবহার না করে কথা, মানব মনের অনুভূতি ও সুরের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ গানের বিষয়াবলী সকল শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকার ফলে গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে শিল্পী যে রূপে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন, ভাটিয়ালী গানে তা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই ভাটিয়ালীকে অনেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গঠন ও বিষয়বস্তুর বিচারে ভাটিয়ালীকে শুধুমাত্র উন্মুক্ত প্রান্তরের গান না বলে একে শ্রেণি নিরপেক্ষ মনের বা ভাবের গানও বলা চলে। ভাটিয়ালী গানে যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই তাতে প্রান্তরের বর্ণনার চেয়ে লোকালয়ের বিষয়াবলী বেশি স্থান পেয়েছে। গায়কের না বলা কথাগুলো যখন গান হয়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন এর মধ্যকার আকুতিগুলো সবার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে ভাটিয়ালী সুরকে উন্মুক্ত প্রান্তরের গান বলা যেতে পারে।

ভাটিয়ালীকে অনেকেই শিল্পীর অলস সময়ের সৃষ্ট গান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন ভাটিয়ালী মানুষের সুখের সময়কালীন গীত ও রচিত গান। এ সময়ে পিছনের দুঃখ কষ্টের কথা মনে করে মানুষ তার স্মৃতি থেকে কথা নিয়ে ভাটিয়ালী গান রচনা করে থাকে। ভাটিয়ালী গান শুধুমাত্র নদী বক্ষে বসেই রচিত হয় এমন নয়, নদীর বাইরের জগতে এসেও এ গান রচিত হতে পারে। যে কোন স্থানই ভাটিয়ালী গান রচনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। মূল বিষয়টি হলো গায়ক বা শিল্পীর মনের ভাবনির্ভরতা। এখানকার লোকসুরে রচিত মনের দুঃখভাব প্রকাশক গানকে ভাটিয়ালী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। ভাটিয়ালীর গায়কী বা প্রকাশরীতিতে সুরের সেই করুণ রূপটিই উঠে আসে। শিল্পীর বা গায়কের মনে ভাব সঞ্চার হওয়ার সাথে সাথে এ গান গীত হয় বলে এর পরিবেশনায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে কম। কোন কোন ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হলেও তা উল্লেখ করার মতো নয়। কোন আসরে যখন ভাটিয়ালীর তত্ত্বযুক্ত গান তাল সহযোগে পরিবেশন করা হয় তখন এর বিষয়বস্তু কিছুটা হলেও বাউল গানের সাথে মিশে যায়। গ্রাম-বাংলার অনেক স্থানেই ভাটিয়ালী গান এখনো 'বাউলা' কিংবা 'বাউলা ভাইট্যাল' গান নামে পরিচিত। ভাটিয়ালীর এ লক্ষণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কোরাস বা সমবেত গানে। এক সাথে গান পরিবেশন করার স্বার্থে স্বভাবিক ভাবেই গানের সঙ্গে যুক্ত হয় তাল। তখন গানের পরিবেশনায় বেশ পরিবর্তন আসে। ভাব

প্রকাশের চেয়ে সমবেত সঙ্গীতের রীতিতে চলার বিষয়টিই গায়কদের কাছে তখন মুখ্য হয়ে উঠে। ফলে গানের গতি পরিবর্তিত হয়ে বাউল গানে রূপান্তরিত হয়। বাউল রূপ গ্রহণ করার যুক্তি উপস্থাপনায় গানের কথার ভূমিকাকে মূল বিষয় হিসেবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ভাটিয়ালী গান স্বাভাবিক রীতিতে যখন পরিবেশিত হয় তখন গানের কথাগুলোয় একটির সাথে অন্যটির যুক্তভাব দেখা যায়। কিন্তু লয় বা গতি পরিবর্তন করে এ গান পরিবেশিত হলে গানের কথাগুলো আলাদা-আলাদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ সময় বাউল বা সারি গানের যে পরিবেশন রীতি তার সাথে ভাটিয়ালী সুরের সংমিশ্রণ ঘটে। ভাটিয়ালী সাধারণত ধর্মীয় ভাবরসের গান নয়, তবে এর পরিবেশনায় ধর্মসাধনার বিষয়টি একটি বিশেষ দিক-দর্শন হিসেবে পরিচয় পেয়েছে। ভাটিয়ালী গান সুফি ও বৈষ্ণব ভাবধারার সাথে কিছুটা মিশ্রিত হয়ে মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা সঞ্চার করেছে। মানব সত্তাকে জানতে দেহ ও মনের সন্ধানই বড়। দেহের মধ্যে মনোজগৎ আছে, তাকে অনুসন্ধানই প্রয়োজন।[২] মানুষের জীবনে পরম সত্যকে অনুসন্ধানে তার নিজ সম্পর্কে জানার বা উপলব্ধির কথা ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে।

'ভাটি শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'ভাটিয়াল', অতঃপর 'ভাটিয়ালী' শব্দ গঠিত হয়েছে। 'উজান বাঁকে যায় রে বন্ধু, ভাইটাল বাঁকে ঘর' ভাটিয়ালী গানের একটি চরণ। নদীর নিম্নদিক অর্থে ভাইটাল থেকে ভাটিয়াল পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভাটি' দেশজ 'ভাটা শব্দজাত, অর্থ 'নদীর স্বাভাবিক স্রোতের দিক'। পূর্ববঙ্গে যেসব অঞ্চল বর্ষাকালে জলমগ্ন হয় সেসব অঞ্চল 'ভাটি' নামে পরিচিতি। ভাটির দেশ বলতে পূর্ববঙ্গের এসব নিম্নভূমিকে বুঝায়। বর্ষা ঋতুতে শুধু গ্রামগুলো জেগে থাকে, নৌকা ছাড়া চলাচল করা যায় না। বাংলার প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত। স্থানান্তরে যাতায়াত এবং বাণিজ্যপণ্যের লেনদেন নদীপথেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই ভাটি তথা নিম্নভূমির নদী পথের নৌকার মাঝির কণ্ঠের গানই ভাটিয়ালী গান নামে অভিহিত।[৩]

নামকরণ নিয়ে গবেষকগণ ভাটিয়ালী সম্পর্কে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। এ গানকে শুধুমাত্র ভাটিবাংলার গান বলে অনেকে মনে করেন। আবার শুধুমাত্র নদীর বুকে বসে রচিত ও গীত গানকেই ভাটিয়ালী বলা হয়েছে। কিন্তু যে গানের সুর নদীবক্ষ হতে দিগন্তে মিশে বাংলার পথ-প্রান্তরকেও সিক্ত করেছে তা কেবল নিম্নবঙ্গেই সৃষ্টি হয়নি, বাংলার অন্যান্য সমতল অঞ্চলেও সাধকগণ ভাটিয়ালী গানের চর্চা করেছেন সমানভাবে। অন্যান্য গীতরীতিতে এটি লোকসুরের বা ভাটিয়ালী সুরের গান নামে পরিচয় পেয়েছে। জনমানুষের লোকসঙ্গীত বলতে আমরা লৌকিক রচনা বা লোকসুরকে বুঝি। প্রাচীন বা ঐতিহ্যবাহী উপাদানে তা পরিপূর্ণ থাকে। লৌকিক উপাদান বলতে যা শহর থেকে দূরে, গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট এমন। যে ভাবনা বা দর্শনের মধ্যে নাগরিক জীবনের ছোঁয়া নেই

বা লাগেনি। ভাটিয়ালী গানকে আমরা সে অর্থে শতভাগ লৌকিক রচনা বলতে পারি। বাউল গানের ক্ষেত্রে কখনো কখনো নাগরিক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার পাওয়া গেলেও ভাটিয়ালীর বেলায় তা অনেকটা কম। ভাটিয়ালীর বেলায় গ্রামীণ মানুষের জীবনাচারের বিষয়টি গান রচনার মূল বিষয় হওয়ার ফলে তা কিছুটা শহুরে মানসিকতা থেকে দূরে বা প্রভাব মুক্ত থেকেছে। সুতরাং ভাটিয়ালী গানের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নিরূপণ করা হল- গ্রামীণ জনমানস হতে সৃষ্ট, মানব জীবনের বিশেষ ধরনের অনুভূতি বা উপলব্ধি যা আত্মমুখী দর্শন ভাবনায় নিমজ্জিত করে, যেখানে প্রকৃতির উপাদানকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে গায়ক ও সঙ্গীত স্রষ্টাগণ আঞ্চলিক ভাষারীতিতে জগৎ-জীবনের নানা বিষয়কে দীর্ঘ বা টানা সুরের মাধ্যমে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ করে থাকেন, এ ধরনের গানকে ভাটিয়ালী বলা হয়। ভাটিয়ালী গানের বিষয়, পটভূমি, পরিবেশ, রূপক-প্রতীক, সুর-লয়, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, নদী ও নৌকার সাথে যুক্ত মাঝি-মাল্লার জীবনকে আশ্রয় করে এ গানের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। বাংলার কৃষক ও রাখালের কণ্ঠেও ভাটিয়ালী গান শোনা যায়। এমন কি বাউল-বৈরাগীও ভাটিয়ালী গান গায়।[৪]

কর্মক্লান্ত কৃষক, মাঝি, শ্রমিক, রাখাল, মৈশাল, বাউল-বৈরাগী যখন অলস মন্থর দুপুর কাটায় তখন সামনে পড়ে থাকা বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর প্রান্তর তাকে অনুপ্রাণিত করে সুর সাধনায়। অবসাদ দূর করবার জন্য তারা নিজ মনের অজান্তেই গেয়ে উঠে উদাস সুরের গান। যা মূল সুরকে ধারণ করে কখনো মুর্শিদি, মারফতি, বাউল নামে পরিচিত হয়ে ভাটিয়ালী গানের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। মূল সুর এসব ধারার লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করলেও ভাটিয়ালী গানের রীতি কখনও নিজ অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া যে রাগিণীতে গান গাওয়া হয় তাকে ভাটিয়ালী বলে।[৫]

পূর্ববঙ্গের হাওড়-বাওড়, নদী-নালা ও বিল অধ্যুষিত অঞ্চলে ভাসমান নৌকার মাঝির কণ্ঠে এ গানের বিরহ-ব্যাকুল, নৈরাশ্যমথিত সুর বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এ সকল গায়কেরা ভাটিয়ালী গানকে কখনই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি। গানের কথায়ও ভেসে উঠেছে বাঙালির নিজ জীবন দর্শনের প্রতিচ্ছবি। ভাটিয়ালী (ভাটিআলি) 'ভাটি' অর্থাৎ নিম্নভূমি এবং 'আলি' অর্থাৎ আইল বা আল (কৃষি জমিতে পানি আটকাবার বা সীমা নির্দেশের জন্য মাটির অনুচ্চ বাঁধ বিশেষ) শব্দ দুটি হতে উদ্ভুত হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে ভাটিয়ালী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- ছোট ছোট আল দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড বিস্তৃত নিম্নাঞ্চলের গানই হলো ভাটিয়ালী। এখানে ভাটিয়ালী শুধু একটি বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত নয় এবং একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিচয়ও বহন করে। পূর্ববাংলার মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সংগীত হলো ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালী এদেশের একটি প্রাচীন সুরও বটে।[৬]

বাংলা ১৩০৯ সালে প্রকাশিত, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খণ্ডে ভাটিয়ালী বা ভাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

fvUv- (দেশজ) নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোত। নদীর স্রোত যখন সমুদ্রের দিকে যায় তখন ভাটা হয়।

fwU- (দেশজ) রজকেরা কাপড় কাচিবার জন্য ক্ষার মাখাইয়া রাখাকে ভাটি কহে।

fwU- (ভট্টি) রাজপুত জাতি বিশেষ। ইহারা চন্দ্রবংশীয় যদু-কুল সম্ভূত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীন কালে তাহাদিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুস্থলী ও গজনীতে রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনন্তর রুমের বাদশাহ এবং খোরাসানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার অধীনে ইহারা পুনর্ব্বার সিন্ধু নদ পার হইয়া পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। দুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির দুইটী পুত্র ছিল। জয়শাল হইতে জশলমীর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। দুশাল ভাট্টিয়ানায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জাঠ ও বত্তু শাখা দুশাল হইতে উৎপন্ন। রাঠোর জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জশলমীর রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভাটি বংশীয়। পঞ্জাবের প্রায় সর্বত্র এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভট্টিয়ানার অন্তর্গত ভাটনের নগর ইহাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। জাট ও ভাটিগণ অধুনা এরূপ মিশ্রিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের মধ্যেও বত্তু ও জইমবর প্রভৃতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাটিগণ উচ্চবংশীয় রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া থাকে।

fwU- সুন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগণা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্ত্তী, উহা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ভাটি নামে অভিহিত হইয়াছে। অক্ষা ০ ২০° ৩০ হইতে ২২° ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি ০ ৮৮° হইতে ৯১° ১৪ পূঃ। জোয়ারের সময় জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জাগিয়া উঠে বলিয়া উহাকে 'ভাটি' কহে। বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা 'ভাটি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

fwUqv- রাজপুত জাতিভেদ। প্রধানতঃ মথুরা, সিন্ধু, গুজরাত, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিন্ধু ও তৎশাখা তীরস্থ প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে ইহাদিগের বাসস্থান। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মথুরার ভাটিয়াগণ ভাটিসিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। পুরানোল্লিখিত যদু বংশ ধ্বংশ কালে ওধু ও ব্রজনাভ নামধেয় দুইজন যাদব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। ব্রজনাভ কিয়ৎকাল রাজা বানাসুরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জীবন রক্ষার প্রতিদান স্বরূপ অসহায় ব্রজনাভকে মথুরা ও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান করেন। ব্রনাভ ও তদ্বংশীয় অশীতি জন নরপতি নির্ব্বিঘ্নে মথুরা নগরীতে রাজত্ব করেন। যদুবংশীয় শেষ রাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে বয়ানাধীশ্বও অজয়পাল, মথুরা আক্রমণ করিয়া জয়সিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিজয়পাল, অজয়রাজ এবং বিজয়রাজ নামক জয়সিংহের তিনপুত্র কনৌজে পলায়নপূর্ব্বক তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভাতৃদ্বয়ের কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা করৌলির নিকটবর্ত্তী এক ভয়াবহ জঙ্গলে গমন করিয়া দেবী অম্বা-মাইর আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাদিগের অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে

তাহারা রাজ্যলাভ বর প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভট্টিসিংহ নামধারণপূর্ব্বক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু জশলমীরের প্রচলিত কিংবদন্তীর সহিত উল্লেখিত মথুরা প্রবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যাদবগণ চতুর্দ্দিকে গমণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দুইপুত্র সিন্ধুতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উহার দিগের মধ্যে শালিবাহন নামক এক ব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়া তথায় স্বীয় নামানুসারে একটী নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে উহারা গজনীরাজ সুলতান মাম্মূদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া জশলমীরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, ভাটিয়াগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়া অবস্থান করিলে রাজপুতগণ তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জন্য উহারা মূলতানে একটী সভা আহব্বান করেন এবং বাদানুবাদের পর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্ব্বপুরুষ হইতে ৪৯ পুরুষ ব্যবধানে স্বগোত্রীয় হইলেও পরস্পরে বিবাহ চলিতে পারে। এই রূপ বংশ ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র নুখ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও একনুখ্ মধ্যে হইতে পারে না। ঐ সমস্ত থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি বা নগর অথবা ব্যবসার নামানুসারে হইয়াছিল। সপ্তগোত্রে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪ নাম আছে। ভাটিয়াগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং হিন্দু রীত্যনুসারেই ইহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিস্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কুলাচার্যের আবশ্যক হয় না। বর কন্যার পিতা অথবা অভিভাবকগণই বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন। কন্যার পিতা মনোনীত ভাবী জামাতার নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা, একটী টাকা ও একটী নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে 'সগুণ' বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা হয়। এইরূপে পাকা দেখা হইলে আর বিবাহের কোন বাঁধা জন্মিতে পারে না। ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবসায়ী। ইহারা কৃষিকার্য্য, চাকরী ও দোকানদারী প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

fwUqvi- (ভাঠিয়ারা) সেনাবাহিনীর পশ্চাদগামী খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি বিক্রয় ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা আপনাদিগকে শেরশাহ-পুত্র সেলিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্করোডস্থ সরাইগুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর মুসলমান দিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা সরাই মধ্যে পথিককে শুইবার ঘর এবং খাদ্য ও রন্ধনাদির উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুর প্রদেশের পশ্চিমবাসী ভাটিয়ারীগণ 'মহীগীর' নামে খ্যাত। ইহারা মৎস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

fwUqvix- রাগীণীবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন রাগীনী নহে। কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি ইহার সংকলন করেন, এইজন্য ইহা ভর্ত্তৃহরিকা ভাটিয়ারী বা ভাটিয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। এই রাগীনী ললিত ও পরজযোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী, স্বরগ্রাম- "ঋ গ ম প ধ নি সা ঃঃ" (সঙ্গীত রত্নাঃ) (যদৃষ্ট)

fvUx- (দেশজ) নদীর স্বভাবিক স্রোত।

fvUx‡ejv- (দেশজ) ভাটীর সময়।

fvU¨v- (ভাটিয়া) দাক্ষিণাত্যবাসী বণিকসম্প্রদায় বিশেষ। ভাটি জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা সর্ব্বোতভাবে হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য, মাংশ বা মৎসভোজন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, গোপাল, কৃষ্ণ

প্রভৃতি বিষ্ণুমুর্তির উপাসক, অপরে শৈব। দেবদ্বিজে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। স্থানীয় সকল দেবতা ও বিগ্রহের প্রতি ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্।[৭]

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'ব্যবহারিক শব্দ কোষ'এ ভাটিয়ারী, ভাটিয়াল ও ভাটিয়ালীকে একই অর্থে ব্যবহৃত শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- ভাটিয়ারী, ভাটিয়াল, ভাটিয়ালী বাংলার লোকসঙ্গীতের সুর বিশেষ, ভাটিয়ালী সুরে গাওয়া গান।[৮]

কাজেই ভাটিয়ালী শব্দটি বা নামটি এ অঞ্চলে অনেক দিন ধরেই প্রচলিত রয়েছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রাচীন নিদর্শনসমূহে ব্যবহৃত সুর কিংবা রাগ প্রকাশসূচক 'ভাঠিআলী' শব্দটি'ই কালক্রমে 'ভাটিয়ালী' নামে পরিচয় পেয়েছে।

'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডি.লিট্ বলেছেন- বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল ভাটিয়ালী। এই গান মূলতঃ পূর্ববাংলার গান। পূর্ববঙ্গের ঢাকা,ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে এই গান প্রচলিত দেখা যায়। বস্তুতঃ পক্ষে ভাটিয়ালী শুধু একটি সঙ্গীতের ধারামাত্রই নয়। ভাটিয়ালী উক্ত অঞ্চলের একটি মুখ্য সুর হিসেবে পরিচিত। 'ভাটি' শব্দটিকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তি হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভাটির চলমান স্রোতের উপর নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে মাঝিরা যে গান গায় তাই'ই ভাটিয়ালী গান নামে পরিচিত। বিস্তীর্ণ নদীর দিগন্ত প্রসারী শূন্যতার বুকে একাকী মাঝির নির্জন একাকীত্ব মোচনের গান ভাটিয়ালী। এ গানে মূর্ত হয়ে উঠে একাকী মাঝির অবসর যাপনের মুহূর্তগুলি। দিনান্তের কর্মক্লান্ত শরীরের বিশ্রামের সময় ভাটিতে নৌকো ছেড়ে গাওয়া মাঝির আত্মনিবেদনের আকুতি বা ফেলে আসা প্রেমিকার কথা ভেসে উঠে এই গানের মধ্য দিয়ে। প্রবহমান উদার নদীর বুকে নিঃসঙ্গ মাঝি মাথার উপর সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশের নৈসর্গিক পরিবেশে ভাব বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার মনের রুদ্ধদ্বার খুলে গিয়ে প্রকাশিত হয় গানের সুর। ভাটিয়ালী নদীর গান হলেও কখনো কখনো এই গানের সুরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের ঢেউ গিয়ে পড়ে প্রান্তরের চাষী এবং রাখালের কণ্ঠেও। এই গানের রচয়িতা মাঝিরা এবং শ্রোতাও সম্ভবত তারাই। গানের মধ্যে একটা সহজ-সরল আবেদন লক্ষ্য করা যায়। সর্বপরি, ভাটিয়ালীর মধ্যে নেই কোন কৃত্রিমতা, ওস্তাদের মারপ্যাঁচ এখানে অচল। প্রাণের সহজ, স্বভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সরল বাণীরূপ ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশকরা হয়, এই গান মাঝির অবচেতন মনের জীবনজিজ্ঞাসা। ভাটিয়ালী গানের বিষয় দুটি- প্রেম ও ঈশ্বর। একদিকে লৌকিক প্রেম চেতনা অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ঈশ্বর চেতনা। মাঝির দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, স্নেহপ্রীতির প্রকাশ ঘটলেও কখনো কখনো অধ্যাত্মিক জীবনের কথাও ফুটে উঠে এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়ে। 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না' গানটিতে ইহলৌকিক জগতের সঙ্গে পারলৌকিক জগতের মেলবন্ধন ঘটতে দেখা যায়। বাউলের 'মনের মানুষ' ভাটিয়ালীতে 'ভব নদীর মাঝি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের নায়ক 'সুজন নাইয়া' জীবনতরীর কর্ণধারও তিনি।[9]

একই গ্রন্থে বরুণকুমার অমর পাল এর উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন- লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাংলার ভাটিয়ালী গান খুবই জনপ্রিয়। 'ভাটিয়ালী' একটি সুর। এই ভাটিয়ালী গান শুধু মাঝি মাল্লারাই করেন না, এই গান সাধরণত গ্রামের সকলের মুখেই শোনা যায়। ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তি পূর্ব বাংলার কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট অঞ্চলেই বলে শোনা যায়। এক কথায় ভাটির দেশের গান বলেই ভাটিয়ালী বলা হয়।[10]

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ আত্মমুখী দর্শন চেতনায় যখন ইহকাল ও পরকালের কথা চিন্তা করে, তখন ভাটিয়ালী গানে ব্যবহৃত নদী ও নৌকা তাদের বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায়। ভাটিয়ালীকে শুধু বিরহ-বেদনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে না ভেবে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন, পরকাল ও বর্তমান জন্মে পূণ্য সঞ্চয়ের তাগিদ কিংবা অনুপ্রেরণার সঙ্গীত হিসেবেও কল্পনা করা হয়। লোকসঙ্গীতের এমন মর্মবাণী নানা সময়ে জৌলুসভরা পৃথিবীর মমতা ভুলে মানবাত্মাকে পরকাল বা ভাটিমুখী করেছে। কাল পরম্পরায় বেয়ে চলা নদীর মত বাংলার লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজ নিঃসৃত এমন সত্য বাণীকে সুর ও কথার মাধ্যমে ধারণ এবং প্রচার করে চলেছে। ভাটিয়ালী সে অর্থে শুধুমাত্র লোকসঙ্গীত নয় বরং লোকদর্শনের পরিচয়বাহী, বাংলার একান্ত নিজস্ব সৃষ্ট ঐতিহ্যগত গীতিধারাও বটে।

Z_¨wb‡‘k

১। ভাটিয়ালী গান, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-২০০২, কলকাতা, পৃ . ৪৯।

২। লোকসংগীত জিজ্ঞাসা, সুকুমার রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ. ৫৮।

৩। বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী-১৯৯৭, পৃ . ১৪।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ . ১৬।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ১৪।

৬। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ . ১৪৫।

৭। বিশ্বকোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা- ১৩০৯, পৃ. ৩২২-৩২৪।

৮। ব্যবহারিক শব্দ কোষ, নতুন সংস্করণ, কাজী আবদুল ওদুদ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলিকাতা, মার্চ-২০০৯, পৃ. ৭৮৪।

৯। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডি.লিট্, অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স-কলকাতা- ২০০৫, পৃ. ৪০১-৪০২।

১০। প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx m½xZvÂj, weeZb I †kwYweb¨vm

আরে ও ভাইট্যাল গাঙের নাইয়া

তুমি কোন বা কইন্যার দেশে যাও রে

সাইডুলি (ভরা) গাঙ বাইয়া।।

ভাটিয়ালী গানের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মনের মানুষকে উদ্দেশ্য করে এমন হাজারো আকুতি রচিত হলেও কোন একটি বিশেষ স্থানকে সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তিস্থল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। যার ফলে পূর্ববঙ্গের প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালী সঙ্গীতাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ভাটিয়ালী সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন- 'ভাটিয়াল' অপিনিহিতির (Empenthesis) ফলে 'ভাইট্যাল' হয়েছে। 'গাঙ' গঙ্গা শব্দজাত। গাঙ মূলের অর্থ ছেড়ে ব্যাপ্তি লাভ করে যে কোন নদী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। পল্লীর গীতিকার 'ভাইট্যাল গাঙের পানি'কে তার 'দুঃখের কাহিনি' শুনাতে চান। ভাটি অঞ্চলের নদী-নালা-বিল-হাওরের নৌকার মাঝির গান ভাটিয়ালী গান। আশুতোষ ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং ত্রিপুরার পশ্চিমাংশকে ভাটি বা নিম্নভূমি রূপে চিহ্নিত করে ভাটিয়ালীকে ঐ অঞ্চলের গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে- ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল তথা নিম্নবঙ্গ ও ভাটি অঞ্চল বলে পরিচিত। তবে সমুদ্রের নিকটবর্তী এ অঞ্চলে জোয়ার ভাটা হয়। আর জোয়ার ভাটার তীব্র স্রোতোবেগ ভাটিয়ালী গানের জন্য মোটেও উপযোগী পরিবেশ নয়। এ সম্পর্কে দিনেন্দ্র চৌধুরী বলেন- পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভাটিয়ালী গানের ব্যাপক প্রচলন। যদিও পূর্ববাংলা আজ আর কোন মানচিত্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নয়। তার অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে অনিবার্যভাবে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট ভারত অর্জন করে খণ্ডিত স্বাধীনতা । বিভাজনের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। পূর্ববাংলা সম্পূর্ণভাবে চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পুনরায় তা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। কালের প্রেক্ষিতে এটাই তার সর্বশেষ অবস্থান। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে বাংলা একটি অখণ্ড বিশাল প্রদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকার অর্জন করেছিল। প্রদেশ, জেলা, মহকুমা, থানা, পরগণায় তা বিভক্ত ছিল। বৃহৎ বাংলার চৌহদ্দি নির্ণয়ে বাংলার পূর্বাঞ্চল পরিচিত হত পূর্ববাংলা নামে। তখন রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার পরিধি বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অসমের অন্তর্গত থাকলেও ভাষা ভিত্তিক কারণে তা ছিল পূর্ববাংলার সংস্কৃতিরই অন্তর্গত, নদী, খাল, বিল, হাওর-উপত্যকা আর শ্রেণিবদ্ধ পাহাড়ের আদিগন্ত নৈসর্গিক পরিমণ্ডলে ঘেরা। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে, নানা ধর্মের অবস্থানে এবং বিভিন্ন আচার, বিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য। উল্লিখিত এ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতরীতির নাম ভাটিয়ালী গান।[1]

আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালী গানের অঞ্চল সম্পর্কে বলেন- ভাটি বলতে কেবল মাত্র পূর্ববঙ্গের (ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ঢাকা) অঞ্চলই যে বুঝায় তাহা নহে, নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ খুলনা, বরিশালের দক্ষিণ অংশও বুঝায়। সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্যাকীর্ণ নিম্নভূমিও ভাটি বলিয়াই পরিচিত। সেই অঞ্চলের লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায় ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটির অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ববাংলার নদ-নদীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদী সর্বদাই জোয়ার ভাটা দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, জোয়ারের সময় হউক কিংবা ভাটার সময়ই হউক, নদীর মধ্যে তীব্র স্রোতোবেগ সর্বদা বর্তমান থাকে। ইহা ভাটিয়ালীর অনুকূল অবস্থা নহে। একদিকে নদী কিংবা জলাভূমির বিস্তার আর এক দিক দিয়া ইহার অলস মন্থর গতি এই সহযোগেই ভাটিয়ালীর উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অবস্থার মধ্য দিয়াই মাঝি কর্মে যথার্থ অবসর লাভ করিতে পারে। এই অবসরের মুহূর্তই ভাটিয়ালীর পক্ষে অনুকূল মুহূর্ত। সুতরাং পূর্ববঙ্গের নিম্নভূমি অর্থে ভাটিয়ালী মনে করাই সঙ্গত।[২]

তবে পশ্চিমবঙ্গেও ভাটিয়ালীর প্রচলন আছে। সেখানেও ভাটিয়ালী গান সমানভাবে গীত হয়ে থাকে। যদিও পরিবেশন ও অন্যান্য বিষয়গত পার্থক্য এ দুই রীতির মধ্যেই দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লারা এ গান বহন করে এনেছে। কেউ কেউ মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজমানস ভাটিয়ালী গানের উদ্ভবের জন্য উপযুক্ত নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- পূর্ববাংলার মাঝি-মাল্লারা সর্বদা পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার্জনের জন্যে যাতায়াত করিত এবং এই সূত্রে তাহাদের নিজেদের অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত পশ্চিমবঙ্গেও প্রচার করিবার সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিমবাংলার সওদাগরদিগের বাণিজ্যতরী পূর্ববাংলার মাঝিরাই বহিয়া দেশ দেশান্তর লইয়া যাইত। মধ্যযুগে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই সওদাগরদিগের ডিঙ্গা ডুবির পর 'বাঙাল মাঝির খেদ' নামক একটি বিষয় বর্ণনা করা হইত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এগুলো পূর্ববাংলার মাঝিদিগের গান এবং তাহাদের মধ্যস্থতায় দেশ-দেশান্তরে এ গান ছড়াইয়া পড়িত। প্রধানতঃ এভাবেই ভাটিয়ালী পশ্চিম বাংলায়ও প্রচারলাভ করিয়াছিল।[3] আবার কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চল ছাড়া যে ভাটিয়ালী গানের প্রচলন নেই এমনটা মনে করারও সঙ্গত কোন কারণ নেই। কবি জসীমউদ্‌দীন যে সকল গান এদেশের গ্রাম বাংলা হতে সংগ্রহ করেছেন সেগুলো মূলত ভাটিয়ালী গান। তিনি 'নৌকার গান' 'মাঝির গান' নামে এ সকল ভাটিয়ালী গান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশও করেছেন। ভাটিয়ালী সম্পর্কে তিনি বলেন- বাংলাদেশ নদীর দেশ। গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র কত নামে কত ভঙ্গীতে নদীগুলো বাংলাদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে। কোন অদৃশ্য সুরকার এই নদীগুলোর রূপালী তারে কোমল অঙ্গুলীর স্পর্শ দিয়া এদেশের শাশ্বতকালের প্রাণের গান ভাটিয়ালী সুর রচনা করিয়া চলিয়াছে। এই দেশের বহু স্থান বৎসরের প্রায় ছয় মাস বর্ষার পানিতে ডুবিয়া থাকে। তখন নৌকা ছাড়া এখানে সেখানে যাওয়া যায় না। যাহারা নৌকা বাহিয়া সুদূর শহরে বাণিজ্য করিতে যায়, অথবা যাহারা ফেরি নৌকার মাঝি হইয়া চড়নদারদিগকে এদেশে সেদেশে লইয়া যায় তাহারা একাদিক্রমে বহুদিন নিজ পরিবার পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পানির উপরে ভাসে। তখন তাহাদের সামনে থাকে সুদূরপ্রসারী নদীপথ। আর উপরে থাকে অনন্ত অসীম নীল আকাশ।

এখানে বসিয়া পূর্ববাংলার মাঝির মনে নানা জিজ্ঞাসার কথা উদয় হয়। এ আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইবো এমনই জিজ্ঞাসার চিহ্ন রহিয়াছে অসংখ্য নৌকার গানে। এ গানের কথা যেমন নদী বক্ষ হইতে আসিয়াছে, সুরও তেমনি নদী-তরঙ্গের নানা মুর্চ্ছনায় আপন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।[4]

জসীমউদ্‌দীন পূর্ববাংলার নৌকার মাঝিকে ভাটিয়ালী গানের মুখ্য রূপকার হিসেবে পরিগণিত করেছেন। তবে মাঝিরাই এ গানের স্রষ্টা নাকি চর্চাকারী সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কারণ সমতল ভূমিতে বসবাস করেও এদেশের অনেক সুরস্রষ্টা ভাটিয়ালী গান রচনা করেছেন যা আজও মানুষের মুখে-মুখে গীত হয়ে চলেছে। ড. ওয়াকিল আহমদ ভাটিয়ালী সংগ্রহ ও সংকলন বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেছেন- ভাটিয়ালী গানের উক্ত পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে গানগুলোর উৎসভূমি ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা, ফরিদপুর জেলা। অতএব পূর্বাপর আলোচনা থেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে ভাটিয়ালী গান মূলত পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের এসব জেলার নৌকা-মাঝির হৃদয়-নিংড়ানো বেদনা-বিধুর মর্মতল থেকে উৎসারিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ভাটি অঞ্চলই হল ভাটিয়ালী গানের আদি সঙ্গীতাঞ্চল। পরে তা পশ্চিমবঙ্গে প্রচার এবং কৃষক-রাখালের কণ্ঠে প্রসার লাভ করে। এমন কি সুর-ভাব মাহাত্মে শহরের শিক্ষিত লোকের কণ্ঠেও স্থান পায় এবং রেডিও-গ্রামোফোনের মাধ্যমে দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[5]

দিনেন্দ্র চৌধুরী ভাটিয়ালী গানের আঞ্চলিক পরিধি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতামত উল্লেখ করেছেন- ভাটিয়ালী সঙ্গীতাঞ্চল ও তার পরিধি ঢাকার সন্নিহিত মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লার অন্তর্গত চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল, নাসির নগর, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, খালিয়াজুড়ি, এবং শ্রীহট্টের লাখাই, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বানিয়াচঙ, আজমীরিগঞ্জ, সল্লা, দিরাই, জগন্নাথপুর ইত্যাদি এলাকা।[৬] এখানে ভাটিয়ালী গানের অঞ্চলকে পরিচয় করাতে গিয়ে প্রায় থানা অঞ্চল পর্যন্তও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভাটিয়ালী যে শুধুমাত্র মাঝি ও নৌকার গান সে বিষয়টিই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। তবে ভাটিয়ালী গবেষক সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ভাটিয়ালীকে 'চাষি ও মাঝির সুখ-দুঃখ, প্রেমভক্তি প্রভৃতি মানবিক অনুভূতি প্রকাশক সঙ্গীত বলে বর্ণনা করেছেন'। সে হিসেবে নড়াইল জেলার বিখ্যাত কবিয়াল 'বিজয় সরকার' সৃষ্ট গান ও কুষ্টিয়ার 'লালন শাহ্ ফকির' এর অনেক গান ভাটিয়ালী সুরের প্রভাবে রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গান মূলত জীবনঘনিষ্ট গীতরীতি যার ফলে এতে অঞ্চলিক বিশেষত্ব যা'ই থাকনা কেন এর সুরের আবেদন মানুষের মনে খুব সহজেই সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন ভাটিয়ালী নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের গান নয় এটি লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ সুর। পূর্ববঙ্গের লোক গীতরীতিতে যেখানে নৌকা, মাঝি প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সে ধরনের গানগুলোকে ভাটিয়ালী গান বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন মনকে মাঝির রূপক এবং দেহকে তরীর রূপক কল্পনা করে যে তত্ত্ব সঙ্গীত গাওয়া হয় তাকে

ভাটিয়ালী গান বলে। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটি ঘরের মধ্যে বা প্রাঙ্গণে সবার সম্মুখে বসে গীত অন্যটি ঘরের বাইরে উন্মুক্ত বা নদীবক্ষে গীত। তিনি ভাটিয়ালী গান সম্পর্কে বলেন- ভাটিয়ালী তো নদী ও নৌকার গান, উন্মুক্ত প্রান্তরের গান। ভাটি পানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মাঝি গান গেয়ে উঠে 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে ওরে আমি আর বাইতে পারলাম না' এই ভাটিয়ালী গানের অসামান্য প্রভাব বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বাউল গানেও ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব আছে। এদিক দিয়ে অর্থাৎ সুরের দিক থেকে ভাটিয়ালীকে বাংলা লোকসঙ্গীতের ভিত্তিস্বরূপ বলা যায়। মেঘনার বুকে বা সুরমা নদীর উপত্যকাও তৎসংলগ্ন হাওর (সাগর শব্দের অপভ্রংশ) অঞ্চল, যেখানে এই সঙ্গীতের খাস জন্মস্থান বলে সঙ্গীতবিদগণ মনে করেন। নদীর ধারে ও বুকের উপর বাস করে যে সব কৃষিজীবি চাষি ও মাঝি- নানা কাজ কর্মের তথা জীবন-জীবিকার মধ্যদিয়ে এর সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছে, ভাটিয়ালী তাদেরই আনন্দ বেদনায় নিবিড় হয়ে উঠেছে। এইসব গানের মধ্যে সাধারণ জন-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিরাভরণ সহজ-সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তত্ত্বকথার চেয়ে মানুষের সুখ-দুঃখ প্রাচীনতর। তত্ত্ব কথা বলতে গেলে মানুষের মনের প্রবীণতার প্রয়োজন হয়। এই কথা স্মরণে রেখে এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করে বলা যায় বাউল গানের অনেক আগেই ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হয়েছে।[৭] সুতরাং এই বাংলা অঞ্চলেই যে ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে ভাটিয়ালী গানের অঞ্চলকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী বলেন- বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই ভাটিয়ালী গানের প্রচলন আছে। সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর। এছাড়া ত্রিপুরা, শিলচর অঞ্চলে ভাটিয়ালী গীত হয়।[৮] ভাটিয়ালী গানের অঞ্চল সমূহের পরিচয় পাওয়া যায় সে অঞ্চলের প্রচলিত গানে। আঞ্চলিক ভাষা এবং জীবনযাত্রার ঐতিহ্যকে ধারণ করে এ গানগুলোর বিস্তার ঘটেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। যেমন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত ভাটিয়ালী গানের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ও বাওই রে, ঝাঁকে উড়ো ঝাঁকে পড় বাওই, কইও তারে সারা রে বাওই

কইও মোর বন্ধুয়ার আগে বাওই, পিরিতে যান মারা রে বাওই

কি জঞ্জাল করিলি বনের বাওই রে।

ও বাওই রে, নলের আগে নল ফুল বাওই, বাঁশের আগে টিয়া

কইও মোর বন্ধুয়ার আগে বাওই, না যেন করে বিয়া।

ও বাওই রে, ওপারে বুনিলাম ধান বাওই, টিয়াই কাইটা নিল

কইও মোর বন্ধুয়ার আগে বাওই, যৌবন বইয়া গেল।

কথা ঃ প্রচলিত, তাল ঃ তেওড়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল

ফরিদপুর অঞ্চলে বাওই পাখিকে উদ্দেশ্য করে অদেখা প্রাণ-বন্ধুকে রাখাল বালক তার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আহবান করেছে।

ও বনের বাওই রে

পান খাইয়াছো পিক ঢাইলাছো রে বাওই

দাঁত কইরাছো ঘোলা, তোমার দাঁতের উপর মানিক জ্বলে

গলায় বন ফুলের মালা।

ও বনের বাওই রে, আমার বাড়ি যাইও রে বাওই

পথে কেদা পানি ওরে গামছা পইরা যাইওরে তুমি

তসর দিব আমি। রাখালী, কবি জসীমউদ্দীন

আবার সিলেট অঞ্চলের গানে একদিকে যেমন গানের সুরে মরমিভাবের প্রভাব রয়েছে তেমনি আরেক দিকে বৈষ্ণব ভাবরসের প্রভাব ও দেখতে পাওয়া যায়। একই তরী অর্থাৎ নৌকা কোথাও মরমিভাবে দ্রুত গতি পেয়েছে আবার কোথাও বৈষ্ণব ভাবরসে তার গতি কিছুটা হলেও মন্থর হয়ে এসেছে। কালাশাহ্ রচিত মরমি চেতনার ভাটিয়ালী গানে এমন রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

হায়রে আমার পাইকল ভাইয়া বৈঠা ফালাইও

পানির রুস চাইয়ারে

বঙ্গিলা বাড়াইয়া দিছি খেরুয়া বানাইয়া।।

আগ চরাটে ময়ুরপঙ্খী রাখিও ধ্যান হায়রে

পড়িলে করতালের বাড়ি বৈঠায় দিও টান।

হাইল ধরিও সিধা করি দিও থাবা বাড়ি হায়রে

লাসঙ্গে তুলিয়া হাইল খেলুয়া যাইও উড়ি।

মুর্শিদ রে তুলিয়া লইও খেলুয়ার মাঝে হায়রে

রাইত দিন বাইয়া যাইও আনন্দ বিরাজে।।

রচনা- কালাশাহ্, সুর- বিদিতলাল দাস, তাল- কাহারবা, সিলেট অঞ্চল

উজান স্রোতে নৌকার বৈঠা বাইলেও রাধারমণ দত্ত সে গানের গায়কীতে মিশিয়েছেন বৈষ্ণব ভাবরসের ভক্তিবাদী চেতনা। নদীর স্রোত ও প্রেমের ভাবরসে তিনি উন্মাতাল হলেও পরপারের বৈঠা বাইতে বলেছেন হুঁস করে অর্থ্যাৎ সতর্কতার সাথে।

জল উজান বাতাস উজান হুঁস কইরা নাউ বাইও রে

সামনে আছে সাধুর বাজার, কিছু কিইন্যা লইও রে

সদা আনন্দ রাইখো মনে।

হরি গুণাগুণ, রাধা গুণাগুণ, কৃষ্ণ গুণাগুণ গাওরে।।

রাধারানীর প্রেম বাজারে রসের দোকান খুইল্যাছেরে

কেহ বেচে কেহ কেনে, দর কইরা কেউ যায়রে।।

ভাইবে রাধারমণ বলে আমার তরী ভাঙারে

জয় রাধার নামে বাদাম দিয়ে ব্রজধামে চল রে।।

কথা ও সুর- রাধারমণ দত্ত, তাল- কাহারবা, সিলেট অঞ্চল

বাঙালির প্রাচীনতম সাহিত্য ও সঙ্গীতের যে সকল নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অন্যতম। এখানেও যে বাংলার অন্যতম গীতি বা সুরধারা ভাটিয়ালীর প্রভাব ছিল সে বিষয়ে কয়েক জায়গায় উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন এ ধারার গান বাংলার নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চর্চিত ছিল না, বরং এর ভাবরস সমগ্র বাংলার আনাচে-কানাচে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ভাটিয়ালী সম্পর্কে হাবিবুর রহমান বলেছেন- বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মাধ্যমেই বাংলার প্রাচীন গীত-সাহিত্যে 'ভাটিআলি' নামক একটি রাগের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়েছিল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। বৌদ্ধ গান ও দোহায় উল্লিখিত 'বঙ্গালরাগ' ভাটিয়ালীতে নামারোপিত হতে পারে।[৯]

প্রাচীন গীতি-সাহিত্য হতে প্রাপ্ত পরিচয় অনুসারে ভাটিয়ালী যদি শুধুমাত্র সুর বা রাগের নাম হয়ে থাকে, তাহলে এর প্রভাব বাংলার সমগ্র অঞ্চলের গীতধারাতে বিকশিত হওয়াই স্বাভাবিক। আবার বঙ্গাল রাগকে যখন ভাটিয়ালী সুরের আদি নিদর্শন হিসেবে আমরা পরিচয় করে দিই তখন ভাটিয়ালী গানের চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলকে জোরালোভাবে ভাটিয়ালী গানের উদ্ভবের অঞ্চল হিসেবে পরিচয় করে দিতে পারিনা। কিংবা এ গানকে শুধুমাত্র নৌকা ও মাঝির গান হিসেবে পরিচয় করে দিয়ে এর পরিধিকে

ছোট করে দেখার অবকাশ আছে বলে মনে করা যায় না। ভাটিয়ালি সুর ও বাউল চেতনার যৌথ প্রকাশ আমরা বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে অনেক স্থানেই লক্ষ্য করি।

আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়

পারে লয়ে যাও আমায়।

আমি একা রইলাম ঘাটে, ভানু সে বসিল পাটে

আমি তোমাবিনে ঘোর সংকটে, না দেখি উপায়।।

কথা ও সুর- লালন শাহ্, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

ভাটিয়ালী সুর বিভিন্ন ধরনের গানের অনুসঙ্গ হিসেবে নানা সময়ে বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। কখনও এ সুর পালাগানে আবার কখনও বাউল, মুর্শিদি, কবি, সারি, জারি, মেয়েলীগীত, বাইচগান, বিচ্ছেদী, বারমাইস্যা ও আধুনিক ধারার গানের সাথে মিশে বাংলা লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। ভাটিয়ালী সুর একটি বিশেষ অনুভূতি বা ভাবের প্রকাশ করে মাত্র, যে সুরের আশ্রয়ে দীর্ঘ ও টানা সুরে গীতিকবিগণ তাঁদের মনের কথাগুলো গীতিকবিতা ও সুরের আশ্রয়ে জনমানসে ছড়িয়ে দেন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে এসে সংসার জীবনের সুখ-দুঃখের বিষয়াদি নিয়েও ভাটিয়ালী গান রচিত হয়েছে।

উজান দেশের মাঝি ভাই ধন, ভাটির দেশে যাও

বাজানেরে কইও খবর দেখা যদি পাও।।

নন্দের চোখে বিষ হইয়াছি শাওড়ির চোখে শাল

ডাইনের কপাল গেছে বাঁয়ে আমার দুস্কেরী কাল

আমার কেঁন্দে কেঁন্দে জনম গেল পন্থের পানে চাইয়া।।

এইনা গাঙ্গে দিয়া রে মাঝি এইনা গাঙ্গে দিয়া

কত নায়র আসে ও যায় আমি থাকি চাইয়া।

এবার যদি না নেয় নাইওর নায়ে ছইয়া দিয়া

কয়দিন পরে আইবার কইও বাঁশের পালঙ লইয়া

আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাবো বিষের বড়ি খাইয়া।।[১০] কথা- প্রচলিত, তাল- কাহার্‌বা, বরিশাল অঞ্চল।

ভাওয়াইয়া গানের মত কোথাও কোথাও নারী মনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসী প্রাণবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে। ভাটিয়ালীর এই প্রকাশরীতি আমাদের কাছে 'বারোমাইস্যা' গীতরীতি হিসেবেই পরিচিত।

আইলা না আইলা না বন্ধুরে

ও বন্ধু রইয়াছো বিদ্যাশ

তোমার লাইগ্যা বন্ধু সোনার, যৈবন করলাম শ্যাষ রে।।

যষ্টি না আষাঢ় মাসেরে আরে ও বন্ধু, গাঙ্গে নয়া পানি

খেললা নারে প্রাণ বন্ধু, সুন্দর নাও দৌড়ানি রে।।

মালেকা বিবির বারোমাইস্যা, তাল- কাহার্‌বা, নোয়াখালী অঞ্চল

বাংলার মধ্যঅঞ্চল যেমন ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ইত্যাদি এলাকাকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালী গান চর্চার ঐতিহ্য অনেক দিনের। এ অঞ্চলে মুর্শিদি প্রভাবিত ভাটিয়ালী গানের বিস্তার সবচেয়ে বেশি। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন নিজে এ ধরনের গান সংগ্রহ ও রচনা করেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী পদ্মার রূপকে এ অঞ্চলের ভাটিয়ালী গানে অকূল দরিয়া বা সাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে

অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে।।

কূল নাই কিনার নাই নাইকো দইরার পাড়ি

আমার অসময় নিদানের কালে দয়াল হও কাণ্ডারী রে।।

আসমানেতে উঠে চন্দ্র সঙ্গে লইয়া তারা

আমার দেহের মধ্যে উঠে চন্দ্র মেঘে রইলো ঘেরা রে।।

সমুদ্রে উঠে ঢেউ কিনারেতে লাগে

আমার দেহের মধ্যে উঠে ঢেউ, তা না কেউ দেখে রে।।[১১]

কথা- কবি জসীমউদ্দীন, তাল- কাহার্‌বা, ফরিদপুর অঞ্চল

ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত গীতিকার মধ্যে ভাটিয়ালী সুর ব্যবহার করা হয়েছে। 'দেওয়ান ভাবনা' পালা গানে সোনাইকে যখন দেওয়ান ভাবনার লোকেরা নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যায় তখন, সোনাই বজরা নৌকাতে বসে ভাটিয়ালী সুরে তার মনের কথা প্রকাশ করেছে।

নিশি রাইত মেঘে আন্ধার আসমানে নাই তারা

অভাগিনি সোনাই আমি রে, আমার চৌদিকে পাহারা।।

মায়ের চরণে আমি জানাই গো প্রণতি

উদ্দেশ্য মা বিদায় মাগি গো

মাগো তোমার সোনাই সতী রে।।

তার পরে প্রণতি করি স্বামীর চরণে

চাইর চক্ষু হইবো না আর এক

বন্ধু আর তো এই জীবনে রে।।

দূর্গা লক্ষ্মী দময়ন্তী সীতা ভগবতী

আভাগিনি সোনাই জানাই রে

জানাই সবাইরে প্রণতি রে।।

আসমান কালা, জমিন কালা, কালা বিধাতায়

এই দুনিয়ায় সোনাইর কেবল রে, বিধি হইলো না এক ঠাঁই রে।।

পালানাট্য দেওয়ান ভাবনা, তাল- কাহারবা

ভাটিয়ালী গানের চর্চার স্থানগুলো যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, শুধুমাত্র নদী বিধৌত অঞ্চলই ভাটিয়ালী গানের মূল ক্ষেত্র নয়। এর বাইরে সমতল ভূমিতেও ভাটিয়ালী গানের বা সুরের চর্চা হয়েছে সমানভাবে। পশ্চিমবঙ্গের খোয়াই, দামোদর, অজয়, গঙ্গা ইত্যাদি নদী-তীরবর্তী কৃষিভিত্তিক সমাজে যে ধরনের ভাটিয়ালী গানের প্রচলন শুনতে পাওয়া যায় তা সমগ্র বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ভাটিয়ালীরই সামগ্রিক রূপ। সে সময়ে নদী পথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ার ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে সাংস্কৃতিরও আদান-প্রদান হতো প্রায় একই কায়দায়। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা

অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক দিকদিয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করার ফলে, বাইরের মানুষের কাছে বাংলা অঞ্চল ছিল ব্যবসা বা বাণিজ্যবান্ধব এলাকা। সঙ্গত কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিভিন্ন সময়ে নানা জাতি, গোত্রের মানুষের আগমন ঘটেছে এখানে। ফলে তাদের বাণিজ্য পসরার সাথে বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত 'ভাটিয়ালী গান' লোকসঙ্গীতের প্রসার ঘটেছে সমানভাবে। পূর্ববাংলাকে ভাটিয়ালী গানের অন্যতম চারণভূমি বলা হলেও, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ পরবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে সাম্যবাদী চেতনার উপর ভর করে শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ যে ভাবরসের সঞ্চার করেছিলেন, তা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনেই দোলা জাগিয়েছিল। আর সে ভাবরস যে সুরের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছিল তার মধ্যে ভাটিয়ালী সুর ছিল অন্যতম আশ্রয়। বাংলা লোকগীতির মধ্যে একটি অন্যতম জনপ্রিয় গীতধারা হিসেবে 'ভাটিয়ালী' যেভাবে জনমানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে তা এ গানের নিজস্ব সুর ও গীতশৈলীর শক্তিতেই। বাংলার যে প্রান্তরেই এর উদ্ভব ঘটুক না কেন, বিস্তার যে সকল বাঙালির হৃদয়কে ছুঁয়েই বা আশ্রয় করে হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

fwUqvjx Mv‡bi weeZb I †kwYweb¨vm

বাংলা গানে ভাটিয়ালী সুরের একটি স্থায়ী ও মজবুত অবস্থান আছে। দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত এ গানের ধারায় কথা ও সুরের ক্ষেত্রে স্থানের পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় গায়কীতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রচলিত এ সুরের সাথে জনমানুষের সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার কারণে এর মধ্যে যে কোন ধরনের পরিমার্জন, পরিবর্ধন খুব সহজেই মানুষের কাছে বোধগম্য হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে লোকসঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্য সেটিও ধারণ করার ক্ষেত্রে ভাটিয়ালী গানের পথকে সুগম করেছে। ভাটিয়ালী গান চর্চিত হয় মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে। লোকমুখে শ্রুত কিংবা গুরুর মুখ হতে সঙ্গীত ধারণ এ দুটো রীতিই মূলত মৌখিক ধারারই প্রতিনিধিত্ব করে। আবার ক্যাসেট, অডিও, রেকর্ড কিংবা যে কোন ধরনের সিডি থেকে হবহু গান কণ্ঠে ধারণ করলেও মূল গানের সাথে নতুন করে তোলা গানের মধ্যে কিছুটা হলেও পার্থক্য থেকে যায়। বর্তমান সময়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে বাণিজ্যিকভাবে স্টুডিওতে বসে গানের রেকর্ড করার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এ ধরনের রেকর্ডগুলোকে তৈরি করাই হয় বাণিজ্যিক বিষয়টিকে মাথায় রেখে। ফলে দর্শক কিংবা শ্রোতার মনোরঞ্জোনের নানা বিষয় ও উপকরণ, বাদ্যযন্ত্র কিংবা সুর ভাটিয়ালী গানের সুরের সাথে মিশে গিয়ে প্রচলিত সুর ও পরিবেশনরীতি থেকে মূল

গানকে কিছুটা হলে আলাদা করে ফেলে। তবে কোন ভাটিয়ালী সুরই তার মূল মাতৃভূমি বা মূল সুর কাঠামো হতে আলাদা হয় না। যদি পরিবেশন কিংবা অন্য কোন কারণে আলাদা মনে হয় তবে সেটিকে ভাটিয়ালী বা ভাটিয়ালী সুর প্রভাবিত গান বলা সঙ্গত নয়। ভাটিয়ালী গানের বেলায় এরূপ সংযোজন মূল ভাটিয়ালী সুরকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে এভাবেই লোকসঙ্গীতে নতুন নতুন গীতধারার সংযোজন ঘটেছে। নাগরিক জীবনে বসেও অনেকে ভাটিয়ালী সুরে গান রচনা করেছেন। কখনও দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কোন ভাটিয়ালী সুরে অন্য কোন কবি পুনরায় কথা বসিয়ে প্রকাশ করেছেন নিজ মনের আবেগ। যেমন-

দমে দমে লইও নাম জিরালী না দিও

পাষাণ মন রে আমার হরদমে লইও আল্লার নাম।।

ও মন রে প্রথমে আল্লাজীর নামে আমি লেখা করলাম শুরু

এক দিকে উদয় ওরে ভানু চৌদিকে পশর।।

ময়মনসিংহ গীতিকা, পালানাট্য-ভেলুয়া

একই প্রকৃতির সুর আবার হালকা মেজাজের গানেও আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। মুর্শিদি ধারা কিংবা সাধু গুরুর আসরে বসে যখন সংগীত পরিবেশন করা হচ্ছে তখন সেখানেও সাধু গুরুকে ভজনা করা হচ্ছে প্রায় একই ধরনের সুরে। এ ক্ষেত্রে বাণীর গঠনে অতি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় মাত্র।

হরদমে গুরুজির নাম লইও রে সাধু ভাই

দিবানিশি লইও রে ভাই কামাই নাহি দিও।।

'ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুরুবাদী এই গানটি প্রভূত জনপ্রিয়'।[১২]

বৈরাগ্যবাদ

দীর্ঘ দিনের প্রেমে অনেক প্রত্যাশা জন্মে, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে থাকে একজন প্রেমিকা কিংবা প্রেমিক। সে সকল স্বপ্ন সাধনায় যখন মনোবাসনা অপূর্ণ থেকে যায় তখন পৃথিবীর প্রতি, পার্থিব কর্মের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সারা জীবন জগৎ সংসারের মায়ায় পড়ে থেকে একজন মানুষের যখন স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার সময় আসে তখন মনে শঙ্কা দেখা দেয়। এই ভেবে যে, পরপারের ধন-সম্পদ বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি সঠিক ভালোবাসা সে প্রদর্শন করতে পেরেছে কতটুকু?। মনে সন্দেহ দেখা দেওয়ার ফলে একজন

সাধক বৈরাগ্যভাবে নিবিষ্ট হয়ে স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে ঘর থেকে বাইরে বেরহয়ে আসে। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, মোহ তখন তাকে আর কাছে টানতে পারে না। বৈরাগ্যভাবে লেখা এমন সঙ্গীতের সুর কোথাও গুরুবাদ আবার কোথাও মানবিক প্রেমের দৃষ্টান্ত হয়ে গীত হয়েছে। আব্বাসউদ্দীন গেয়েছেন-

থাকতে পার ঘাটাতে তুমি পারের নাইয়া

দীনবন্ধুরে, আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া।

আমি দীন ভিখারি পারের কড়ি ফালাইছি হারাইয়া।।

গুরুবাদ

গুরু নির্দেশিত পথ ছাড়া একজন সাধকের পক্ষে সঠিক পথ চিনে স্রষ্টার করুণা পাওয়া সম্ভব নয়। ভাটিয়ালী গানে সেই গুরুর কথা বলা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ও সাধন পদ্ধতির কারণে একই গুরু তার শিষ্যদেরকে নানা ধরনের সাধনার পথ বলে দেন। মূলত যে পথে একজন মানুষ নিজেকে পাপ মুক্ত করার বা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন গুরুর কাজ হলো সে পথের সন্ধান করে দেয়া। বাঙালির দর্শনে গুরুর স্থান অনেক উপরে। গুরু সঠিক পথের সন্ধান দাতা। মনে প্রেম-ভক্তি রসের সঞ্চার ঘটাতে একজন গুরু তার শিষ্যকে সর্বদা সাহায্য করে থাকেন। গুরুর ক্ষমতা প্রকাশ পায় তার শিষ্যদের মাধ্যমে। গুরু হিসেবে একজন সাধক তার অনুসারীদেরকে কতটুকু তার নির্দেশিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারলো সে বিষয়ের উপর নির্ভর করেই গুরুর স্থান নিরূপণ করা হয়। গুরুবাদ সম্পর্কিত গীতিসমূহ এদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় এ ধরনের গানের সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়ে থাকে।

তুমি আমার প্রেমেরি কাণ্ডার, বাবা মাইজভাণ্ডার

তুমি আমার ভবেরই কাণ্ডার।।

অথবা

এসো দয়াল আমার পার কর ভবের ঘাটে

দেখে ভব নদীর তুফান ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠে।।

পাপ-পূণ্য যতই করি, ভরসা কেবল তোমারি

তুমি যার হও কাণ্ডারি, ও দয়াল

ভব-ভয় তার যায় ছুটে।।

সাধনার বল যাদের ছিল, তারাই কূল-কিনারা পেল

দয়াল আমার দিন বিফলে গেল, কি জানি হয় ললাটে।।

কথা ও সুর- বাউল কবি লালন শাহ।

মানবিক প্রেম

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে এবং মনুষ্য প্রজাতিকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে নারী ও পুরুষের মিলন সৃষ্টির আদি থেকেই যা চলে আসছে। একেক সমাজে বা গোত্রে একেক ধরনের রীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে এ ক্রীয়ার সামাজিক বৈধতা প্রদান করা হয়। রীতি অনুসারে পরিবার ও গোত্রের কাউকে যখন তার নিকট আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে অনেক দুরে চলে যেতে হয় সেটি সমাজের সবার জন্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠে। তবে এর মাধ্যমে দূরের কোন মানুষের সঙ্গে যে আত্মীয়তার বাঁধন তৈরি হয় তাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখা হয়েছে। ভাটিয়ালীর এ মানব প্রেমের গান পরবর্তীতে বাংলা গানের ধারায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়েছে। এমনকি আধুনিক কালের সঙ্গীতের নানা ধারায় এ সঙ্গীতের প্রয়োগ দেখা যায়।

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া লো বুবুজান

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।।

ভাটিয়ালীর এ সুরে গান কখনও যাত্রায় আবার কখনও বিয়ের গীত হিসেবে সারা দেশেই বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও পার্বণে গীত হয়ে থাকে। সনাতন ও মুসলিম উভয় সমাজে এ ধরনের বিয়ের গানের বেশ প্রচলন আছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই এ বিষয়ক গান গীত হতে দেখা যায়।

মনঃশিক্ষামূলক

লোককবি মন রূপ তরীর মাঝিকে নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৈঠা চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কখনো সে চলেছে সুপথে আবার কখনো কুপথে। মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য আছে মনঃশিক্ষা পর্বে তার সমন্বয় ঘটে। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার বাউলের যে দর্শন, তার সাথে এর কিছুটা মিল রয়েছে। ধন-সম্পদ সবারই কিছু না কিছু থাকে কিন্তু মানবের কল্যাণে তা কত জন ব্যয় করে। প্রকৃতপক্ষে এসবের মায়া বা মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ভাটিয়ালী গানের সুরে উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। জাত, কুল, গোত্র, ধর্ম সব কিছু মানুষের দ্বারা তৈরি। এর মাধ্যমে যখন সমাজে বৈষম্য তৈরি হয় তখন

সমাজ সচেতন লোককবি গেয়ে উঠেন মানবতার বাণী সম্বলিত ভাটিয়ালী গান। মানব দেহে বসবাস করে ভাটিকবি স্রষ্টা হতে দূরে চলে এসেছেন। পৃথিবীর নানা ধরনের মোহ তাকে দিনে দিনে মূল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরের বোঝা এ দেহতরী তার মনের কথা না বুঝে রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়।

মাঝি বাইয়া যাও রে

অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও।।

ও মাঝি রে, মহাজনের ধন-রত্ন ভাঙা নাওয়ে ভরি

লাভ করিতে আইলাম ভবে হইয়া ব্যাপারী।।

ও মাঝি রে, দুষ্টু ভারি ছয়টি রিপু কথার বাধ্য নাই

গোলমাল করিয়া চাহে ডুবাইতে সবাই।।

ও মাঝিরে, মালের কোঠায় দাওরে চাবি আর তো সময় নাই

নইলে লাভে মূলে হারাইবে জীবনের কামাই।।[১৩]

দেহতত্ত্বমূলক

দেহ'ই হলো একজন লোকসাধকের মূল সাধনক্ষেত্র। এই দেহের মাধ্যমেই জীবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জীব সৃষ্টির নিগুড় রহস্য এখানেই নিহিত আছে। মন ও তার তাৎপর্য এখানেই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এর অনুশীলন পদ্ধতিও এখানে রয়েছে। শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিন্দুধারণ, মনঃচাঞ্চল্য, মৃত্যুলক্ষণ ও ইন্দ্রিয় দমন করার বিষয়টিও এই দেহকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। দেহ থেকে দেহাতীতকে সাধনার যে বিষয়টি লোকদর্শনে বলা হয় তার চর্চা শুরু হয় এই দেহ থেকেই। মানব জনমের ফসল এই দেহ তরীর মুক্তির ফলে আত্মার মুক্তি সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দেহের মধ্যে যে চৈতন্যের অবস্থান তাকে সঠিক ও ভাব সহযোগে জাগ্রত করে পরমাত্মার সাধনায় নিমজ্জিত হওয়ার জন্যেই লোককবিগণ তাদের ভাটিয়ালী সুরে গান রচনা করেছেন।

ও মাঝি বাইয়া যাও রে

অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও।।

ভেন্না কাঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার ছইয়া

আগার থেকে পাছায় গেলে গোলুই যাবে খইয়া।।

শিক্ষা-দীক্ষা না লইতে মনা করছো বিয়া

বিনা খতে গোলাম হইলে গাইটের টাকা দিয়া।।

বিদ্যাশে বিপাকে যার বেটা মারা যায়

পাড়ার লোকে না জানিতে আগে জানে মায়।।[১৪]

ভাটিয়ালী গানের ধারায় যে সকল গান শ্রোতা বা দর্শক হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে আব্বাসউদ্দীন গীত বেশ কয়েকটি গান উল্লেখযোগ্য।

আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া

ঠাকুর ভাইরে কইও আমায় নাইওর নিতো আইয়া।।

এইবার সাথে নাহি রে নিলে, নায়ে ছইয়া দিয়া

আমি নায়র যাবার সাধ মিটাইবো, বিষের বড়ি খাইয়া।।

শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদ এর কণ্ঠে রেকর্ড এ ধারণকৃত

নারী মনের যে বিরহ বা আকুতি তা ভাওয়াইয়া গানে যেমন প্রকাশিত তেমনি ভাটিয়ালী গানেও সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নারী সন্তানের বিয়ের পর বাবার বাড়ির প্রতি তার যে ভালবাসা থাকে সেটির প্রকাশ এ ধরনের লম্বা সুরের মাধ্যমে আরো বেশি করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। নারী কণ্ঠের আবেগ পুরুষ কণ্ঠে ধারণ এটি বাংলা গানের জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। নৌকা ও নদী পথকে কেন্দ্র করে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম রচিত হওয়ার ফলে বাংলা লোকসঙ্গীতও এ পথকে আশ্রয় করেই দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বিস্তার লাভ করেছে। নদী তীরবর্তী কোন বিবাহিতা নারী বাবার বাড়ির দিকে উদ্দেশ্য করে দীর্ঘ দিন ধরে না দেখা পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী দর্শনের আকুতি প্রকাশ করেছে। বাবার বাড়িতে নাইয়র যাওয়া বিবাহিতা নারীর জন্য একটি সুখের বিষয়। স্বামী, সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসার মত এমন ঘটনা নারী সমাজের কাছে কিছুটা হলেও গৌরবের বিষয়। কারণ এর মাধ্যমে পারিবারিক, সাংসারিক জীবনে নেমে আসে প্রশান্তি। এ চিত্রকল্প গ্রাম-বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই ফুটে উঠেছে। বিষয়গত ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া গানের সাথে এ গানের মিল থাকলেও পরিবেশনের ক্ষেত্রে এটি ভাটিয়ালীর

আবেগ থেকে কোন ভাবেই বিচ্যুতি ঘটায়নি। বরং আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণে পরিবেশিত এ গানটি সাধারণ মানুষকে লোকঐতিহ্যের প্রাচীন গীতশৈলী সম্পর্কে জানতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মনের দুঃখের অনুভূতিকে একেক জন কবি দেখেছেন তাঁর নিজের মত করে। এমনই নারী মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে শচীনদেব বর্মণের গাওয়া গানে।

কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া

আমার ভাইধনরে কইও নায়র নিতো বইলা, তোরা কে যাস।।

বছর খানি ঘুইরা গেল গেল রে

ভাইয়ের দেখা পাইলাম না

ছিলাম রে কত আশা লইয়া

ভাই না আইলো গেল গেল রসের মেলা চইলা তোরা।।

প্রাণ কাঁন্দে কাঁন্দে প্রাণ কাঁন্দেরে, প্রাণ কাঁন্দে

নয়ন ঝরে ঝরে নয়ন ঝরেরে, নয়ন ঝরে

পোড়া মনরে বোঝাইলে বোঝে না।

সুজন মাঝিরে ভাইরে কইও গিয়া

না আসিলে স্বপনেতে দেখা দিত বইলা তোরা।।

সিন্দুরিয়া মেঘ উইড়া আইলোরে

ভাইয়ের খবর আনলো না, আনলো না

ভাটি চরে নৌকা ফিরা আইলোরে

ভাইয়ের খবর অনলো না, আনলো না।

ব্যবহারিক দিক দিয়ে ভাটিয়ালী গানের জনপ্রিয়তার কারণে এ গান বিভিন্ন সময়ে নাটক, চলচ্চিত্র ও কাহিনি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে গানের মূল কাঠামোতে কখনও কখনও সামান্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গেছে। সেটি হল গানের পরিবেশনার দিক। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন ও গানকে কাহিনি বা দৃশ্যের উপযোগী করে তোলার জন্য এ ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পরিবর্তনের ফলে ভাটিয়ালী

গানের আবেদনে তেমন কোন ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়নি। বরং গ্রামের কৃষক, শ্রমিকের মুখে মুখে যে গান প্রচলিত তার পরিধি এখানে এসে আরো ব্যাপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে দিনেন্দ্র চৌধুরী বলেন- 'আমায় ভাসাইলি রে' গানটি সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে রাজেন তরফদারের সুনির্মিত গঙ্গা চলচ্চিত্রে গানটি পুনরায় সংযোজিত হতে দেখা যায়। এ বাংলার কালজয়ী সঙ্গীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরী গানটি নতুনভাবে লিখে সুর কাঠামো ঠিক রেখে গানটিতে একটি নতুন মাত্রাও আরোপ করলেন। পদ্মা পারের সুর গঙ্গায় আরোপিত হাওয়ায় গানের জাতিভ্রষ্ট হয়েছে, এমন কথা কেউ বললেন না। এ নিয়ে কোন সমালোচনা বা বিতর্কের অবকাশ তৈরি হয়নি। এর নিহিত আবেদনে দর্শক শ্রোতৃকুল আপ্লুত হলেন অতি সহজে মান্না দে'র অমৃত কণ্ঠের আবেগে ও লাবণ্যে। কথা হচ্ছে, সলীল চৌধুরী'র মত সুরকার কেন অন্য সুর রচনা না করে পারম্পর্যের প্রতি অনুগত শ্রদ্ধায় বিনম্র থাকলেন? এখানে লোকসঙ্গীতের যথার্থতাই প্রমাণিত হয়। শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিকল্প ব্যবস্থা সাফল্য লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতো, এ কথা হয়তো সলীল চৌধুরী ভেবেছিলেন। গানটির মূল সুর ব্যাহত করার তাই প্রয়াস নেই কোথাও। শুধু গানের শুরুতে তালহীন পরে তা তালযুক্ত হয়ে সম্পাদিত। পরীক্ষিত সাফল্যে সৃজনশীল ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় নিজস্ব সৃজন শক্তির অপব্যবহার করেননি কখনও।[১৫]

কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ভাটিয়ালী সুরের গানকে ব্যবহার করা হয়েছে 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রে। কালজয়ী এ গানের কথা ও সুর যেমন মানুষের কাছে পরিচিত তেমনি যে কাহিনিকে কেন্দ্র করে এ গানের ব্যবহার করা হয়েছে সেটি বাঙালির অতি আবেগের স্থান। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের সাথে সাথে এর স্বাধীনতার পতাকা হারিয়ে যায় দীর্ঘ দিনের জন্য। নদীর জোয়ার-ভাটা যেমন তার দু-কুলকে প্লাবিত করে, বাঙালির হৃদয়ের আবেগ এ ক্ষেত্রে অনেকটা সে রকম অনুভূত হয়। বাংলার শেষ স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হতে কবি দেখেননি, কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে বহন করতে হয়েছে। যার ফলে বাংলার মাটি, নদী, মানুষ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির ভাষা কবি খুব সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। নদীমাতৃক বঙ্গভূমিতে মানব জীবনের উত্থান-পতনের সাথে নদীর ভাঙা-গড়া রীতির বিষয়টিকে কবি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক ও নাগরিক জীবনে বসবাস করার পরও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর পরিণত বয়সে এসে বাংলার লোকজীবনের এরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়।

এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এইতো নদীর খেলা

সকাল বেলা আমীর রে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা।।

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়? বাঁধলি বাসা সুখের আশায়

যখন ধরলো ভাঙন পেলিনে তুই পারে যাবার ভেলা।।

এই দেহ ভেঙে হয়রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ

যে কুমোর গড়ে এই দেহ তার খোঁজ নিল না কেহ, রে ভাই।

রাতে রাজা সাঁজে নাটমহলে, দিনে ভিক্ষামেগে পথ চলে

শেষে শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখে সবাই মাটির ঢেলা, এই তো বিধির খেলা।।

ভাটিয়ালী গান নিয়ে চর্চার কোন অন্ত না থাকলেও এ বিষয়ে বিস্তর কোন ধরনের গবেষণা সে অর্থে সম্পাদিত হয়নি। তবে বর্তমান ও নিকট অতীতে এ বিষয়টি গবেষকদের নজরে এসেছে বেশ ভালোভাবেই। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত আকারের ভাটিয়ালী বিষয়ক লেখাও লিখিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। গত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই মূলত এ বিষয়ের উপর লেখালিখি শুরু হয়। গুরুসদয় ও নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন- 'ভাটিয়ালী' মূলত নদী-প্রধান পূর্ববঙ্গের জিনিস। পশ্চিমবঙ্গের মাঝিরা যখন ভাটিয়ালী গান গাহিয়া থাকে, তখন তাহা ভাবে ভাষায় ও সুরে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে।[১৬]

প্রতিভা পত্রিকায় ১৩১৯ সনের অগ্রহায়ণ এবং ১৩২০ সনের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত কয়েকটি ভাটিয়ালী গান আলোচনাসহ প্রকাশ করেন। গানগুলো ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত। একই পত্রিকায় ১৩২২ সনের আষাঢ় সংখ্যায় গোপিনাথ দত্ত 'ভাটিয়ালী গান' শিরোনামে আলোচনাসহ বহু সংখ্যক ভাটিয়ালী গান প্রকাশ করেন। তাঁর গানগুলো ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত হয়। ১৩২৪ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ০৮টি ভাটিয়ালী গান প্রকাশ করেন। তিনি গানগুলো ঢাকা থেকে কলিকাতা ফেরার পথে জাহাজে যাত্রীর মুখে শুনেছিলেন। তিনি বলেন- ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ফরিদপুরের কতকগুলি লোক জাহাজে ভাটিয়াল ও বাউলের গান গাইতেছিল, তাহাদের কাছে শুনিয়া গানগুলি লিখিয়া লই।[১৭] ১৩৩১ সনের ভাদ্র সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় জসীমউদ্দীন 'মুর্শিদা গান' শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে 'মাঝির গান' পর্যায়ের ০৫টি ভাটিয়ালী সংকলিত করেন। গানগুলো ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত।[১৮] ভাটিয়ালী গানের সংকলক হিসেবে প্রথমেই গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত (১৯৬৬) গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। এটি শ্রীহট্টের গণগীত নামে ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সর্বমোট ৬৯টি ভাটিয়ালী গান আছে। বলা বাহুল্য গানগুলো সবই শ্রীহট্ট জেলা থেকে সংগৃহীত।[১৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য ' বাংলার লোকসাহিত্য' ৩য় খণ্ড, ১৯৬৬, গ্রন্থে আলোচনাসহ ৩১টি ভাটিয়ালীর উল্লেখ করেছেন।[২০] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি' গ্রন্থে 'সাধারণ নাইয়া গান' শিরোনামে আলোচনাসহ ১৬টি গান প্রকাশ করেন। তিনি বলেন- নাইয়া গানের অধিকাংশই ভাটিয়ালী সুর প্রধান।[২১] গানগুলো ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত।

ভাটিয়ালী গানের মধ্যে সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে নানা ধরনের শব্দের সংযোজন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভাটিবঙ্গের মানুষ এ্যারোপ্লেন নামক শব্দের সাথে পরিচিত হয়। এর শব্দ শুনে সে সময় নদীতে বা পুকুরে জল আনতে যাওয়া নারীরা আতঙ্কে ঘরে ফিরে আসতেন। অনেকে উলুধ্বনি দিতেন, অনেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধাভরে প্লেনটি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। পূর্ববাংলার সাধকগণ এ বিষয়টিকে নিয়ে রচনা করেছেন ভাটিয়ালী গান।

হায়, আমি কি করি উপায় গো

এরুপ্লেনের শব্দ শুনা যায়।

যত যত বউ ঝিয়ারি জল আনিতে যায়

কাঙ্খের কলসী ভূমে থুইয়া আড় নয়নে চায় গো।[২২]

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় বাঙালি এমন অনেক যানবাহন দেখেছে যার কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক জটিল কর্মকাণ্ডকে লোককবিরা তুলনা করেছেন দেহযন্ত্রের সাথে।

কি আজব কারিগর বান্ধিয়াছে জলের উপর

রচনা কেমতি সুন্দর দেখবি যদি আয়।

মালিকের মেস্তরি কইর‍্যাছে কারিগরি

খালাসি তার ষোল জন প্যাসেঞ্জর কেউ নয় আপন

দোতলার উপরে সারেং কলকাঠি ঘোরায়।।[২৩]

হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীতের বাইরে যে গান জনমানুষের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল ভাটিয়ালী গান। একে বাংলা সঙ্গীতের প্রধান ঠাট বলা যেতে পারে। বিষয়গত বিবেচনায় নানা নামে আখ্যায়িত বাংলার নানা অঞ্চলে বিস্তৃত লোকগানের মূল সুর ভাটিয়ালী। আসামের লোকসঙ্গীতেরও এক ব্যাপক উপাদান বাংলার এই ভাটিয়ালী। বাংলার ভাটিয়ালীর মতো এমন বৈচিত্র্যময় ঢংসমৃদ্ধ, চলনে এমন বিভিন্নতাপূর্ণ এবং স্বর ব্যবহারে এমন সংস্কারমুক্ত সঙ্গীত কোথাও আছে বলে জানিনে।[২৪]

ভাটিয়ালী গানের কথায় উচ্চারণের বেলায় অঞ্চলভেদে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আদর্শ ভাষা অঞ্চলেও একাধিক উপভাষা প্রচলিত থাকে। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের ভাটিয়ালী গানে ভাষা বৈচিত্র্য এসেছে তার অঞ্চলগত বিভাগের কারণে। ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম,

নোয়াখালী, নড়াইল, যশোর অঞ্চলের উপভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকায় এ অঞ্চলে প্রচলিত ভাটিয়ালী গানেও তার প্রভাব পড়েছে। বিষয়টি ময়মনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় উঠে এসেছে-

জল ভরিতে যাইবাম সখি ঐনা নদীর পাশ

ঐনা গাছে সোনার ফুল গো ফোটে বারোমাস।

বারোমাসে বারো ফুল গো ফুইট্যা থাকে ডালে

ঐ পন্থে কলসী লইয়া ফিরবাম সন্ধ্যাকালে।

ভাটিয়ালী সঙ্গীতাঞ্চলের গানে চ, ছ, জ, ঝ শব্দের উচ্চারণে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সিলেট ও চট্টগ্রামের ভাষায় ক এর উচ্চারণ খ এর মতো এবং প এর উচ্চারণ ফ এর মতো শোনায়। আঞ্চলিক প্রভাবে উচ্চারিত একসময় তা লিখিত রূপেও প্রকাশ পায়। যেমন- আসাদুল থেকে আছাদুল, সাদেক থেকে ছাদেক, হাসন থেকে হাছন ইত্যাদি।[২৫] ঢাকার উচ্চারণে ক, চ শব্দের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং স এর উচ্চারণ ইংরেজি এস এর মতো করে হয়। ভাটিগানের অঞ্চলভেদে একই শব্দের ব্যবহারে বিশেষ করে পরিবেশনরীতিতে এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ধরনের কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

gj kã	gqgbwmsn	XvKv	Kwgjøv	wm‡jU	PÆMvg
কোথায়	কই/কুথায়	কই	কুথায়	কই/কুথায়	কবে
পাব	পাইবাম/পাইয়াম	পামু	পামু	পাইতাম	পাইয়ুম
হবে	হইবা	হইবো	হইবায়	অইবায়	অইরা
কন্যা	কইন্যা/ছেড়ি	কন্যা/মাইয়া	কইন্যা	কইন্যা/পুরি	কইন্যা/মাইয়া
ডুবে	ডুইব্যা	ডুইবা	ডুব্বা	ডুইব্ব্যা	ডুবি।

ভাটিয়ালীর যে সুর তাকে এখানে ঠাট বলা হয়েছে। ঠাট এই অর্থে যে ভাটিয়ালী সুর থেকে বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের উৎপত্তি হয়েছে। সুরের ক্ষেত্রে বাংলা গানের বিকাশে এ সুরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ভাটিয়ালী একান্ত দেশীয় গীতরীতি বা কাব্যগীতের ধারায় সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। এখানে গায়ক স্বাধীনভাবে নিজ মনের ভাবরস মিশিয়ে, তারই কথায় জনমানুষের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। যার কারণে ভাটিয়ালীর সুর বহতা নদীর মতো বাংলার একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে সঙ্গীত পিপাসুদের মনে গীতরসের ক্ষুধা নিবারণ করে চলেছে। সামজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, ভাষার বিবর্তন ও ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে লোকসঙ্গীতেরও

পরিবর্তন ঘটে। লোকসঙ্গীতের বা লোকরচনার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এসব কথা স্বীকার করে নিলেও সাধারণ ধারণায় একে মৌখিকধারার প্রভাব বলে মনে করা হয়। লোকসঙ্গীতে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে কখনো কখনো মূলধারার সঙ্গীতকে চিহ্নিত করার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বন, পর্বতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বংশ পরম্পরাগত সঙ্গীতের রীতি কিছুটা হলেও মূলধারাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীতের প্রাচীন রূপ ও বিবর্তনের রূপ নিরূপণের জন্য যে কয়টি বিষয়ের বিচার করা হয় তার মধ্যে সুর, ছন্দ, কথা, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, বাদনরীতি, গায়নরীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে কোন কোন লোকধারার গান সমাজের মানুষের কাছে এমনভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে যে তার রীতিকে অনুসরণ করে আরো অনেক লোকগানের ধারা বিকশিত ও রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গান ও সুর ঠিক তেমনিই একটি গীতরীতি যার বিবর্তনে লোকসঙ্গীতের ধারায় এমন অসংখ্য গীতরীতির উন্মেষ ঘটেছে।

Z_¨wb‡‘k

১। দিনেন্দ্র চৌধুরী, ভাটিয়ালী গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ০৭।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩৪ - ৩৫।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

৪। জসীমউদ্‌দীন, মুর্শীদা গান, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ . ২১৬।

৫। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ২১।

৬। দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৭। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীতঃ বৈশিষ্ট্য ও সুর বিশ্লেষণ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫২ বর্ষ:২য় সংখ্যা,২০০৮, পৃ. ৯০।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৯। হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২. পৃ . ১৪৫।

১০। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত পৃ . ৪২ - ৪৩।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১২। দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ . ৯২।

১৪। কথা ঃ প্রচলিত, সুর ঃ কানাইলালশীল।

১৫। দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১৬। গুরুসদয় ও নির্মলেন্দু ভৌমিক (সম্পাদিত), শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ . ১৪।

১৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ১৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩২৪, পৃ. ৪১৯।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ .২৭৭।

১৯। প্রাগুক্ত, শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, পৃ . ১৪৫ - ১৮২।

২০। আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬ - ৩৫০।

২১। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ . ২১৫ - ২২৭।

২২। দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

২৪। করুণাময় গোস্বামী, প্রসঙ্গ বাংলা গান, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ . ৬৪।

২৫। দিনেন্দ্র চৌধুরী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

Zjbvgj K Av‡jvPbv : fwUqvjx I Ab¨vb¨ avivi MxZixwZ

লৌকিক উপাদান বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো শহর থেকে দূরে, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির সাথে সঙ্গত বা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে। লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত সেই সূত্রে সাধারণ মানুষের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। লোক রচনাকে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিকর্ম ও বুঝায়, যার মধ্যে নাগরিক জীবনের কোন প্রভাব নেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটলেও এখনো পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনে লোকসংস্কৃতি চর্চার বিষয়টি প্রচলিত রয়েছে। লৌকিক রচনা অনেকটাই অপরিবর্তিত। জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটলেও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে না। এক কথায় এটির বিষয়, তথ্য ও প্রকাশরীতি যুগ যুগ ধরে লোকজীবনে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। লোকসঙ্গীত অপরিবর্তনীয় হলেও এটির রীতি, প্রকৃতি বা সুর অন্যান্য ধারার সঙ্গীতে স্থান করে নিয়েছে। উনবিংশ শতকে অভিজাত ও সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের চাহিদার কারণে কবি গানের জন্ম হলেও এ গানের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য জনপ্রিয় গীতরীতি স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীন পালা গানে (পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা) ভাটিয়ালী গানের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। লৌকিক রচনা বা লোক গীতিকবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন-

১। লৌকিক জীবনে সমষ্টির সঙ্গীতের দ্বারা উৎসব ইত্যাদি মাধ্যমে যে গান প্রচলিত আছে। যথা- ক) উৎসবের গান, খ) চাষ সম্পর্কিত ঘটনা, গ) নৃত্য, ঘ) কর্মের প্রয়োজনে, ঙ) ধর্মীয় প্রয়োজনে গান।

২। এ গান কখনো কাউকে শেখানো হয়নি। শ্রবণ করা এবং গানে যোগদানের ফলেই এটি প্রচলিত হয়েছে।

৩। প্রাচীন মৌখিক ঐতিহ্যের দুটো বিষয়ের উপর এটি নির্ভর করেছে। সাধারণের স্মৃতিশক্তি এবং বিশেষ কৃতিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির যোগদান ও গানকে প্রকৃত সুরের রূপে বজায় রাখার ইচ্ছে।

৪। সাধারণ সঙ্গীত ব্যবসা বা সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের যোগাযোগ এর মূলে নেই বা ছিল না, ওদের শিক্ষা ও প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও পরিবারগত। ওদের গান উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়।

৫। বাইরের প্রভাব থেকে এ সঙ্গীত মুক্ত নয় কিন্তু এর মূল সঙ্গীতপ্রকৃতি অনেক বেশি জনপ্রিয়। আদিম লোকসঙ্গীত যতটা স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারে, সে হিসেবে লোকসঙ্গীত তার স্থান থেকে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল ভাব ঠিকই বজায় রেখে চলেছে।

সকল প্রকার লোকসঙ্গীতের বেলায় বিষয়গুলো অনেকটা একই ধরনের কাজ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বলা যায় ভাটিয়ালী বা যে কোন শৈলীর লোকসঙ্গীত কোন শাস্ত্র বা ব্যাকরণ নির্দিষ্ট কোন শিল্প নয়। অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে এর নির্মাণ বা বিস্তার। সময়ের স্বাক্ষর আর পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়ে এক একটি অঞ্চলিক পরম্পরাই এর ভিত্তি। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে লোকরুচি ও জীবন চর্চার পার্থক্য নিয়ে এর প্রবহমানতা।[১] বাংলায় বাউল, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, চটকা, কবি, পালা, জারি, সারি, পাঁচালী, কীর্তন ইত্যাদি ধারার গান নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের মাঝে বেঁচে আছে। এগুলো স্মৃতি এবং শ্রুতির মাধ্যমে (oral tradition) মৌখিক ঐতিহ্য হিসেবে আমাদের মাঝে টিকে আছে। তবে এর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কারণ প্রকৃতি ও পরিবেশই মানুষকে এ সঙ্গীতের কথা যোগান দেয়। যা সুরের মাধ্যমে চর্চা করার ফলে এক সময় আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠে। সংহত গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা চেতনা অনেকটা গৌণ। সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনাই সেখানে মুখ্য। এ কারণে এখানে কোন ব্যক্তি রচিত গান তার নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হবে বিষয়টি এমন নয়। সমাজের সম্পদ রূপেই তা অনুমোদিত হয়ে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়। একার জন্য রচিত কোন গান সমষ্টিগত ভাবেই একক জীবনের গান রূপে গণ্য হয়। ভণিতায় নাম উল্লেখ থাকার ফলে অনেক সময় এ গানের রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। আবার অনেক বিখ্যাত গান ভণিতায় নাম না থাকার ফলে অজ্ঞাত গায়কের গান হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠে। এমন দৃষ্টান্ত এদেশের লোক ঐতিহ্যকে সম্পত্তিশালী করেছে। গোটা সমাজ পেয়েছে উন্মুক্ত সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্র। বৃহত্তর সমাজের মানুষের মাঝে চর্চা ও অনুশীলনের ফলে এ সকল গানের বা সুরের মধ্যে জনমানুষের মনের ভাবাবেগও যুক্ত হয়েছে, ফলে পরিশেনায় কিছুটা পরিবর্তনও এসেছে। প্রাচীন যে ভাটিয়ালী গান আমরা পাই তা ছিল স্বল্প স্বর বিশিষ্ট। আরো প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগের সঙ্গীত ছিল তিন স্বর বিশিষ্ট। পরবর্তীতে এসকল গীতধারায় সাত স্বরের ব্যবহার শুরু হয়। তবে ভাটিয়ালী গানের ক্ষেত্রে স্বল্প স্বরের ব্যবহারের যে রীতি তা অনেকটা প্রচলিত থেকেছে। র, ম, প, ধ এই চারটি স্বরে গীত একটি ভাটিয়ালী গান নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

। ধ - ধ । ধ ম - । প - প । ম র - ।

। পা র্ ক । রি য়া ০ । দে ও রে । মা ঝি ০ ।

। র র ম। ম প -। ম - - । - - - ।

। ম থু ০।রা তে ০। যা ০ ০ । ০ ০ ই ।

। র ম - । র ম - । প ধ - । প ম - ।

। ম থু ০। রা তে ০। গি য়া ০। য দি ০ ।

। ধ ধ - । ধ ধ - । প ধ - । প ম - ।

। কা নাই র । দে খা ০। পা ০ ০। ০ ০ ই ।

তিন বা চারটি স্বরের ব্যবহারে এ ধরনের ব্রতী গান ভাটিয়ালী গানের ভাণ্ডারে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে একই ধরনের ভাব সম্পন্ন ভাটিয়ালী সুরের কাঠামোগুলো পরিচিত এ কয়েকটি স্বরেই গীত বা রচিত হয়। একক ভাবে গীত প্রণয়, বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যের গানগুলো বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবেশিত হওয়ার ফলে প্রয়োজন মতো এর কোথাও কোথাও পরিবর্তন এসেছে। সুদক্ষ গায়কের গায়কীতে এ গানের মূল বিষয়বস্তু ও সুর কাঠামো সঠিকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে পরিবেশনায় বৈচিত্র্য আনতে তারা অধিক সংখ্যক স্বর ব্যবহার করেছেন। ভাটিয়ালী গানের সাথে প্রচলিত গীতরীতির কিছু কিছু স্থানে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

fvwUqv j x Mvb

১. ভাটিয়ালী অবসর মুহূর্তের গান।

২. ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের গান।

৩. ভাটিয়ালী সুরে দীর্ঘ টান আছে।

৪. ভাটিয়ালী গানের নির্দিষ্ট কোন তাল নেই।

৫. ভাটিয়ালীর লয় ধীর ও প্রলম্বিত।

৬. ভাটিয়ালীতে সাধারণত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই।

৭. ভাটিয়ালীর সুর করুণ।

৮.ভাটিয়ালী গানে নৌকার ব্যবহার রূপক অর্থে হয়েছে।

৯. স্বর ও রাগের কিছুটা নির্দিষ্টতা রয়েছে।

১০. ভাটিয়ালী নির্জন এককের গান।

১১. তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ থাকে।

১২. ভাটিয়ালী গানের মূল বিষয় হলো প্রেম।

mwi Mvb

১. সারি গান কর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২. সারি সমবেত কণ্ঠের গান।

৩. সারি গানের সুর খর্ব ও দ্রুত।

৪. সারি গান তালযুক্ত।

৫. সারি গানের লয় দ্রুত।

৬. সারি গানে সারিন্দা, ঢোল, খঞ্জনি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

৭. সারি গানের সুর উৎসাহব্যঞ্জক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসাত্মক।[২]

৮. সারি গান নৌকা ও কর্ম পরিচালনার জন্যেই গীত।

৯. স্বর, সুর ও রাগের চলনে কোন নির্দিষ্টতা নেই।

১০. সারি ক্ষণিক আনন্দদানের জন্য কোলাহল যুক্ত গান।

১১. গানের কথায় তাৎক্ষণিক কর্ম বিষয়ের প্রকাশ থাকে।

১২. সারি গানের বিষয় বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে।

অন্যদিকে ভাটিয়ালী সুর কীর্তন গানে ব্যবহৃত হলেও ভাটিয়ালীর প্রকাশরীতিতে কীর্তনের প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কীর্তনে সঙ্গীতরসের মতো কাব্যরসের ভূমিকা অনেক বেশি। কীর্তন বাঙালির নিজস্ব গান হলেও তা ধর্মকে আশ্রয় করে গীত ও রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের বেলায় ধর্মীয় প্রভাবের বিষয়টি অনেকটা গৌণ বরং প্রার্থনামূলক কোন গান সকল ধর্মের মানুষের কাছে প্রায় সমান জনপ্রিয় হয়েছে। ভাটিয়ালী গান বা সুর একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গীতধারা হলেও আধুনিক বাংলা গানের ধারায় এর স্থান সমানভাবে জনপ্রিয়। গ্রামীণ পরিবেশে ও লোকসাধারণের মাধ্যমে এ গীতরীতির উৎপত্তি হলেও সঙ্গীত বা

পরিবেশনকলার অন্যান্য ধারার মতো প্রায় সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য এ গানের মধ্যে পাওয়া যায়। গীতরীতির সকল বৈশিষ্ট্যসহ ভাটিয়ালীর নিজস্ব কিছু প্রকাশরীতির কারণে এটি জনপ্রিয় গীতধারায় পরিণত হয়েছে। ভাটিয়ালী সরলরৈখিক সুর। এর গঠনে স্বর থেকে স্বরান্তরে আরোহ বা অবরোহের কাজটি মসৃণভাবে গড়িয়ে পড়ে, কোন আলংকারিক উপায়ে নয়। ফলে একটি অবিচ্ছেদ্য প্রবহমানতার সুর পূর্বাঙ্গ থেকে উত্তরাঙ্গে এবং উত্তরাঙ্গ থেকে পূর্বাঙ্গে গড়িয়ে চলে। একে সমতল বাংলা প্রধান সুররীতি বলা চলে। বাণীর আবেদনকে তীব্রতর করে তুলতে এই রীতি সাহায্য করে। কথার অন্তর্গত স্বরধ্বনিসমূহকে টেনে নিয়ে বাণীর মর্মকে এই সুর নিঙড়ে বের করে নেয়। এই সরলরৈখিক মসৃণ প্রবহমান সুর দিয়ে যখন গানের ঢঙটি তৈরি তখন তাতে লম্বা টান যুক্ত হয় গো, ওগো, রে, ওরে, হায় হায় রে প্রভৃতি নানাবিধ সম্বোধনাত্মক উচ্চারণের সাহায্যে। এই লম্বা টান থাকাটা ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য। তেমন লম্বা টান না থাকলেই যে ভাটিয়ালী হবে না, তা নয়।[৩] ভাব ও সাঙ্গীতিক গঠনের দিক থেকে বাংলা লোকসঙ্গীতের অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত নানা উপজাতির সঙ্গীত দিয়ে যেমন তা প্রভাবিত হয়েছে, আবার তেমনিভাবে এর উপর মার্গ সঙ্গীতেরও প্রভাব আছে। তবে এ প্রভাব লোকসঙ্গীতের দিক থেকে মার্গ সঙ্গীতের উপর সবচেয়ে বেশি। কোথাও বাংলা লোকসঙ্গীতকে মার্গ সঙ্গীতের লৌকিক রূপ বা বিকৃত রূপ বলে ধরে নেওয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন এ সকল লোকসঙ্গীত থেকেই মার্গ সঙ্গীতের বিকাশ। বাংলার লোকসঙ্গীতকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় ১. তালযুক্ত গান ২. তালবিহীন গান।[৪] সে হিসেবে লোকসঙ্গীতের সমগ্র ধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা- ১. ভাটিয়ালী ও ২. সারি প্রভাবিত গান। একটিকে ঘরের ভিতরের গান, অন্যটি বাইরের বা উন্মুক্ত প্রান্তরের গান। তবে এ ধরনের সাঙ্গীতিক বিভাগ জনপ্রিয় এ সব গীতরীতির ভিতরকার মূল বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারেনি। একটিকে নারী গোষ্ঠীর বা অন্দরমহলের তালহীন সমবেত গান বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। আর বাইরের কর্ম সম্পর্কিত যে গান সেটি পুরুষের মনের অভিব্যক্তি অথবা পুরুষের কণ্ঠে নারী মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিয়ে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে সকল গীত পরিবেশিত হয় তার সাথে নৃত্যের সহযোগ প্রকাশ পায়। নৃত্যের ব্যবহার যেখানে মুখ্য সেখানে তালের উপস্থিতি অবশ্যই থাকে। সেখানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না হলেও উপস্থাপন রীতিটি তালযুক্ত। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই এই অর্থে যদি একে তালহীন গান বলি বিষয়টি সে অর্থে যৌক্তিক হয়। তালবিহীন বাংলা লোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালী গান লোকসঙ্গীতের ধারার সুরগতভাবে এক মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ সুরকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য লোকসঙ্গীতের সুর রচিত হয়েছে। রাগ সঙ্গীতের একটি বড় অংশ এ সুরের দ্বারা প্রভাবিত। টপ্পা গান হিন্দুস্থানি গীতরীতি থেকে উদ্ভূত হলেও অনেকে মনে করেন এ রীতির উদ্ভব হয়েছে ভাটিয়ালী গীতরীতি থেকেই। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ গায়ক রামনিধি গুপ্ত, যিনি নিধুবাবু নামে পরিচিত, টপ্পা গানের সুর রাগসঙ্গীত রূপে বাংলায় প্রবর্তন করেন, তখন ভাটিয়ালীকেই

তিনি তার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৫] এ সুরের প্রভাবে অনেক সুরই প্রসিদ্ধ হয়েছে। বাংলার কীর্তন গান প্রথমতঃ লোকসঙ্গীতই ছিল, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন নাম দিয়ে যখন তার নতুন সংস্কার করলেন, তখন সুরের মধ্যে ভাটিয়ালীর উপাদান মিশিয়ে নিলেন।[৬] বর্তমান সময়ে বাংলা লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান ধারা উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গানও ভাটিয়ালী সুরের দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেকে মনে করেন। ভাটিয়ালী গানের চর্চা ও উদ্ভবের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হওয়ার ফলে এমন ধারণা করাই সঙ্গত তবে পরিবেশনায় এ দু-রীতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ভাটিয়ালী গান শুধুমাত্র নদী ও নৌকার গান নয়। বাংলাদেশ নদী-মাতৃক দেশ হওয়ার ফলে ভাটিয়ালী সুরের উপর নদী প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলার একটি বড় অংশের অধিবাসীরা নদী কিংবা হাওর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। বর্ষাকালে নিকটবর্তী পাহাড় থেকে যখন জলরাশি সেখানে নেমে আসে, সে সময় নদী কিংবা হাওরের পানিতে স্রোতের সৃষ্টি হয়। বছরের অন্যান্য সময়ে এখানে তেমন পানির প্রবাহ থাকে না। এ সময় জলরাশি প্রায় স্থির থাকে। নদীর এই প্রকৃতির কারণে এসব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক গানের বলয় গড়ে উঠেছে। ভাটিয়ালী সুরে বর্ষা মৌসুমে পানিবন্দি মানুষেরা জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্যের প্রকাশ ঘটায়। অলস জলরাশির উপর নৌকায় বসে অলস মাঝি নিঃসঙ্গ জীবনের কথা সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই সময় মানুষ জীবন-দর্শনের কথা ভাবে না বরং জীবনকে বাস্তবতার আয়নায় তারা উপলব্ধি করে। বাস্তব সত্যটাকে তাদের গানে ধারণ করে।

যাকে আমরা 'ঘরের গান' ভাটিয়ালী বা নিঃসঙ্গ এককের গান বলছি তার মধ্যদিয়ে অন্তর্লোকের মর্মস্পর্শী ও উদার অনুভূতির প্রকাশ পায়। বাংলার অনেক উত্তম লোকসঙ্গীত এই সুরে রচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রেম ও ভক্তির মতো হৃদয়াবেগ প্রকাশে এটি অনন্য। যেখানে মিলনের পরিবর্তে বিরহ আছে, না পাওয়ার বেদনা আছে, ভাবের গভীরতা প্রয়োজন, সেখানে ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার হয়েছে। ভাটিয়ালীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্যে কোন তালের প্রয়োগ নেই। নৌকা ও মাঝির গীত বললে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ অলস সময়ে যদি কেবলমাত্র হাল ধরেই একজন মাঝি এ গান পরিবেশন করে তাহলে সে সময় তালের সঙ্গত করার মতো কোন উপায় থাকে না। ভাটিয়ালী গানে বিশেষ কোন রাগের প্রকাশ তেমন থাকে না। তবে বিলাবল ঠাটের মৌলিক কিছু রূপ এর মধ্যে দেখা যায়। এর সুর পরিবেশনের সময় অনেক চড়া পর্দায় উঠে যায়, ধীরে ধীরে তা খাদে নেমে আসে। এমন নিচু স্বরে এসে কখনো মিশে যায় যখন এ গানের কথা ঠিক মতো শোনাও যায় না। নদীর বুকে নৌকা চলতে চলতে যেমন তা এক সময় অনেক দূরে চলে যায়, হারিয়ে যায় চোখের সীমানা থেকে, ঠিক তেমনিভাবে ভাটিয়ালী গানের সুরেও তার বাস্তব স্বভাবের রূপ প্রকাশিত। জীবন-নামক নদীর বুকে মানুষ কর্ম-নামক নৌকা বাইতে বাইতে এক সময় পৃথিবী

থেকে হারিয়ে যায়। এ গানের যে আবেশ রয়ে যায় তার অর্থ হলো স্মৃতি, যা নদী তীরবর্তী কোথাও ধাক্কা খেয়ে বারবার মানুষের কানে ভেসে আসে।

রাগসঙ্গীত লোকসঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত নয়। লোকসঙ্গীতের রীতি হলো স্বতঃস্ফূর্ত, তবে সাঙ্গীতিক গঠন ও পরিবেশন রীতিতে তো কিছু নিয়ম আছেই, যে কারণে তা অন্য গানকে প্রভাবিত করেছে। বাংলার নিজস্ব মতবাদ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে যে উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব তার নাম 'বাউল'। কোন বিশেষ ধর্মীয় প্রভাবে এটি প্রভাবিত নয়। ধর্মের ও নানা গোত্রের মতবাদ হতে তাদের দর্শন গৃহীত হতে পারে কিন্তু কোন ধর্মকেই তারা অস্বীকার না করলেও মান্য করে না। মধ্যযুগের শেষভাগে এই উপাসক শ্রেণির উদ্ভব। একই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান ধর্মের বাইরে মানবীয় চেতনাকে মূল উপজীব্য করে কয়েকটি সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। দাদু, নানক, কবীর, ইত্যাদি সাধকের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় একই সময়ে বাংলায় একজন আধ্যাত্মিক সাধকের আবির্ভাব ঘটে তাঁর নাম 'শ্রী চৈতন্যদেব'।

বাউলরা কেউ কেউ চৈতন্যকে তাদের গুরু বলে মানেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাথে বাউলের বেশ পার্থক্য রয়েছে। কারণ চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে স্বীকার করতেন, কিন্তু বাউলরা বিগ্রহ মানেনা। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপাসনা পদ্ধতিকে তারা অনুসরণ না করে আত্মপোলব্ধিকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সৃষ্টিকর্তাকে তারা সাঁঈ, মনের মানুষ, আরাধ্য মানুষ, গুরু বা স্বামী মনে করে থাকে। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে তারা নিজের মনের অনুভূতিকে আনন্দলোকে পৌছে দেয়। তাদের মতে ভগবান বা আল্লাহর নির্দিষ্ট কোন অবস্থান নেই তিনি মানুষের মাঝেই বিরাজমান। কেবলমাত্র ধ্যান ও মনের সুগভীর আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। বাউলদের সাধনার অন্যতম পথ হলো সঙ্গীত। ভাটিয়ালী গানের সুরের কারণে মনের গভীরতম অনুভূতি এটিতে প্রকাশ করা সম্ভব।

সাধনায় সুর যুক্ত হওয়ার ফলে ভাটিয়ালী সুরকে মানুষ খুব সহজেই সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভাটিয়ালী সুরে বাউলের তত্ত্বকথা যুক্ত হয়ে তা মানবতার চিরায়ত বাণীতে পরিণত হয়েছে। শ্রেণি, জাতি, গোত্র বিভেদ ভুলে ভাটিয়ালীর সুরে বাউল সম্প্রদায়কে একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রিভূত করেছে। বাউলরা ধর্ম সাধনার পদ্ধতি হিসেবে বৈরাগ্যভাব গ্রহণ করে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকেই মানুষ বাউল মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছে। একক স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে হাতে একতারা নিয়ে তালবিহীন সাধন সঙ্গীতে

তাদেরকে মত্ত হতে দেখা যায়। লোকসঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্য তার প্রায় সবগুলোই ভাটিয়ালী গানের মধ্যে নিহিত আছে। লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী গানের ব্যাপক সংমিশ্রণের ফলে এটি কখনো কখনো ভাটিয়ালীরই প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। মার্গ বা রাগসঙ্গীতের সুর-প্রকৃতি লোকসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এর পরিবেশনরীতিতে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

fvwUqv j x Mvb

১. ভাটিয়ালী গান গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিভিত্তিক জনসমষ্টির সৃষ্টি।

২. নিরক্ষর কিন্তু শিক্ষিত মননের সৃষ্টি, এ কারণে প্রচলিত অনেক বিষয়াবলী এ গানে স্থান পেয়েছে।

৩. অলিখিত এবং লোকপরম্পরায় মৌখিক ঐতিহ্যের প্রকাশশৈলী।

৪. পরিবেশনায় কোন ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করে না।

৫. লোকমানসের স্বাভাবিক মনের মেঠো ভাষায় প্রকাশ।

৬. বিষয়বস্তু লোকজীবন সম্বন্ধীয়।

৭. সহজ-সরল সুর ও ছন্দে প্রকাশ। অনেক সময় সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল।

৮. ভাটিয়ালী গান এককভাবে গীত হলেও সমষ্টির মনের চেতনা প্রকাশিত।

৯. সুরে আলাপের কোন সুযোগ না থাকলেও শুরুর সুরটি নিজের মতো করে গাওয়া হয়।

১০. লোকসঙ্গীতের উৎস মার্গ বা রাগসঙ্গীতে নয়।

১১. লিখিত সাহিত্যও লোকসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে।

১২. প্রকৃতির উপাদান রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, গানের বাণীকে আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী করার জন্য।

iv Mm½xZ

১. রাগসঙ্গীত উচ্চবিত্ত কেন্দ্রিক সমাজকে ভিত্তি করেই চর্চিত।

২. সুশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের পরিশীলিত মননের দ্বারা সৃষ্ট।

৩. এটির লিখিত রূপ পাওয়া যায়।

৪. স্থির ও সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ আছে।

৫. নাগরিক কবি মনের সযত্ন প্রয়াস এবং চেতনাবদ্ধ ভাষার ব্যবহার।

৬. লোকজীবন বহির্ভূত উচ্চ জীবনের প্রভাব স্পষ্ট।

৭. সুরের প্রয়োগ কৌশল অনেকটা জটিল ও অপরিবর্তনশীল।

৮. ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়ায় কোন সংহতি কিংবা সমষ্টি চেতনার চিহ্ন এখানে নেই।

৯. রাগসঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে আলাপধর্মী। আলাপের বা সুরের উপর ভিত্তি করেই এর মূল রূপ গড়ে উঠেছে।

১০. রাগসঙ্গীতের কোন কোনটির মূল উৎস লোকসঙ্গীতের (ভাটিয়ালী) সুরে নিহিত।

১১. লিখিত সাহিত্য রাগসঙ্গীতে রূপগ্রহণ না করলেও প্রাচীন অনেক সাহিত্যের পরিবেশনশৈলী এ সঙ্গীতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতো।

১২. কথার গ্রাহ্যতা নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র সুরের মাধ্যমেই আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ পায়।

ভাটিয়ালী গান প্রাচীন কবিওয়ালাদের গানকে বেশ প্রভাবিত করেছে। আবার অনেক কবিওয়ালা ভাটি সুরে গান রচনা করে এ গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবি গানের নানা পর্বে (মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, চাপান, উতোর, ফুকা, মেলতা, খাদ) ভাটিয়ালী সুর ও গানের ব্যবহার স্পষ্ট। কবি গান লিখিত আকারে পরিবেশন করা হলেও আসরে বা উপস্থিত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে তা কোন ধরনের নিয়ম অনুসরণ করে চলতো না। সেখানে দর্শকের প্রয়োজনে এবং আসরে উপস্থিত বিপক্ষ গায়কের প্রশ্নের ধরনের উপর নির্ভর করে তাৎক্ষণিক গান তৈরি করতে হতো। স্বভাবকবি, চারণকবি বা লোককবির পক্ষেই যা কেবল নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। ভাটিয়ালী ও কবিগানের গঠন ও পরিবেশনগত বিষয় লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১. মহড়া ঃ একে মোহরা বা অগ্রভাগ বলা হয়। এ সময় গান পরিবেশন করা হয় মন্দ্রসপ্তক থেকে। ভাটিয়ালীতে যাকে বলা হয় স্থায়ী অংশ। সাধারণত গলা সাধনা করার মতো রীতিতে এ অংশে সুরের সাধনা করা হয়।

২. চিতেন বা চাপান ঃ কবি গানের মহড়ার পরের অংশই হলো চিতেন। যেটি অনেক উচ্চস্বরে পরিবেশন করা হয়।

৩. পরচিতেন বা উতোর ঃ এটিকে অন্তরা অংশ বলা যায়। যদিও কবি গান আধুনিক কাব্যগীতির গঠনশৈলীকে অনুসরণ করে না। এ অংশে রামপ্রসাদি ও ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার সর্বাধিক।

৪. ফুকা ঃ ফুৎকার, উচ্চস্বরে বলা। জোরে কথা বা সুর পরিবেশন করলে বিষয়গত দিকদিয়ে প্রতিষ্ঠিত রূপ প্রকাশ পায়। ভাটিয়ালী গানেও এমন উচ্চ ও সর্বোচ্চ কণ্ঠের ব্যবহার ভাটিশিল্পীর আকুতিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫. মেলতা ঃ মেলতা অর্থ মিলন বা ঐক্য। রাগসঙ্গীতের পরিভাষায় মেলতা বলতে ঠাট বোঝায়। এখানে মেলতা বলতে সুরে ফিরে আসার বিষয়কে বলা হয়েছে। যে স্বরে স্থায়ী থেকে অন্তরায় যাওয়া হয় বা যেখানে এসে অন্তরার সুরের শেষ হয় তা হলো মেলতা। মেলতার মাধ্যমে সুর পরিবেশনে প্রশান্তি বা বিশ্রাম আনে।

৬. খাদ ঃ খাদ অর্থ নিচু স্বর। সুর পরিবেশনার সময় যখন দীর্ঘ টান শেষ হয় সাধারণত তার পরের সুরটিই নেমে আসে খাদে। খাদে সুর বলতে উদারা সপ্তকে সুর নেমে আসে। ভাটিয়ালী সুরের গভীরতা বুঝাতে এবং সাধকের ধ্যানকে আরো বেশি আত্মমুখী করার লক্ষ্যে সুর পরিবেশনায় খাদ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর-বাংলার অন্যতম পরিচিত সুর ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে ভাটিয়ালীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে দুটি গীতধারার মধ্যে বাক্যের গঠন ও সুরগত পার্থক্যই এদেরকে নিজ নিজ গীতধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাওয়াইয়া মূলত বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের গান। ভাটিয়ালীর মতো এ গানের মধ্যে টানা সুরের ব্যবহার থাকলেও ছন্দের প্রয়োগে ভিন্নতা এনেছে। ভাষাযুক্ত সুর ও তাল এর সমন্বিত রূপকেই ছন্দ বলে। ভাওয়াইয়া পরিবেশনের জন্য দোতরা প্রয়োজন হয়, ভাটিয়ালীর ক্ষেত্রে তা দরকার পড়েনা। বর্তমানে ভাটিয়ালী গানে যন্ত্রানুসঙ্গ হিসেবে দোতরার ব্যবহার দেখা যায়। ভাওয়াইয়া মৈষালবন্ধুর গান, আর ভাটিয়ালী নৌকার মাঝির গান। ভাওয়াইয়া যেমন নারী মনের অভিব্যক্তি প্রকাশক গান তেমনি ভাটিয়ালী পুরুষ মনের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে। ভাটিয়ালী গানের মূল নায়ক চাষি ও নৌকার মাঝিরা ভাওয়াইয়া গানের মূল নায়ক চাষি, মৈষাল বা গাড়িয়াল বন্ধু। একজন গায়ক মহিষের পিঠে চেপে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছে আর অন্যজন নৌকার উপর চড়ে নিজের মনের কথা সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে চলেছে। ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া উভয় গানে স্বরের ব্যবহার প্রায় কাছাকাছি। উভয় গানের সুর শুরু হয় অনেক উপর থেকে এবং উভয় গীতধারার পরিবেশনরীতিতে স্বরারোহনের ক্ষেত্রে তিন সপ্তকেই সুরের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। সুর জাতি পরিচয়ের অন্যতম শৈল্পিক বাহন। সুরের উদগাতা হচ্ছে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতায় উদ্ভূত সামাজিক জীবন। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবন সংগ্রামের তথা জীবনযাপনের কাঠিন্যতা-সহজতা, উপাদান কৌশল, নদীবহুলতা, পাহাড়-পর্বত, উঁচু নিচু অসমভূমি, সমুদ্র তটরেখা,

উষ্ণ অথবা শীতল অথবা নাতিশীতোষ্ণতা, প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রম জীবনের অনুসঙ্গে পৃথিবীতে সুরবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্প লোকগীতির মধ্যে এটা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত মাধ্যমের মধ্যে এতটা জীবননিষ্ঠ শিল্প আর দ্বিতীয়টি নেই। এ শিল্পে রয়েছে শ্রম, শ্রমজীবন ও শ্রমজীবি মানুষের প্রবঞ্চনার ইতিহাস।[৭] কোন একটি লোকধারার গান সমাজ কর্তৃক তখন মূল্যায়ন পায়, যখন সে গানের মধ্যদিয়ে সমাজের মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। আমজনতার জীবনঘনিষ্ঠ না হলে সে গান কিংবা লোকসঙ্গীত সাময়িকভাবে অনেক জনপ্রিয় হলেও স্থায়ীত্বের বিচারে তা আর টিকে থাকে না। অন্যান্য গীতিধারার মতো লোকসঙ্গীতের রচয়িতাগণ উচ্চ শিক্ষিত বা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা গ্রাম্য সমাজে বসবাসকারী মাটি ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ লোকজীবনের ছাপ রেখে যায় তাদের সৃষ্টিকর্মে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে তাই লোকসঙ্গীত তথা ভাটিয়ালী গানের সুর, লয়, কথা ও তালের ব্যবহারে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। স্রোতের টানে নৌকা বাওয়া, পাল তুলে নৌকা বাওয়া, চাষিদের ধান নিড়ানি, ধান কাটা, পাট কাটা, রাখালের গরু চরানো, মৈষালের মহিষ চরানো, গাড়োয়ানের গাড়ি চালানো, মেয়েলী গান, বিয়ের গান এসব ক্ষেত্রেই পরিবেশের প্রভাবে সুরের এবং কথার বৈচিত্র্য, ভাবের বৈচিত্র্য লোকগীতির আবেদনকে আরো গভীর, হৃদয়গ্রাহী ও সর্বজনীন করেছে। সারি বেঁধে ধানকাটার সময় চাষি গান গায়-বারাসে, ভাওয়াইয়া, চটকা বা সমবেতভাবে পালাগান। এগুলো গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ, আমজনতার নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, গণসংস্কৃতির এক স্বতঃপ্রণোদিত রূপ। প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাব ও রস সৃজনের কত সহায়ক হয়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত মেলে ভোর রাত বা ঊষাকালে শান্ত প্রকৃতি, এমনি পরিবেশে হঠাৎ শুনতে পাওয়া যাবে নৌকার কোন মাঝি অথবা রাতে মাছ শিকারী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত জেলে গাইছেন- 'দাও খুলে দাও মন্দিরার দোয়ার লাগুক শীতল হাওয়ারে, রাত তুই যারে যা পোহায়ে'।[৮]

লোকসঙ্গীত সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা কালের প্রভাব নেই। মানুষের মনের উপরই নির্ভর করে এ গানের কথা ও সুর সৃষ্টির বিষয়টি। কোন একটি দৃশ্যমান বিষয়কেও কেন্দ্র করে এটি রচিত হয় না, তবে যে আবেগ বা অনুভূতি এ গান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করে তা লেখকের মনের অন্তরালেই থেকে যায়। শ্রোতা কিংবা সমাজের অন্যান্য জনগণ কবির মনের প্রকাশিত রূপকেই দেখতে পাই। তবে বিশেষ কিছু নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গীতে প্রায় একই ধরনের জীবনচিত্র দেখা যায়। এর কারণ হলো সমাজ ও জীবনের একমুখীতা। আদিবাসী জীবনে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে একই ধরনের রীতি-নীতি সবাইকে একইভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায়। তাদের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলও প্রায় একই ধরনের থাকে। জীবনের টানাপোড়ন, হাসি-কান্না সবকিছুর মধ্যেই একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের সমাজের বাইরে প্রচলিত কোন জনপ্রিয় গীতরীতি দ্বারা নৃ-গোষ্ঠীর গান প্রভাবিত হয় না। আলাদা আদিবাসী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতির প্রচলন থাকার ফলে তাদের সৃষ্ট গানগুলি খুব কম সংখ্যকই অনান্য জাতি

কিংবা শ্রেণির মানুষকে প্রভাবিত করে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভাষারীতি প্রচলিত থাকে সে ভাষায় কোন জনপ্রিয় গান কিংবা কবিতা রচিত হলে সেটি খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে আশ্রয় করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। খুব দ্রুতই সেটি সমাজের সার্বিক জনগোষ্ঠীর চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত শুধুমাত্র সঙ্গীতই নয়, এর সাথে সমাজে প্রচলিত যত ধরনের আচার কিংবা রীতি-নীতি রয়েছে তা এভাবেই সমাজের কোন একটি স্থান থেকে সৃষ্টি হয়ে পরবর্তীতে সবার লালন ও পালনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানও সৃষ্টির সময় তালহীনভাবে শিল্পীর নিজের মতো করে গীত হয়ে পরবর্তীতে জনমানুষের মনের তাল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে ভাটিগানের গায়ক হলো মাঝি-মাল্লারা। এদেশের প্রধানতম যোগাযোগের মাধ্যম একসময় নৌকা ছিল। নৌকার মাঝিরা গান করে, সেই মাঝির গানই হলো ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালীর সুরে আছে মানবিকতা। বেদনা, বিষাদ, বিচ্ছেদ ভাটিয়ালী সুরের সাথে মিশে রয়েছে। এ গান ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি মনের ভাব-প্রকৃতিই এখানে প্রকাশিত। ভাটিয়ালীর গতি অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির। ভাটির গতি-প্রকৃতির সাথে মিল থাকার ফলে নদীর স্রোতের এ চলাচল গানের সুরকেও প্রভাবিত করেছে। জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বলে ভাটিয়ালী এক সময় নদী থেকে সমতল ভূমিতেও সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নদীর ধীরগতির ভাটিয়ালী গ্রাম্যজীবনের সাধারণ মানুষকে দিয়েছে প্রশান্তির ছোঁয়া। রাখালের গানের সাথে মিশে চলে এসেছে খোলা প্রান্তরে বা মাঠে। অনেকে মনে করেন বাংলার একান্ত নিজস্ব গীতরীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিচ্ছেদী ভাবরস ভাটিয়ালীর সুরে প্রভাবিত। এরই ধারাবাহিকতায় কীর্তনের সুর ও বিষয়বস্তু সঙ্গীতপ্রেমী বাংলার সর্বত্রই ভাক্তিরসের সঞ্চার করেছিল। ভাটিয়ালী সুর তার নিজস্ব গীতরীতির কারণে বাংলা গানের প্রায় সকল শাখাকেই প্রভাবিত করে এদেশের লোকসংস্কৃতির বিস্তারকে সহায়তা করেছে।

Z_¨wb‡‘k

১। দিনেন্দ্র চৌধুরী, ভাটিয়ালি গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোলকাতা, পৃ, ৮১।

২। ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ . ৩৩।

৩। ড. করুণাময় গোস্বামী, 'ভাটিয়ালি' গণকণ্ঠ, ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ১৫।

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০০৫, পৃ . ১০৬।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ১০৭।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

৭। ড. আবদুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি:একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, বাংলা একাডেমী,-২০০৭, পৃ. ৩৪৯।

৮। প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

MvgxY Ges bvMwiK Rxe‡b iwPZ fwUqvjx Mvb I Gi MVb

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের চিরায়ত সঙ্গীত ঐকিক (মেলডি) সঙ্গীতরূপে বিকশিত। মেলডির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশই আমাদের সঙ্গীতের প্রাণধারাকে সজীব করে রেখেছে। এই মেলডিকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের নানা রীতি সৃষ্টি হয়েছে অথবা বাইরের কোন সুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর মধ্যে একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। লোকসঙ্গীতের মত রাগসঙ্গীতও মেলডি নির্ভর। রাগসঙ্গীতের মেলডির দেহে লোকসঙ্গীতকে মিশিয়ে নিয়ে পরিবেশনা তৈরি করা এদেশের সঙ্গীতরীতির একটি প্রাচীন বৃত্তি বা স্বভাব। দু'হাজার বছরের সঙ্গীতের ইতিহাস একই কথা বলে। প্রাচীন কাল থেকেই সঙ্গীতের কথা ও সুরের সাথে প্রাসঙ্গিক সামাজিক বিষয়বস্তুকে যুক্ত করে শাস্ত্রকারগণ লোকধারার সঙ্গীত নির্মাণ করেছেন। প্রাচীন সঙ্গীত নির্ভর ধর্ম গ্রন্থে এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের গাথা ইত্যাদি, অথর্ববেদের পূজা অর্চনার নিয়মবিধির বর্ণনায়, নানান সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, মন্ত্রাদি তৎকালীন লোক রচনার (লোকসঙ্গীত) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দিক থেকে শতপথ ব্রাহ্মণের এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভূক্ত গাঁথার কথা উল্লেখ করা যায়। অথর্ববেদের গুহ্যসূত্র সম্ভবত প্রাচীনতম বিবাহের গানের উদাহরণ। এইত হল খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছর আগেকার লোক রচনার প্রকৃতি।[১]

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করা যায় 'দেশ' রাগের সূত্রে। সাধারণত মার্গসঙ্গীতের প্রভাব ও নিয়মপ্রণালী মুক্ত সঙ্গীতকে 'দেশি' সঙ্গীত বলা হত। 'দেশি' প্রচলিত সঙ্গীত তবে লোকসঙ্গীত নয়। কিন্তু এসব গানে যে সকল রাগ ব্যবহার করা হত তা এদেশের লোকসঙ্গীত থেকেই এসেছিল। তবে এগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার করে গ্রহণ করা হত। এ প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন- সাধারণত দেখা যায় অপরিণত আদিম জাতি বা শিশুজাতিদের সঙ্গীতে তিন কিংবা চার স্বরের গঠিত রাগমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে চার স্বরের সমষ্টি তা আর্য সঙ্গীতের পরিধির বাইরে পড়ে এবং তার জন্ম স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন আদিবাসীদের রাজ্যে, অর্থাৎ চার স্বরের রাগ অনার্য পর্যায়ে পড়ে। মাতঙ্গ রচিত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

প্রাচীন বাংলার প্রায় সকল জনপদকে কেন্দ্র করে এমন লৌকিক সুরের প্রচলন ছিল। বৃহদ্দেশী'র প্রায় কয়েকশত বছর পরের গ্রন্থ 'সঙ্গীত রত্নাকর' এ দেশি রাগ সম্পর্কে ঠিক একই প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। দেশি রাগকে বলা হয়েছে 'রাগসঙ্গীতের পূর্বপুরুষ'।[৩] রাগরূপের প্রয়োগ এসব সুরের ক্ষেত্রে কিয়দংশ বাকিটা প্রাচীন ধারার লোকসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ। প্রাচীন ধারাশ্রয়ী প্রায় সকল প্রকার লোকগীতির ধারা ছিল প্রবন্ধগীতের অন্তর্গত। গান বা কাহিনিগুলো সুবিস্তৃত থাকার ফলে একে 'পাঁচালী' গান বলা হত, কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন 'পাঞ্চালিকা'। লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন গ্রামের সাধারণ মানুষের হাত ধরে চর্চা ও সৃষ্টির মাধ্যমে এর স্থানকে মজবুত করেছিল, অন্যদিকে রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে জনপদের বাইরে

সুধীসমাজের কাছেও এটি সমাদৃত হয়ে উঠে। ভাটিয়ালী গানের মধ্যে এর কথায় ভাবের গভীরতা ছাড়া তেমন কোন নতুনত্ব দেখা যায় না। এদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ভাটিয়ালী গানের রূপ বিশ্লেষণে প্রায় একই ধরনের সুররূপ পাওয়া যায়। ভাব ও কথার মিশ্রণে করুণ ও বিরহের সুর মিলিত হয়ে যে আবেদন তৈরি করে তা এদেশের গীতিকাব্যের এক অনন্য উদাহরণ। ভাটিয়ালীর এমন বিষয় সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন- বিষয়ের দিক থেকে ভাটিয়ালীর তিনটি প্রধান ভাগ আছে। লৌকিক প্রেম, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা ও আধ্যাত্মিকতা। এই তিনটি ধারার মধ্যে লৌকিক প্রেম-বিরহের ভাটিয়ালী গানই আদি স্তরের, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা যখন জনপ্রিয়তা লাভ করে তখন অন্য অনেক গানের মত ভাটিয়ালী গানেও তা সাঙ্গীকৃত হয়। এ সময়কে চৈতন্যোত্তর কাল বলে অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়। গৌরলীলা বিষয়ক গান সুনিশ্চিতভাবে চৈতন্যোত্তর কালের গান। আধ্যাত্মিক স্তরের গানগুলোতে অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্বের কথা রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রূপক-প্রতীকের ভাষায় তত্ত্বারোপ আরো পরবর্তীকালের চিন্তার ফসল। ভব সংসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং আল্লাহ, দয়াল গুরু, মুর্শিদের চরণ আশ্রয় কামনা করে এসব গান রচিত হয়েছে। এদিক থেকে বৈষ্ণব-সুফি-বাউল ভাবনার সাথে ভাটিয়ালীর এ শ্রেণির গানের নিকট সম্পর্ক আছে। ভাটিয়ালীর অনেক গানে বৈষ্ণব-সুফি-বাউলপদের মত ভণিতাও ব্যবহৃত হয়েছে। এ গানের রচয়িতারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাদের আবির্ভাবকালের ইতিহাসের সাথে আধ্যাত্মতত্ত্বের ভাটিয়ালি গানের উদ্ভব কালের ইতিহাস জড়িত আছে।[৪] লোকপ্রেম বিষয়টি কোন মানুষের একার বিষয় নয়। লৌকিকভাবের ভাটিয়ালী গানের চর্চার ইতিহাস কত দিনের তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বেশ কঠিন। আর যাকে আমরা মাঝি-মাল্লার গান হিসেবে বলছি তা মাঝির কণ্ঠে গীত? নাকি সৃষ্ট? সে বিষয়ে বেশ মতভেদ আছে। সমতল ভূমিতেও এ গানের সৃষ্টি হতে পারে এবং পরবর্তীতে তা নৌকার মাঝির মুখে অবসর সময়ের সঙ্গী হিসেবে গীত হয়েছে। নদীর বুকে যখন একজন মানুষ একাকিত্ব ও নির্জনতার মধ্যে অলস সময় পার করে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তার মনের মধ্যে শূন্যতা অনুভূত হয়। আর এই প্রকার দুঃখানুভূতি থেকেই মাঝি তার নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠেছে চিত্ত ব্যাকুল করা উদাস সুরের ভাটিয়ালী গান। মানুষ মাত্রই এরূপ অনুভূতি প্রকাশ করা স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন থেকেও ভাটিয়ালী গান ও সুর সম্পর্কে ধরণা পাওয়া যায়। চর্যাপদ বিভিন্ন কবি ও পদকর্তাদের রচনা হলেও প্রায় সকল পদকর্তাই ভাটিয়ালী সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান রচনা করেছেন। ভুসুকুপা চর্যাপদের ৪৩ নং পদটি রচনা করেন 'বঙ্গাল রাগে'। আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং তার অনুসরণে আরো অনেকে 'বঙ্গাল রাগকে' ভাটিয়ালী সুর বলে অনুমান করেছেন। এটি অধ্যাত্ম তত্ত্বের গান বটে, কিন্তু এতে নদী-নৌকা-মাঝির কোন রূপক বা প্রতীক নেই। নদী-নৌকা-মাঝির রূপক-প্রতীকে একাধিক চর্যাপদ রচিত হয়েছে।[৫] বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ সুরকে এটি শুদ্ধ ও নিয়মবদ্ধ সুর কাঠামো প্রকাশ করার মাধ্যমে বঙ্গাল রাগের জন্ম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আধুনিক ধারার গানে যেটাকে লোক

আঙ্গিকের গান বলে অনেকে নাগরিক জীবনে বসে রচিত গানকে পরিচয় করে দিয়েছেন, তেমনি বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত গান ও সুরকেও চর্যাপদে স্থান দিয়ে 'বঙ্গাল রাগ, নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। শুধুমাত্র 'বঙ্গাল রাগ'কে ভাটিয়ালীর আদি রূপ হিসেবে ভাববার বিষয়টিকে কেউ কেউ ভিন্নভাবে দেখেছেন। গুজঁরী রাগের ৫নং পদে, দেবক্রী রাগে ৮ নং, কামোদ রাগে ১৩ নং, ধনসী রাগে ১৪ নং, ভৈরবী রাগের ৩৮ নং চর্যাপদে এরূপ রূপক-প্রতীক আছে। বঙ্গাল রাগকে ভাটিয়ালী ভাবা কষ্টকল্পনা বলেই আমার প্রতীতি হয়।[৬] হলায়ুদ মিশ্র সতের শতকের কবি ছিলেন, তাঁর রচিত সেক শুভোদয়া গ্রন্থে তিনি ভাটিয়ালী রাগে গান রচনা করেছেন। তাঁকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিও বলা হয়। সে হিসেবে এটি ভাটিয়ালী গানের সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এ গ্রন্থ রচনার সময়কাল নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ষোল শতকের পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত হয়নি। গ্রন্থের লিপিকাল সতের শতক।[৭]

হউঁ যুবতী পতিয়ে হীন।

গঙ্গা সিনায়িবাক গাইয়ে দিন।।

দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।

বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ।।

ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি যাউ ঘর।

সাগর মধ্যে লোহার গড়।। ধ্রু। রাগ ঃ ভাটিআলী

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। এ কাব্যের ভাবরসে প্রায় সকল বাঙালি হৃদয়ই আন্দোলিত হয়েছে। চৌদ্দ শতকের শেষ ভাগে বৈষ্ণব প্রভাবজাত প্রেম ভাবরসে রচিত এ গানে বাংলার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা লোকসুরের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানের সুরের সাথে খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মনের সংযোগ ঘটেছিল। কীর্তনের ব্যাপক ব্যবহার, জনপ্রিয়তা ও চর্চার ফলে এটি (কানু ছাড়া গীত নাই, রাধা ছাড়া সাধা নাই) প্রবাদে পরিণত হয়। মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সম্ভবত এককভাবে ভাটিয়ালী রাগ বা সুর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। ভাটিয়ালী রাগে গীত ও রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

যবেঁ রাধ গোআলিনী পতল কৈল গাএ হে হে লহে।।

†bŠKv LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t jN‡kLi t 'ÐK t

তিরীর স্বভাব মনে করে প্রাণ কাহ্নঞিঁ ল,

তাত রোষ না কর নাগরে।।

fvi LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t i¡cKs

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।

লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল।।

Kwjq ‘gb LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t i¡cKs

জলত নাম্বিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরদেখ

এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল অদেখ।।

hgbv LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t i¡cKs

কোন অসুভ ক্ষণে পাঅ বাঢ়ায়ি লো

হাঁছী জিঠী আয়র ঊঝঁট না মানিলোঁ।।

eskx LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t hwZ

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিল গো

বিকে যাইতে মথুরা নগরী।।

eskx LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t GKZvjv

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রতি

জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।।

eskx LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t i¡cKs

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী, আল বাড়ায়ি গো

সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী।।

ivavivwein LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t jN †kLi t

এই তো কদম তলে আছিলা বাল গোপালে

তার উরে দিলো মোর সিয়রে।।

ivavi wein LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t hwZ t

হরি হরি আয়াসেঁ কাহ্নের উরে!

শুতিলোঁ দিঞাঁ সিয়রে। প্রাণের বড়ায়ি লো।।

ivavi wein LÐ, ivM t fwUAvjx, Zvj t hwZ t[৪]

মধ্যযুগের প্রায় সব ধরনের কাব্য সাহিত্যে ভাটিয়ালী সুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাহ মোহাম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণোয়োপাখ্যানে পাঁচটি গীতিকবিতায় ভাটিয়ালী রাগের উল্লেখ আছে। তবে ছন্দ বা তালরূপ একটু ভিন্ন। এখানে একটি তালে দীর্ঘ সুর (কাহার্‌বা) ব্যবহার করা হয়েছে, বাকি তিনটি গান যমক ও একটি চন্দ্রাবলী ছন্দে রচিত। ভাটিয়ালী গানের মধ্যে সারি ও মুর্শিদি অঙ্গের গানে এরকম দ্রুত গতির তালের ব্যবহার পাওয়া যায়। চন্দ্রাবলী ছন্দে, রাগ ভাটিয়ালীতে ইউসুফের স্মৃতিচারণমূলক পদে বলা হয়েছে-

হৈলুঁ মঞি হতবুদ্ধি ন পাই ভাইক শুদ্ধি

বিফল মোহোর অনুমান।

মুঞি হৈলুঁ মতি ভোর ন পাই উদ্দেশ তোর

দেখিলুঁ মুরতি এহি স্থান।।

ন দেখি তোমার মুখ হৃদয় অন্তরে দুখ

নহি তোহ্মা রূপ লক্ষবাণ।

মোহর করম দোষ বিধাতা করিল রোষ

মোর কর্মফল এহি স্থান।।

স্বপনে যে দেখিলুঁ বাপ তরে কহিলুঁ

জনকেহ করিলা নিষেধ।

কহিলুঁ এহি সে কথা মনেত পাইলুঁ ব্যথা

বাপ বাক্য জেহ্ন মহাবেদ।।

কপট উদভব করিল পরাভব

কূপেত বিসর্জিল ধরি

সাধু এ তুলির তানে আনিল মিছির পানে

সাধু এ বেচিল নৃপপুরী।।

জলিখার রূপ জথ উৎপাত হইল তথ

আইল আক্ষা স্বপ্নে দেখি।

জলিখা মোহোর সঙ্গে ছিলেক জে মনোভঙ্গে

বন্দী মোক করিলেক দুখী

সেহি দুক্ষ বিমোচন মোর কর্ম রিবন্ধন

করিলেক বিধি দিয়া সুখ।

এহি মোর ভাগ্যদশা পূরিল জে মন-আশা

দেখিলুঁ জে সেহি চান্দ মুখ।।[৯]

শাহ মুহাম্মদ সগীর গৌড়ের সভাকবি ছিলেন। ভাটিয়ালী গানের ভাব, সুর ও ভাষায় যে খেদ, আকুতি লক্ষ্য করা যায় তা পূর্ববঙ্গের গীতিকবিতায় উল্লেখ পাওয়া যায়। বাহরাম খান ষোল শতক এবং আলাওল সতের শতকে আবির্ভূত হন। সতের শতকের অপর কবি দোনা গাজী চৌধুরী সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের তিনটি গীতপদে ভাটিয়াল রাগের উল্লেখ করেন।

১। রাগ ঃ দক্ষিণ ভাটিয়াল, বিষয় ঃ রাজার পুত্র কামনা।

২। রাগ ঃ করুণা ভাটিয়াল, বিষয় ঃ কুমারের বিলাপ।

৩। রাগ ঃ দুঃখিনী ভাটিয়াল, বিষয় ঃ সায়াদের জন্য বিলাপ।

এখানে বাসনা, করুণা ও বিলাপের জন্য ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। দুঃখিনী ভাটিয়ালের ধুয়াটি এরূপ- আক্ষা ছাড়ি গেলা কোন দেশেরে প্রাণবন্ধু।[১০] প্রণোয়োপাখ্যান হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরো কয়েকটি কাব্যেরনাম উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী'। লাইলী-মজনু কাব্যে ৫টি এবং পদ্মাবতী কাব্যে ১টি গীতপদে ভাটিয়ালী রাগের উল্লেখ আছে।[১১] পদশীর্ষে ভাটিয়ালী রাগ ও তালের যে বর্ণনা তা নিম্নরূপ-

১। রাগ ঃ ভাটিয়াল, বিষয় ঃ লাইলী মাতার ভর্ৎসনা

২। রাগ ঃ ভূপালী গিঞ্চ, বিষয় ঃ ভাটিয়াল মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ, তাল ঃ খর্বছন্দ।

৩। রাগ ঃ বঙ্গ ভাটিয়াল, বিষয় ঃ মজনু অঙ্গে সুনের গলার ডোর ও লাইলীর পদরেণ।

৪। রাগ ঃ মালব, দুঃখিনী ভাটিয়াল, বিষয় ঃ লাইলীর নিকট মজনুর পত্র, তাল ঃ যমক ছন্দ।

৫। রাগ ঃ করুণ ভাটিয়াল, বিষয় ঃ লাইলীর মৃত্যু সংবাদে মজনু।

এবং পদ্মাবতী উপাখ্যানে রাগ ঃ লাচারী ভাটিয়াল, বিষয় ঃ নাগমতীর বিলাপের বয়ান। মধ্যযুগের ভাটিয়ালী মাত্রই করুণ সুর সমৃদ্ধ। পদ্মাবতী কাব্যে ব্যবহৃত ভাটিয়ালী সুরের পদটি নিম্নরূপ-

সুখ ভোগে গোঁয়াইলো কাল

কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল।

শুক পক্ষী হৈল মোর কাল

জানিল করম নহে ভাল।।

আল সই, কি আজু পোহাইল কাল নিশি।। (ধুয়া)

পূরব জনমে তপ কৈলুং

রিষভাবে পাছে না চিন্তিলুং

নিজ দোষে রত্ন হারাইলুং।।

হেন স্বামী ছাড়ি যায় যার

বিফল জীবন সুখ তার।

দিবসেতে পুরী অন্ধকার

শূন্য দেখি সকল সংসার।।

মৃদু মন্দ দক্ষিণ পবন

সুশীতল সুগন্ধি চন্দন।

পুষ্প রস রত্ন আভরণ

আজু কেন হৈল হুতাশন।।[১২]

মধ্যযুগের শেষ ভাগ বিশেষ করে ষোল এবং সতের শতকে যে সকল বৈষ্ণবপদ রচিত হয় তার মধ্যে ভাটিয়ালী সুর ও রাগের ব্যবহার দেখা যায়। এ সকল গানে কীর্তন, আগমনী কিংবা সুফি সঙ্গীতের প্রভাব থাকলেও মূল সুর ভাটিয়ালী থেকে এ গানের আবেদন বিচ্যুত হয়নি। ভাটিয়ালী গানের রচয়িতাদের মধ্যে কখনও সুফি প্রভাবিত বৈষ্ণব কবি আবার কখনও বৈষ্ণব প্রভাবিত মুসলিম কবিদের রচনা পাওয়া যায়। সাহিত্য বা সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কখনোই ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয়নি। একই ধরনের সুরের ব্যবহার ভাটিয়ালীর ভিন্ন ভিন্ন কবির কণ্ঠে শোনা গেলেও কখনও এ সুরের আবেদন মানুষের কাছে স্থান হারায়নি। বাঙালি লোকমানসের যে বেদনা, না পাওয়ার যে যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের যে আকুতি তা এ সকল গীতিকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় হওয়ার ফলে এর ভাবরসে বাঙালি হৃদয়মাত্রই বারবার আপ্লুত হয়েছে। এ দেশের মানুষ সঙ্গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার অপার অনুগ্রহ লাভ করতে চেয়েছে। স্রষ্টার নৈকট্যলাভ করতে যেয়ে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধর্মাচরণের তত্ত্ব কথাকে পরিহার করে বেছে নিয়েছে গীতাত্মা বাঙালির চির পুরাতন সাধনার পথ। সে পথ হলো সঙ্গীত সাধনার পথ। একান্ত আপনার করে সঙ্গীতের সহায়তায় এরা পরম পুরুষের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করেছে। তাই দেখা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের ধর্মাচরণ হিসেবে সঙ্গীত সাধনা। এগুলো বিভিন্ন ধর্ম মতবাদীর একাধারে সাধন সঙ্গীত, বোধন গীতি ও ভজন।[১৩] বাংলাদেশের সঙ্গীত সাধনায় এখানে প্রচলিত ধর্মমতগুলোর সরাসরি সহায়তা রয়েছে। বৈষ্ণব, বাউল, ফকিরালী এসব ধর্মীয় রীতিতে ভাটিয়ালী গানের সুর চর্চার ফলে এটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। ভক্তির দ্বারা ভগবৎ অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করাই হলো বৈষ্ণব ধর্মের প্রধানতম উদ্দেশ্য। যেহেতু ভক্তির দ্বারা বিধাতার সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা, সেহেতু অত্যাবশ্যকীয় হয়েই সঙ্গীত সাধন–ভজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের প্রচলিত ভাটিয়ালী গানে রাধার কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তির কথা উঠে এসেছে-

কালাই প্রাণটি নিল বাঁশিটি বজাইয়া

আমারে যে ছাইড়া গেলায় উদাসী বানাইয়া গো।।

বাঁশিটি বাজইয়ারে কালাই বইলো কদম ডালে

লিলুয়া বাতাসে রে বাঁশি রাধা রাধা বলে।।

বাঁশিটি বাজাইয়া রে কে যায় রাজপন্থ দিয়া

আমারে যে থুইয়া গেলাই উদাসী বানাইয়া গো।।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার এখানে ততটা না হলেও এ ধর্মমত প্রভাবিত সঙ্গীত বাঙালির মনে রসের সঞ্চার করেছিল।[১৪] বাউল ও মরমি সাধনায় সঙ্গীত একটি মুখ্য উপাদান। এ শ্রেণির সাধকগণ হিন্দু-মুসলিমের প্রেম-দর্শনের সমন্বয়ে একটি আধ্যাত্মবাদী সঙ্গীতের সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভে সক্রিয় থাকেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ শ্রেণির সাধকদের গানে ভাটিয়ালীর বিচ্ছেদী সুরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধগান ও দোহা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত) বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন রাগ-রাগিনী সম্বলিত পুঁথি। গ্রন্থটি খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল। এতে পূর্বে উল্লেখিত 'বঙ্গাল' নামে একটি রাগের উল্লেখ আছে। যে গীতিকবিতায় এ রাগটির উল্লেখ আছে তার রচয়িতা ভুসুকু। ভুসুকু বঙ্গাল দেশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। এই বঙ্গাল রাগই ভাটিয়ালী নামে অনুমেয়। তখন বঙ্গাল দেশ বা রাগের গীতরূপেই 'বঙ্গাল রাগ' পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষকরে সুন্দরবনের জঙ্গলাবৃত্ত নিম্নভূমিও ভাটি বলেই পরিচিত। এ অঞ্চলের লৌকিক দেবতা দক্ষিণারায় ভাটিশ্বর বা আঠার ভাটির অধিপতি বলে সর্বজন বিধৃত।[১৫] সে হিসেবে ভাটিয়ালী গানের চর্চার ক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই বিস্তৃত। ভাটিয়ালী গানের চর্চা ও বিষয়বস্তুতে অঞ্চলভেদে পার্থক্য এসেছে। এর কারণ হিসেবে অনেকে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলেছেন। বাংলাদেশ প্রধানত নদীমাতৃক দেশ হলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীগুলির গঠন প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পদ্মা, মেঘনা, সুরমা, ধলেশ্বরীর যে রূপ তিস্তা, করতোয়া, দামোদর, আত্রাই, কংসাই কিংবা রূপনারায়ণ ও ময়ূরাক্ষীর সে রূপ নয়। ভাগিরথী, মধুমতি, ইছামতি, ভৈরব ইত্যাদির রূপও আগের দুই শ্রেণির নদ-নদী থেকে ভিন্ন। নদীর গঠনে ও চলার গতিতে যদি ভিন্নতা থাকে তাহলে সেই নদীর সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠার বিষয়টিতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং নদ-নদীর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক বা যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে থাকে তা দেশের সর্বত্র এক নয়। এই জন্যে এইসব অঞ্চলের জীবনধারা যেমন করে সৃষ্টি হয়েছে এর লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীতেও সেভাবেই চিত্রিত হয়ে উঠেছে। এক বাংলাদেশেরই পশ্চিম-উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সুর ও বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এর মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার লোকসঙ্গীতের ভাটিয়ালী ও দক্ষিণ বাংলার সারি এদের প্রত্যেকেরই এমন একেকটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এর দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট পরিচয়কে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, যতদিন পর্যন্ত এদের প্রাকৃতিক পরিচয় থাকবে, ততদিন তাদের অন্তর্গত লোকসাহিত্যের কোন পরিবর্তন সাধিত হতে পারবে না।[১৬] বাংলা ভাষাভাষী এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ভিন্নতা ও বিভিন্ন এলাকা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে উঠার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই মানব জাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দিক থেকে এসে বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। ক্রমে ক্রমে তারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে বাঙালির একটি বৃহত্তর

সমাজ জীবনের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট আদিম জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা আজ এমনভাবে এদেশের সঙ্গে মিশে আছে যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে বিজাতীয় কিছুই অনুভব করা যায় না বা দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনকি বিপরীত ধর্মী সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্যদিয়ে স্বাঙ্গীকরণের কাজ বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে যত সহজে সম্ভব হয়েছে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তা তত সহজে সম্ভব হয়নি। এদের প্রত্যেকটি আধুনাবিস্মৃত জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিকে সাঙ্গীকরণ করে বাংলার লোকসাহিত্যে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে বলে এদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদি সাঙ্গীকরণের পরিবর্তে কেবলমাত্র পরিবর্জনের নীতি গ্রহণ করা হতো, তাহলে এদেশের সাস্কৃতিক জীবনে এত বৈচিত্র্য দেখা যেতো না।[১৭] বাংলা অঞ্চলে প্রতিনিধিত্বকারী সাঙ্গীতিক ধারাগুলোর সাথে ভাটিয়ালী গানের সম্পর্ক আছে বলে লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়ালী গানের সুরের ইন্দ্রজাল প্রায় সকল গানের মধ্যেই বিস্তৃত হয়েছে। সঙ্গীতবিদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বাংলা টপ্পায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে বলে মনে করেন। এই প্রভাব অবশ্য কথা পরিবেশনের দিকদিয়ে বলা হয়েছে। ভাটিয়ালীর কথাগুলি এক এক গোছা করে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর কথার থলি থেকে ছাড়া পেয়ে সুর 'জমজমা' নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম করে। তফাৎ এই যে ভাটিয়ালীতে একটানা সুরের যে কাজ টপ্পার বেলায় 'জমজমা' তালের কাজ নেই। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে বলেই টপ্পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।[১৮]

সঙ্গীতের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতো প্রাচীন। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য 'চর্যাপদে' যে লিখিত উপকরণ পাওয়া গেছে তা শুধু এদেশের সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না, এর মাধ্যমে আমরা প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রূপ ও দেখতে পাই। এছাড়াও বাংলার আদি পরিবেশন কলা হিসেবে যদি আমরা চর্যাপদকে দেখি তাহলে এর মধ্যে ক্রিয়াত্মক কলার সকল প্রকার রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। চর্যাপদের বিশেষ দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- চর্যাপদগুলোকে কিছুটা হলেও বাংলা কবিতার আদি নিদর্শন এবং সম্ভবত চর্যাপদের মধ্যদিয়েই বাংলা গানের সৃষ্টি। সভ্যতার আদি থেকেই বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে। এছাড়াও এখানকার সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্যে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। বিচিত্র বিষয় ও ভাবনার মাধ্যমে সঙ্গীত রচনা করে এখানকার লোককবিগণ বাংলার গীতিসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালি জাতির মধ্যে যে অখণ্ডতা ও ভালোবাসার পরিচয় তার শুরু হয়েছে এখানকার লোকসঙ্গীতের মাধ্যমেই। ভাটিয়ালী গানে যে সকল ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তা কোন একক মানুষের সৃষ্ট নয়। এ জনপদে বসবাসকারী কোন ভাটিয়ালী গানের স্রষ্টার দুঃখ-বেদনা খুব সহজেই সকল বাঙালির বেদনায় রূপ নিয়েছে। জাতিগতভাবেই এখানকার মানুষ

একে অপরের প্রতি খুববেশি সহানুভূতিশীল। একজনের বিপদে অন্যরা খুব সহজেই কেঁদে উঠেছে। এমন সরল মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এদেশের সঙ্গীতে। সহজ ও সরল তাল, সুর, লয়, গায়কী, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে তথা লোকসঙ্গীতকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনই বাঙালির বরাবরের কাম্য। লোকমানবতার কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে এখানেই উচ্চারিত হয়েছে ' শুনহ, মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এটি বিশ্বমানবতার এক অমোঘ বাণী। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যেমন মানব জীবনের চিরকালীন পরিচয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি এদেশের বাউল ও ভাটিয়ালী গানের মধ্যেও নিগুড় ভাবনা ও তত্ত্বের পরিচয় মেলে। ভাটিয়ালী গান মানুষকে শুধুমাত্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের কথা বলেনি, সমানভাবে এ গানের কথায় দেশ বা দেশের মানচিত্রের প্রতিও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালির বীর সন্তান ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছেন। এ মর্মস্পর্শী কাহিনি নিয়ে সঙ্গীত রচিত হয়েছে। এ গানের কথা বা বাণীর আবেদন কোমল বাঙালির হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি

দেখবে জগৎবাসী।।

কলের বোমা তৈরি করে,

দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে মাগো

বড় লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম

আর এক ইংলেন্ডবাসী।।

শনিবার বেলা দশটার পরে

জজ কোর্টেতে লোক না ধরে মাগো

হল অভিরামের দ্বীপচালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি।।[১৯]

কথা ও সুর ঃ পীতাম্বর দাস বাউল

গানটি রচিত হয়েছে বাঙালির চির পরিচিত ভাটিয়ালী গানের সুরের ছায়া অবলম্বনে।

ওরে মন মাঝি তো বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।

আমি জনম ধইরা বাইলাম বৈঠা রে, নৌকা ভাইটায় সয় আর উজায় না।। (প্রচলিত)

বৃহত্তর ময়মনসিংহ ভাটিয়ালীর একটি অন্যতম চারণভূমি হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের পালা থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের গানে ভাটিয়ালী গানের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনার পাশাপাশি এ অঞ্চলের মেয়েলী গীতেও ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে।

বাঁজেনা বাঁজেনা বাঁশি বাঁজে কেবল কালার গুণে

চল সখি দেইখ্যা আসি বাঁজে বাঁশি কোন বিপিনে।

শুনিয়া বাঁশির গান অধৈর্য্য হইল প্রাণ

ধৈর্য্য না মানে আমার মনে।।

শুনিয়া কালার গান কেমন কেমন করে প্রাণ, চল যাই যমুনার পুলিনে

চল দেইখ্যা আসি বাজায় বাঁশি কোন বিপিনে।।

পালাগান 'ভেলুয়া সুন্দরী'তে ভোলা সওদাগর যখন ভেলুয়াকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখনও ভেলুয়া কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারে না যে তার স্বামী বেঁচে নেই। ভোলা সওদাগরের নজরবন্দী থেকেও সে তাঁর স্বামীর জন্য অপেক্ষায় থাকে। যা ভাটিয়ালী সুরের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

ও গাঙ্গেরও পানি, বন্ধেরে কইও গিয়া আমার দুঃখের বাণী

কোথায় আছ, প্রাণের স্বামী দেখলানা আসিয়া

তোমার ভেলুয়া কাঁন্দে আজি হায়রে বিষম বিপদে পড়িয়া।।

ও আকাশেরও চান, বন্ধু আমার প্রাণ কেমনে রহিব ছাড়িয়া

দহিনালি হাওয়া সেই দেশে যাইয়া, কইও কথা বন্ধেরে খুলিয়া।।

উথাল পাথাল ঢেউরে, কি যে করলাম ভুলরে, একেলা ঘাটেতে আসিয়া,

কিবা কপাল দোষে দারুন রোষে, ভোলা চোরায় নিল মোরে লুটিয়া।।

পালানাট্য 'মহুয়া সুন্দরী'

ব্রজ গোপিনীরা বা গোপি বালিকারা বাঁশির ডাক লক্ষ্য করেই নদীতে জল আনতে যেত। এ কারণে হয়তো জলভরার গীতে কৃষ্ণের বাঁশির কথা বারবার এসেছে। কিন্তু এমন করে বাঁশি কখনোই বাঁজতে পারে বলে মনে হয় না, যে বাঁশি শুনে কুলবতীদের কুল মানের কথা পর্যন্ত মনে থাকে না। এর মূলে রয়েছে বাংলার বৈষ্ণব ভাবরসের প্রভাব। যে বাঁশি শুনে গোপিনীরা ঘর ছেড়ে যমুনা তীরে এসেছে, সে বাঁশি তাদের অন্তর্দেবতার। তাই ভাটিয়ালী সুরের এমন উদাসীভাব জলভরার গীতকে প্রভাবিত করবে এমনটা খুবই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণ প্রেমানলে অঙ্গ দাহিল

যাইতে যমুনার জলে সে কালা কদম্ব তলে

আঁখির ঠারে মন গলিল।

প্রেম কইর‍্যা কলঙ্ক রটা লোকে মোরে দেয়লো খুটা

প্রাণ সইলো কালার প্রেমে কলঙ্ক রইল।

লোকে কইরা কানাকানি বলে কালা কলঙ্কিনী

প্রাণ সইলো- সে কই রইলো আমায় কই থুইল।[২০]

Z_¨wb‡‘k

১। সুকুমার রায়, লোকসঙ্গীত জিজ্ঞাসা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ . ৪।

২। প্রাগুক্ত, পৃ . ৪-৫।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ . ৫।

৪। ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন - ১৯৯৭ পৃ. ২১।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ২২।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ . ২২-২৩।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ . ২৪।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ . ২৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ . ২৫।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

১৩। হবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন - ১৯৮২, পৃ . ৯৪।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ . ৯৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ১৪৫।

১৬। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ . ৮৭।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ . ৯২।

১৯। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী - ২০০৫, পৃ . ২২।

২০। শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলণঃ ৬৪, ময়মনসিংহের কবিগান ও মেয়েলী সঙ্গীত, জুন- ১৯৯৪, পৃ . ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

fwUqvjx Mvb D™‡ei cUfwg

ভাটিয়ালী গান যে পটভূমিতে রচিত হয়েছে সেই একই পথে বা পটভূমিতে এদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যগত সঙ্গীতেরও নির্মাণ হয়েছে। চর্যাপদ হতে শুরু করে আজকের দিনের নাগরিক জীবনে বসে রচিত লোকগান পর্যন্ত প্রায় সকল ধারাই বিকশিত হয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষের স্পর্শে। গানের ভাষা এবং সুরেও বাঙালির সেই নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায় সংস্কৃতিই হলো একটি জাতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস। সংস্কৃতির উপাদানসমূহ যেভাবে দেশের ও সমাজের সাধারণ মানুষকে ধারণ করে অন্য কোন মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা অনেকটা দুরূহ হয়ে উঠে। পরিশীলিত কিংবা অপরিশীলিত উভয় প্রকার উপাদান এখানে অতি সহজেই তার স্থান করে নেয়। মানুষের চর্চা ও লালনের ফলে কোন কোন উপাদান অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠে আবার কোন কোনটি অনাদরে, চর্চার অভাবে এক সময় ইতিহাসের উপাদানে পরিণত হয়। দেশের মানুষের বা আপামর জনসাধারণের প্রয়োজনে তাদেরই হাসি-কান্না-দ্রোহ মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে গল্প-গাঁথা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য-চিত্র-কুটিরশিল্প, সংস্কার-বিশ্বাস, নাটক ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ষড়-ঋতুর দেশ। এদেশে এক বছরের পরিক্রমায় ছয়টি ঋতু আসে এবং যায়। প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতি তার রূপ পাল্টায়, ধারণ করে নতুন নতুন সজ্জা। জোয়ার-ভাটার টানে প্রকৃতির নিয়মেই এদেশের নদীর জল বা পানি সকাল বিকাল তার গতিপথ বদল করে। প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপের কারণে এখানকার মানুষের উপরও তার প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে যখন এদেশের খাল, বিল, নদী, নালা শুকিয়ে যায়। রোদের তাপে নদী-বিধৌত পলি এলাকার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে কায়িক পরিশ্রম করা অনেক বেশি কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। কৃষি প্রধান এ এলাকার মানুষের জন্য জীবনধারণ করা তখন সঙ্কটময় হয়ে যায়। এদেশের প্রাণী জগতে এ সময় দেখা যায় হাহুতাশ। ফলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তার করুণা লাভের জন্য এই সময়ে মানুষ নানা ধরনের আচার-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। লোকমানস হতে রচিত হয় লোকসাধনার গান। সময়ের পরিবর্তনে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হলে মানুষ নতুন বিষয়ের সাথে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা ঋতু। বর্ষার আগমনে আকাশে দেখা দেয় কালো মেঘের আনাগোনা। মেঘ আর বিজলির গর্জনে পরিবেশ যেন আরো ভারী হয়ে উঠে। বর্ষাকাল এদেশের মানুষের ভাবুক মনকে আরো

বেশি কাব্যময়তা দান করে। গান, কবিতা, গল্প, গাঁথাসহ বাংলার জনপ্রিয় ভাবসম্পদের প্রায় সবখানেই বর্ষার স্থান হয়েছে অতি মর্যাদায়। নদী প্রধান অঞ্চল হওয়ার ফলে বর্ষাকালে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে যখন গ্রাম-বাংলার পথ-ঘাট-প্রান্তরকে প্লাবিত করে তোলে, সে সময় এ এলাকার মানুষ কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়ে। কর্মহীন এ সময়ে সমাজের নানা ধরনের বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে লোককবিগণ সঙ্গীত রচনা করে থাকেন। ভাটিয়ালী গান রচনার জন্য বর্ষাকালের বিশেষ অনুপ্রেরণা রয়েছে। বর্ষায় গ্রাম-বাংলার রাস্তা ঘাট ডুবে থাকার কারণে মানুষের চলাচলের একমাত্র বাহন হয়ে উঠে নৌকা। দূর-দূরান্তে চলতে গেলেও সে সময় মানুষ এই বাহন ব্যবহার করে থাকে। নৌকার মাঝি তাদের যাত্রী ও মালামাল আনা-নেয়ার সময় উদাস কণ্ঠে ভাটিয়ালী গান গায়। মাঝির কণ্ঠ থেকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সে গান ছড়িয়ে পড়ে। নদী-নৌকার সাথে মাঝি তার বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করে যে গান পরিবেশন করে তা সমাজের অন্য মানুষেরও সাধনার বিষয়ে পরিণত হয়। বর্ষায় কৃষিজীবী মানুষের হাতে কাজ না থাকায় গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হয় নানা ধরনের উৎসব। নৌকায় চড়ে মানুষ খুব সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে বেড়াতে যায়। বলা চলে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র তৈরিতে বর্ষা কালের ভূমিকা অনন্য। এ সময় জনমানুষের জীবনে যে সকল অসুবিধা ও দুর্ভোগ নেমে আসে ভাটিয়ালী গানের কথায় সে সকল বিষয়াবলীও খুব সহজেই উঠে এসেছে।

নীল আকাশ, রৌদ্রদীপ্ত উজ্জল সূর্য, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ইত্যাদি শরৎকালের পরিচয় ধারণ করে। আকাশে মেঘের ভেলায় কবি মন ভেসে যাওয়ার আকুলতা জানিয়েছে বারবার। ভরা পূর্ণিমার রাতে নদীর বুকে নৌকা ছেড়ে দিয়ে যে সকল জেলেরা মাছের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, অপেক্ষার এই অবসরে রচিত ও গীত হয়ে যায় ভাটিয়ালী গান। রাতের বেলা নদীর বুকে বসে নদীর পাড়ের কাউকে দেখা না গেলেও আকাশের চন্দ্র ও তারা মানুষের কাছে খুব আপন মনে হয়। ভাটিয়ালী গানের কবি তাঁর ভালোবাসার সাক্ষী করেছেন চন্দ্র-তারাকে।

সাক্ষী শুধু চন্দ্র তারা, একদিন তুমি পড়বে ধরা রে বন্ধু

ত্রিভূবনের বিচার যেদিন হয় রে বন্ধু।

শরৎ কালে আকাশ স্বচ্ছ ও মেঘমুক্ত থাকার ফলে জাগতিক জীবনের সাথে মহাবিশ্বের অন্যান্য উপাদানের সম্পর্ক রচনার বিষয়টি এদেশের লোককবিদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে।

হিমেল হাওয়া নিয়ে বাংলার জনমানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আসে হেমন্ত। রাস্তা ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়। ঘাসের উপর দেখা যায় শিশির বিন্দু। কৃষক নতুন ফসল নৌকায় ভরে বাড়িতে নিয়ে আসে। ফসল তোলার আনন্দে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ মেতে উঠে পিঠা-পুলির উৎসবে। পৌষ সংক্রান্তিতে নবান্ন উৎসব পালিত হয় বাংলার ঘরে ঘরে। খুব কম সময়ের জন্য বাংলায় হেমন্ত এলেও উৎসবের আমেজে সেটি উপভোগ্য হয়ে উঠে।

শীতকাল বাংলার মানুষের মনে অনেকটা স্বস্তি নিয়ে আসে। প্রকৃতিতে দেখা দেয় শান্ত মেজাজ । এ সময়কে ফসল ঘরে তোলার মাসও বলা হয়েছে। গ্রীষ্মের খরতাপে জীবনযাত্রা যতটা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে, শীতের আগমনে তা স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। এ সময় দিনের ব্যাপ্তি ছোট হয়ে আসায় খুব দ্রুত রাত নেমে আসে। রাতের বেলা বিভিন্ন জনপদে আয়োজন করা হয় যাত্রা, পালা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সে সব অনুষ্ঠানে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করা হয়। ঠিক কখন থেকে ভাটিয়ালী রাগ/গান এখানকার মানুষের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে সেটির সাল/তারিখ নির্ধারণ করা বেশ দূরহ। তবে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য, শব্দঅভিধান ও গীতিগ্রন্থ থেকে এ গান বা রাগের উদ্ভবের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

স্যার রাজরাধাকান্তদেববাহাদুরেণ বিরচিত, বাংলা ভাষার শব্দ অভিধান 'শব্দকল্প দ্রুম'[১] এ ভাটিয়ালী নামক শব্দটির উল্লেখ নেই। সেখানে 'ভাটক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার অর্থ ভাটি কিংবা ভাটিয়ালী শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান- দ্বিতীয় ভাগ'এ 'ভাঁটা' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাঁটি=ভাঁটা "যৌবন সায়রে পড়িতেছে ভাঁটা তাহারে কেমনে রাখি?"-চণ্ডিঃ[২] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' গ্রন্থে 'ভাটিয়ালী' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

fwU, fwU- নদী প্রভৃতির স্বভাবিক স্রোতের দিক।

fwU Mvs- যে নদীতে ভাটা পড়িয়াছে। যৌবনের পর প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হওয়া, জীবনের উজান-ভাটি।

fwUqvj- দক্ষিণ দেশীয় (ভাটিয়ালী সুর)।

fwUqvjx, fwUqvwj / fwUqvix- লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। সুরে গাওয়া গান, ভাটার টানে নৌকা চলাকালীন মাঝিরা যে সুরে গান গায়।[3]

Dhaka University Institutional Repository

১২৯৬ সালে শ্রী ক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রী অক্ষয়কুমার রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'ভাটা' নদ্যাদির স্বভাবিক জলহ্রাস।[৪]

ভাটিয়ালী রাগের ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীর গীতিকবিতার অনেক স্থানে দেখা যায়। শ্রীসুকুমার সেন এর মতে- ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রেরণ আসে; তাহারই প্রতিচ্ছায়া সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে একটি সর্ব্বজনীন সাহিত্যের পথে দাঁড় করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বঙ্গালী ঘরের কোন ছাড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিপথে দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে সকল প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এখন বাঙ্গালী সেই সকল প্রদেশবাসীকে তাহার নিজের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির অংশীদার করিয়া সমধিক মর্য্যাদা লাভ করিল।.....শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন, রূপ ইত্যাদিন চেষ্টা ও চরিত্র বলে এবংশতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি মহান্তের ভাবোন্মাদনায় বাঙ্গালীর জীবন বৈষ্ণবভাবাবেগে রঙাইয়া উঠিল। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য একেবারে বৈষ্ণব বা ভক্তি সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইল। এমনকি, যে সকল কাব্য বিশেষ করিয়া 'বৈষ্ণব' বিষয়বস্তুঘটিত নহে, তাহাতেও বৈষ্ণবীয় ভক্তমনেবৃত্তি ও কলাপনার ছাপ সুস্পষ্ট দেখা ছিল। বাঙ্গালী জাতির ও সাহিত্যের এই বৈষ্ণবীভবন ভাল কি মন্দ, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। জগতে একান্তভাবে ভাল কিছুই নহে। আর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়; ইহাতে অধিকারিভেদ আছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে এই উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বিশিষ্ট ধর্ম্মমতরূপে খাড়া করিয়া প্রচার করিতে গেলে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, অনতিবিলম্বে তাহাই ঘটিল। একে বাঙ্গালীর মন বরাবরই কোমল ও ভাবাতুর; সে মন চিরদিনের মত ভক্তিপ্রবণ এবং সেই হেতু যথেষ্ট দুর্ব্বল রহিয়া গেল। সেকশুভোদয়ার কথা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য যে কিরূপ ছিল, সেকশুভোদয়াতে তাহার কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সেকশুভোদয়ার কথা অশুদ্ধ সংস্কৃত হইলেও ইহার কাঠামো এবং বাগ্‌ভঙ্গি বাঙ্গালা ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহাতে বাঙ্গালায় রচিত কয়েকঠি ছড়া এবং একটি গীত আছে। ধর্ম্মসম্পৃক্ত নহে, এমন বাঙ্গালা রচনা প্রথম এইগুলিতেই পাইতেছি। যেমন,

রাম রাজা বর্ত্তে ইন্দ্র বর্ষে জল।

যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।।

যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ।

যদি বা শীগ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস।।

যে গীতিকবিতাটি আছে, সেটি পুরাতন বাঙ্গালা লৌকিক গীতের একমাত্র নিদর্শন বলিয় অত্যন্ত মূল্যবান্। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এই সম্পর্কে যে গল্পটি আছে কৌতুহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

ভাটিয়ালী-রাগেণ গীয়তে

হঙ যুবতী পতিয়ে হীন। গঙ্গা সিনায়িবাক জাইয়ে দিন ॥

দৈব নিয়েজিত হৈল আকাজ। বায়ু না ভাঙ্গ ছোট ছোট গাছ ॥

ছাড়ি দেহ অজু মুঞি জাঙ ঘর। সাগর মধ্যে লোহার গড় ॥ধ্রু॥

হাত যোড় করিঞা মাঙ্গ দান। বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥

বড় সে বিপাক আছে উপায়। সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায় ॥

পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান। মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ ॥

শ্রীখণ্ডচন্দন অঙ্গে শীতল। রাত্রি হইলে বহে অনল ॥

পীন পয়োধর রাঢ়ে আর। প্রাণ যায়না গেল বহিঞা ভার ॥

নয়ন বহিয়া পড়ে নীর। জীয়ে ন প্রাণী পলায়ে ন ভীতি ॥

আশে পাশে শ্বাস করে উপহাস। বিনা বায়ুতেঁ ভাঙ্গে তালের গাছ ॥

ঝাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা। চল জাই সখি পলাইল শঙ্কা ॥[5] (যদৃষ্ট)

'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে ভাটিয়ালী সুরের এরকম উপস্থিতি এ সুরের উদ্ভব ও চর্চার বিষয়টিকে আরো বেশি সুদৃঢ় করেছে। এই আলোকে বলা যায় যে ভাটিয়ালীর উদ্ভব ষোড়শ শতকে।

ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনায় বরুণকুমার চক্রবর্তী দিনেন্দ্র চৌধুরীর মতামতকে অনেকটা গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে- রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় (১৯৮১) 'লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতি' পর্যায়ে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে মোট সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটির রচয়িতা প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী। নির্মলেন্দু তাঁর 'ভাটিয়ালী' শীর্ষক প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে 'ভাটিয়ালী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি, ভাটিয়ালী সুরের মাদকতা, এর বিষয়বস্তু, ভাটিয়ালী গানের প্রেরণা ও সময় এবং সর্বোপরি বর্তমান বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ যে সব অঞ্চল ভাটিয়ালীর জন্য খ্যাত সে সব অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন।.....পূর্ববঙ্গের আলোচিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে তিনি ভাটিয়ালীর কথা উল্লেখ করেছেন।[6] অন্যান্য সঙ্গীতের সাথে প্রাচীন কাল থেকেই ভাটিয়ালী গানের চর্চাও এ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। সে হিসেবে বাংলা সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসের সাথে ভাটিয়ালীর বিষয়টিও সমানভাবে এসে যায়।

ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ'এ অধ্যাপক সুকুমার সেন ভাটি ও ভাটিয়ালী সম্পর্কে বলেছেন-

fvUv- (জোয়ারের বিপরীত) নদীর জল নেমে যাওয়া।

fwU- মন্দ, মন্থর, অক্রান্ত, গত, নদীর জল নেমে যাওয়া। 'হইল দুপুর ভাটি' ভাটি তরঙ্গে।

fwU- ভাটার মত সরে যাওয়া, জলস্রোত নেমে যাওয়া, 'জোয়ার ভাটিয়া গেলে'।

fwU(-wV)qwj(-x)- স্তুতি পাঠের গান, ওই গানের সুর *ভট্টপারিক; তদসম শব্দ। (সেকশুভদয়া, বড়ু চণ্ডীদাস)।[7]

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে হলায়ুদ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' এবং বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ ভাটিয়ালী রাগের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন।

অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ এর মতে- হলায়ুদ মিশ্র যদি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হন তবে একেই ভাটিয়ালী রাগের ও গানের প্রাচীনতম নিদর্শন বলতে হয়। তবে এ-গ্রন্থের প্রাচীনতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। ষোল শতকের পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত হয়নি। গ্রন্থের লিপিকাল সতের শতক।[8]

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ মোট দশটি গানে/পদে ভাটিয়ালী রাগের ব্যবহার করা হয়েছে। রাগ ও তালসহ উক্ত পদসমূহের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

†bŠKv LÐ, c' bs- 7

fwVAvjxivMt \ jN‡kLit \ 'ÐK \

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।

হেহে লহে।

তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ।

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।

হেহে লহে লহে।

অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ।

রাধা এঁ বুলিল কাহ্ন ঝাঁট বাহি যা।

ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা।।

দুতরত পার কর একবার কাহ্ন।

পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন।।

নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর।

দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর।।

কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার।

ছল করি টালিলেক রাধার পসার।।

তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।

ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল।।

কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।

বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে।।

এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।

Dhaka University Institutional Repository

নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে।।

আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।[9]

e›'veb LÐ, c' bs- 15

fwVAvjx iwMt \ i/cKs \

কৃষ্ণস্য প্রেমবচসা রাধা সাদরমানসা।

বশাভবদসাবাশু কুসুমাসুগসঙ্গতা।।

তিরীর সভাব মণে করে

প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল

তাত রোষ না কর নাগরে।।

এ তোহ্মার বচনে।

প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল

সব কোপ খণ্ডিল এখনে ॥ এঅ ॥

আল হের

এহি জাগে তোহ্মার চরণে।

প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল

আহ্মা সম না করিহ আনে ॥

তোহ্মার আহ্মার দুঈ মণে।

এক করি গান্থিল মদনে।

তার অনুরূপ বৃন্দাবনে।

তোর বোল না করিব আনে।।

বিধি কৈল তোর মোর নেহে।

একই পরাণ এক দেহে।

সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।

সে পুণি আহ্মার দোষ নহে।

কে বুলিতে পারে তোর গুণে।

একেঁ একেঁ বসে মোর মনে ॥

এবেঁ আসি বৈশ মোর পাশে।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥[10]

Kwjq‘gb LÐ, c‘ bs- 2 (hgbv L‡Ði AšÍMZ)

fwVAvjxivM t i¡cKs \

জাহাত লরগিআঁ নিজ পতি না চাহীল

লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥

হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।

গোপযুবতী সব অনাধ করিআঁ ॥

হৃদয়ত ঘাঁঅ দিআ রাধা গোআলিনী।

করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু

কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।

উঠ উঠ জলে হৈতে নান্দের নন্দন।

কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।

কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে ॥

হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।

Dhaka University Institutional Repository

কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালে মায়িল ॥

দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।

ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে ॥

রাধা এক রাখোআয় পাঠাআঁ সত্বরে ॥

বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥

সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা অচেতন।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥[11]

hgbv LÐ, c‘ bs- 7

fwVAvjxivM t i¡cKs \

জলত নাম্বিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ।

এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল অদেখ ॥

আকাশে উঠিল কিবা পশিল পাতালে।

কিবা মরি গেল কাহ্নাঞিঁ যমুনার জলে ॥

বোলহ পরাণ বড়ায়ি স্বরূপেঁ আহ্মার

কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে ॥

ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদরে ॥

ডুবিআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে ॥

হেন বুলি সব লোকেঁ দুসহ উত্তরে।

তাহাক গুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে ॥

সব গোপী মিলি চাহিআঁ বনমালী।

কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী ॥

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপে লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।

এতেকেঁ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ ॥

জীয়ন্ত থাকিতে যবে নান্দের নন্দনে।

এত খনে অবসই হৈত দরসনে ॥

আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পরকারে।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥[12]

eskx LÐ, c' bs- 25

fwVAvjxivM t GKZvjx \

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতি সতী।

বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমদং ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো

বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।

অঞ্চলে ধরিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ রহা এ গো

বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী ॥

আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।

আল ল বড়ায়ি।

ছওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে।

তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি

তেজিলোঁ মো সব আভরণে।

বারে বারে কাহ্নাঞিঁমোকে ধিক ধিক বোলে গো

যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসও

কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ ॥

তবেঁ বা মোঞেঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ

কিবা মরো খরল খায়িআঁ ॥

আহ্মার অন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নের গো।

চন্দ্রবলী মাঙ্গে পরিহারে।

না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো

গাইল বাসলীবরে ॥[13]

eskx LÐ, c' bs- 28

fwVAvjxivM t hwZt \

কোণ অসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িল

হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ ॥

শুন কলসী লই সখী আগে জাএ ॥

বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।

আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ॥

কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।

হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গেএ যোগিনী ॥

কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।

সুখান ডালত বসি কাক কাঢ় রাএ ॥

ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ ॥

যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ

Dhaka University Institutional Repository

আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ ॥

কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ ॥

বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআ করুণে।

লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে ॥

কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥[14]

eskx LÐ, c' bs- 32

fwVAvjxivM t i/cKs \

ভাদর সাসের তিথি চতুর্থীর রাতী

জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥

পূন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।

তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥

জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।

কলঙ্ক খুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥

গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।

জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।

খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ।

তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোযাএ ॥

চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।

যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥

যবেঁ মোর চুরী কৈলো হআঁ নারী সতী।

Dhaka University Institutional Repository

তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী।

এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।

আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥

আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নী এ শ্রীমধুসূদন।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥[15]

ivawein LÐ, c‘ bs- 11

fwVAvjxivM t jN‡kLit \

যে না দিগে গেলা চক্রপাণী । আল বড়ায়ি গো।

সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী। আল ॥

এবেঁ মোর মণের পোড়ণী ॥ আল বড়ায়ি গো ॥

যেন উয়ে কুম্ভারের পণী। আল ॥

কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ ॥ আ ॥

মুকুলিল আম্ব সাহারে।

মধু লোভে ভ্রমর গুজরে।

ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥

যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।

দেব অসুর নরগণে

বস হএ মনমথবাণে।

না বসএ তথাঁ কি মদনে।

যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥

পীন কঠিন উচ্চ তনে।

Dhaka University Institutional Repository

কাহ্নাঞিঁ পাইলে দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।

তা দেখি প্রাণ জাএব মোরে ॥

না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।

না নয়িলো কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥

যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।

গাইলো বড়ু চণ্ডীদাসে।[16]

ivawein LÐ, c‘ bs- 55

fwVAvjxivM t hwZt \

এই তো কদমতলে আছিলা বাল গোপালে

তার উরে দিলো মোর সিয়রে।

অতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে

নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥

বড়ায়ি গো

কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।

আণি দেহ শ্রী মধুসূদনে ॥

অহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে।

সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।

চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতি

তার মোর হউ দরশন ॥

মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পলাইবে কাহ্ন

তবে কেহ্নে কাল ঘুম যাইবো।

এ রূপ যৌবন ভার কাহ্নু বিনি অসার

তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥

হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ ধরোঁ।

এহোবার পুর মোর আশে।

চল দুতী তার থানে আণশ্রীমধুসুদনে

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥[17]

ivawein LÐ, c‘ bs- 61

fwVAvjxivM t hwZt \

হরি হরি

আয়াসেঁ কাহ্নের উরে

শুতিলো দিঞাঁ শিয়রে

প্রাণের বড়ায়ি লো

দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল

কাহ্নাঞিঁর দরশন

যেহেন ভৈল সপন

প্রাণ বড়ায়ি ল

জাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল

কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞিঁ

উদ্দেশ বোল বড়ায়ি। ল

প্রাণ বড়ায়ি ল

তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥

নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ

সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে

কোণ আদিবস ভৈল

কিবা অপরাধ কৈল

যবে কাহ্নাঞিঁ রোষিল আহ্মারে ॥

সোঞঁরী কাহ্নের বাণী

না রহে মোর পরানী

চেতন নাহি মোর দেহে

তেজিলো সুখ আসেস

দিনে দিনে তনু ষেঘ

ভাবিয়া সে কাহ্নের নেহে

বিধি বিপরীত ভৈল

আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল

বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে

বোল বড়ায়ি উপদেশ

কাহ্ন গেল কোন দিশে

গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥[18]

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাটিয়ালী রাগ ও সুরের যে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সেটিকে যদি ভাটিয়ালী গানের আদি নিদর্শন হিসেবে ধরি তাহলে এ গানের উদ্ভব ১৪শ শতকে বলে নিশ্চিত হতে পারি। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা মনে করেন- চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ। তার পূর্বেই চৈতন্য দেবের কবিখ্যাতি সমাজে সু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনশ্রুতি অনুসারে চণ্ডীদাসের জন্ম, পূর্বেই লক্ষ্য করেছি ১৩২৫ খ্রীঃ থেকে ১৪১৭ খ্রীঃ মধ্যে। আমাদের মনে হয় জনশ্রুতিমূলক এই সম্ভাব্য জন্মকাল একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম চতুর্দশ শতাব্দের মাঝামাঝি কোনো সময়ে, এবং তাঁর সুবিখ্যাত সুবৃহৎ কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন ঐ শতাব্দের শেষ দিকে এ অনুমান আমাদের মনে হয় খুব অযৌক্তিক নয়। লিপি ও ভাষা বিচার যাঁরা করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্তের

সঙ্গে আমাদের অনুমান সঙ্গতিপূর্ণ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবও এ গ্রন্থখানি ১৩৪০-১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলে মনে করেন।[19]

এদেশের প্রাচীন গীতিকা ও মধ্যযুগের বাংলা গীতিকায় 'ভাটিয়ারী' নামে যে রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় তার থেকেই এক সময় 'ভাটিয়ালী' গান নামে একটি বিশেষ সঙ্গীতের ধারার উন্মেষ ঘটে। এটি আঞ্চলিক ও লৌকিক শব্দ হওয়ার ফলে প্রথম দিকে প্রণীত বাংলা ভাষার অভিধানে এর বিস্তারিত বিবরন তেমন পাওয়া না গেলেও, পরবর্তীতে তা বর্ণিত হয়েছে। 'শব্দকল্প দ্রুম' রচনায় কিছুটা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকার ফলে এখানে ভাটিয়ালীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটি একটি লৌকিক শব্দও বটে। যদি 'বঙ্গাল রাগ'কে ভাটিয়ালীর আদি রূপ হিসেবে ধরেনেই তবে, চর্যাপদে উল্লিখিত 'বঙ্গালরাগ' অনুসারে বলা যায় এ গানের উদ্ভব ১০ম থেকে ১২শ শতকের দিকে। যদিও 'বঙ্গাল রাগ থেকেই যে ভাটিয়ালী সুরের উদ্ভব' এ বিষয়টি নিশ্চিত নয়। মধ্যযুগের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ 'ভাঠিআলী' রাগের বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসেবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ভাটিয়ালীর প্রচলন ১৪শ শতকেও সমানভাবে ছিল। চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগর কবি হওয়ার কারণে ভাটিয়ালী গান উদ্ভবের সময়কাল এরও পূর্বে বলে মনে করা হয়। কারণ ভাটিয়ালী গানকে পূর্ব বঙ্গে সৃষ্ট গান হিসেবেই ধরা হয়। পূর্ব বঙ্গ হতে পশ্চিমবঙ্গে (নদী পথের মাধ্যমে) এ গানের বিস্তৃতি ঘটতে আরো অনেক সময় লেগেছিল। চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যরস ও পদ আস্বাদিত হয়ে যখন সমগ্র বাংলায় এর বিস্তার ঘটান, সে সময় ভাটিয়ালী গানেরও বিস্তার ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ভাঠিআলী' রাগের উল্লেখ ও ব্যবহার অনুসারে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ১৪শ শতকে। আধুনিক সময়ে এসে এটি গ্রামীণ এবং নাগরিক উভয় জীবনে সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পরিচিত সুর হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। উদাস, টানাসুর ও করুণ কাহিনিমূলক গান মানেই ভাটিয়ালী সুরে রচিত।

কোকিলের কুহু কুহু শব্দের সাথে সাথে সুর মিলিয়ে এদেশে বসন্তকাল নেমে আসে। বসন্তকাল যে কোন দেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। গাছে গাছে দেখা দেয় ফুলের সমারোহ। নতুন পাতার আগমনে সেখানে প্রজাপতি আর মৌমাছির আনাগোনা বেড়ে যায়। মাঠে মাঠে শষ্যের ক্ষেত ভরে উঠে ফসলে। বসন্তে প্রকৃতির রূপে শুষ্কতার সঞ্চার হলেও ফুল আর পাতার মেলায় তাকে আর বড় মনে হয় না। বসন্তের সাথে লোককবি মানব জীবনের বসন্ত কালের বা সময়কে এক করে দেখেছেন।

বসন্ত বাতাসে সইগো বসন্ত বাতাসে

বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে সইগো। (শাহ আবদুল করিম- ১৯১৬-২০০৯)

Z_¨wb‡‘k

১। শব্দকল্প দ্রুম, স্যার রাজারাধাকান্তদেববাহাদুরেণ, ১৮৩৬ - কলিকাতারাজধান্যম্, পৃ. ৮৭২।

২। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান- শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, দি ইন্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস- 'দ্বিতীয় ভাগ' পৃ. ১৬৭০।

৩। 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' সম্পাদক-শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, প্রকাশক- শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৪, পৃ. ৮৫২।

৪। 'শব্দার্থ প্রকাশিকা', শ্রী ক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক, প্রকাশক- শ্রী অক্ষয়কুমার রায় এণ্ড কোং- কলিকাতা- ১২৯৬, পৃ. ৫৬০।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা- ১৯৪০, পৃ. ২০১-২০৩।

৬। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপনি, কলকাতা- ২০০৯, পৃ. ৩৮২।

৭। ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ, অধ্যাপক সুকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা- ২০ মে ২০০৩, পৃ. ৩৪৮।

৮। বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা- জুন- ১৯৯৭, পৃ. ২২।

৯। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার- ঢাকা, ফাল্গুন- ১৪১৪, পৃ. ৭৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mvb I cvKwZK cwi‡ek

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। মানুষের বিপদ-অপদ, আচার-পরব সব কিছুই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। মানুষের ক্রমোন্নতির ফলে প্রকৃতির উপর যে চাপ তৈরি হয়েছে, তার বিরূপ প্রতিক্রীয়া থেকে বাঁচার জন্যেও প্রকৃতি হয়ে উঠেছে আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে কল-কারখানা, যানবাহন, প্রযুক্তি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। কিন্তু এগুলোকে দৃশ্যমান পার্থিব উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপার্থিব উপাদান হিসেবে বিবিধ ধর্ম, গোষ্ঠী, শ্রেণি, চেতনার বৈষম্য, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। একই সাথে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে এবং মানুষের নিজের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে বৃহৎ সাংস্কৃতিক বলয়। যার মধ্যে প্রকৃতির প্রায় সকল উপাদান কোন না কোন ভাবে বরাবরই যুক্ত থেকেছে। পরিবেশ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে' যা আমাদের ঘিরে রাখে বা পরিবেষ্টনী। ইংরেজিতে একে Environment বলা হয়। প্রকৃতি বা প্রতিবেশ নির্ভর উপাদানই পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের আবাসন গড়ে উঠলেও সব এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ এক রকম হয় না। ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেও তারতম্য রচিত হয়। পরিবেশকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ২. সাংস্কৃতিক পরিবেশ। যে সকল উপাদান আপনা-আপনি তার খেয়াল খুশিমতো গড়ে ও বেড়ে উঠে তাকে প্রাকৃতিক উপাদান বলা হয়। এগুলোর মধ্যে মাটির রুক্ষতা, বন্ধুরতা, মেদুরতা, নদ-নদী, বিল, হাওড়, বাওড়, লতা, গুল্ম, উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃষ্টি ও ধ্বংশ উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

প্রকৃতিই মানুষকে তার সময়ের উপযোগী করে ভাবতে শিখিয়েছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই প্রকৃতির উদার উপাদান থেকে সুবিধা নিয়ে নিজেদেরকে আবৃত ও সুরক্ষা করেছে। দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের পর মানুষের ভাবনালোকে যে সাংস্কৃতিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে তা মানুষ্য সভ্যতাকে নতুন করে পরিপুষ্ট করেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল লোকায়ত সভ্যতার মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যগত অবলম্বন। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রাকৃতিক উপাদান রূপক, প্রতীক বা সংকেত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর কৃষি সভ্যতা এখানকার মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনাচারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হাবিবুর রহমান এর মতে- নিসর্গ ললনার যুগে প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য মানুষের মনে নিত্য নতুন ভাব, সুর ও ছন্দ যোগাতো। প্রকৃতি ঘেষা মানুষের জীবনে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য ছিল অনেক। আর এগুলো প্রকাশের মাধ্যম ছিল নৃত্য ও সঙ্গীত। লোকায়ত জীবনে কথার চেয়ে সঙ্গীতেরই ছিল প্রাধান্য। তাই এই নিসর্গ ললনার যুগ থেকেই বাংলাদেশের অধিকাংশ

লোকসঙ্গীতের প্রেরণা এসেছে বলা যায়। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরম অদ্বৈতবাদী। ভারতবাসী অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ঔষধি ও বনস্পতির ঋতুগত বিচিত্র সৌন্দর্য উপলব্ধির মাধ্যমে সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের উদ্দেশ্যেই তাদের আন্তরিক প্রীতি ও প্রণতি নিবেদন করে এসেছে।[১] বাংলার আদি সাহিত্য ও সঙ্গীতের মত মধ্যযুগের সঙ্গীতেও প্রকৃতির রূপ বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির কাছে এখানকার মানুষ এত বেশি সমর্পিত থাকার কারণে লোকসঙ্গীত রচয়িতারা কোনভাবেই প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এক কথায় বাঙালির দর্শন প্রকৃতির কাছে সমর্পিত। পীর-আউলিয়া, দেব-দেবীও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ত্রাণকর্তা হিসেবে এসেছে। এখানকার আদিবাসী সমাজ এবং সমতল ভূমিতে বসবাসকারীদের উভয় থেকেই প্রকৃতির প্রতি এ বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আদিম সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা বহির্জগতের বাস্তবতা বা জ্ঞান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করায় এবং প্রকৃতিকে জয় করার সৃষ্টিশীল উপায় তাদের জানা না থাকার ফলে, প্রকৃতির প্রতি এমন নিঃসংকোচ সমর্পণ করেছে। সভ্যতার উন্মেষকালেও মানুষ সমানভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কারণে মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা কমলেও বাস্তবে তা থেকে একেবারে সরে আসা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষ মাত্রই তার নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে একটি কল্পচিত্র বা রূপক ভাবনাজাত image কিংবা প্রতিচ্ছবি তৈরি করে, এবং তার সাথে নতুনের তুলনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তুলনা কিংবা মিলিয়ে নেওয়ার বেলায় মানুষকে তার চারপাশের প্রকৃতিই একান্তভাবে সহযোগিতা করে থাকে। যে কোন দেশের মত বাংলাদেশের বিশেষ নিসর্গ দৃশ্যাবলী সংখ্যাহীন, কিন্তু এদেশের প্রাকৃতিক রূপকে সামান্যীকরণ করা হয় ভৌগোলিক আলোচনায় কিংবা সাহিত্যিক বর্ণনায়। এই দেশ রেখাময়, নদী-মেখলা, উর্বর সমতল শষ্যক্ষেত, বৈচিত্র্যময় নীল সবুজ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কাল বৈশাখীর ঝড়, মৌসুমির আবিশ্রান্ত বৃষ্টি, দীর্ঘ সরু রেখার মতো গাছপালা, পাহাড় ও টিলা, বর্ষার প্লাবনে উপচিয়ে পড়া নদীর দুকূল, হাওড়-বিল, বন-বনানী, শষ্য-শ্যামল প্রান্তর, পাখির কুজন, মেঘের গর্জন, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ও পাতার মর্মর ধ্বনিতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নেই এই ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশে। তাই এদেশের লোকসঙ্গীত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।[২]

লোকসঙ্গীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে হাবিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রচলিত প্রায় সকল শ্রেণির লোকগীতির ধারাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হল ঃ ১. মহাশূন্য ২. জলবায়ু ৩. ভূ-অবয়ব ৪. উদ্ভিজ ৫. জীবজন্তু।

ভাটিয়ালী গানের বেলায় আমরা আরো একটি উপাদানকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখি তা হল ‘মানুষ’। জীবজন্তু বিভাগের মধ্যে জীব হিসেবে মানুষের নাম এলেও গানের ভাষায় যেখানে সরাসরি

মানুষের কথা বলা হয়েছে, এখানে সে ধরনের বিষয়াবলীকে গণ্য করা হয়েছে। কবিয়াল বিজয় সরকারের ভাষায়-

আর কি ফিরে পাবো তারে রে যারে হারায়েছি জীবনে

সে যদি আমায় দেখতে আসে রে, চিনবে কি জল দেখিলে দুই নয়নে।

বাদল-হাওয়া নিষ্ঠুর শ্রাবণ মেঘে ঢাকা চাঁদ

এমনি দিনে হারায়েছে আমার ঘরের চাঁদ

পড়লো আলোর ঝরনায় আধারের বাঁধ, তারে খুঁজি সারা ভূবনে।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ভাটিয়ালী গানে যে কালাচানের কথা বলা হয়েছে তিনিও বাস্তবে একজন মানুষ। মানুষকে উপজীব্য করেই এ ধরনের কাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। যে বালকের মাখন চুরি থেকে শুরু করে মথুরার রাজা হওয়া অব্দি বাংলার সাধারণ মানুষ তার সাথেই থেকেছে, তাকে দেবতা ও মুক্তিদাতা জ্ঞানে ভক্তি করেছে, তার প্রতি উদ্দেশ্য করে রচিত বাংলার লোকগানের একটি বড় অংশকে 'মানুষ বিষয়ক' লোকগান নামে নামকরণ করা যেতে পারে, যা ভাটিয়ালী গান বা সুরের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য।

তোর লাগি কাঁন্দে আমার প্রাণ

ফাঁকি দিয়া প্রাণ নিয়া কই রইলারে কালাচান।

আঁধার করে ব্রজপুরী কই লুকাইলে মনোহরী

আমার দুই নয়নে বহে বারি না পাইয়া তোমার সন্ধান।

আগে যদি জানতাম কালা তোর প্রেমে এতই জ্বালা

প্রেম না করে ছিলেম ভালা দিতেম না আর কূলমান।

আক্কেল মিয়ার এই নিবেদন সেদিন হইবে আমার মরণ

বন্ধু আমার খবর পাইলে দিও তোমার চরণখান।

অথবা

মানুষ ধর মানুষ ভজ শোন বলিরে পাগল মন

মানুষের ভিতরে মানুষ করিতেছে বিরাজন।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ কি আর এমনি বটে, যার চরণে জগত লোটে

এইনা পঞ্চভূতের ঘাটে খেলিতেছে নিরঞ্জন

চৌদ্দতালার উপরে দালান তার ভিতরে ফুলের বাগান

লাইলী আর মজনু দেওয়ান সুখেই করেছে আসন।

দুইধারে দুই কঠরা হায়াত মউত মাইজখানে ভরা

সময় থাকতে খুঁজগে তোরা নিকটেতে কাল সমন

সোনার পুরি আন্ধার করে যেদিন পাখি যাবে উড়ে

শূন্য খাঁচা থাকবে পড়ে কে করবে আর তার যতন।

তালাসে খালাস মেলে তালাস করো রং মহলে

উঠিয়া হাবলঙ্গের কূলে চেয়ে থাকো সর্বক্ষণ

দেখিবে হাবলঙ্গের কূলে দুই দিকেতে অগ্নি জ্বলে

ভেবে রশিদ উদ্দিন বলে চমকিছে স্বর্ণের মতন।

কথা ও সুর ঃ বাউল রশিদ উদ্দীন

সরলা রে তুই আমারে করিস না পর

কেউ নাইরে অভাগার চিরদিনই হাহাকার

পরাণ যত হয় কাতর আমি তত হই তোর।

প্রেমবিনে চৈতন্যপুরে যায় বাতাসে উড়ে উড়ে গো

যদি না দেখি তোর সোনা মুখ বিদীর্ণ হয় আমার মুখ

দুঃখ জনম ভররে আমার সরলা রে।

রাই বিনে বৃন্দাবনে লাভ কি স্বপ্ন বুনে

যদি ফুল না ধরে ঐ প্রাণে মধুক্ষণের নাইরে মানে

একটু দয়া কররে আমায় একটু দয়া কর।

কথা ও সুর ঃ প্রচলিত

অথবা

দেহতরী ছেড়ে দিলাম গুরু তোমার নামে

আমি যদি ডুইবা মরি, কলঙ্ক তোমারই নামে।

দেহমন সব সঁপিলাম, আমি আমিত্বে ভার তোমায় দিলাম

এই অধমরে টেনে রাখো গুরু, তোমার কৃপা ডোরের প্রেম বন্ধনে।

অন্ধ গোপাল গোসাই বলে, ডুবে রইলাম মায়াজালে

এ ভব সাগর পাড়ি দিতে গুরু, রক্ষা নাই তোমা বিনে।

কথা ঃ অন্ধ গোপাল, সুর ঃ বিদিতলাল দাস, তাল ঃ কাহারবা।

gnvkb¨

আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাটিয়ালী গানে রূপক অনুসঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি পরিবর্তনের মতো মানব জীবনেও একের পর এক আসে পরিবর্তন। মহাকালের এই বিচিত্র পরিবর্তন মানুষের ভাবনায় এনেছে নতুন নতুন ধারণা। আকাশ থেকে উল্কা খসে পড়ার মতো করে মানব নামক জীবের এই পৃথিবীতে আসা, আবার পৃথিবীর শত সহস্র মানুষের মাঝে থেকে একদিন হঠাৎ করেই তার চলে যাওয়া। এই আসা এবং যাওয়াকে মহাকালের স্রোতের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এই সোনার মানুষ বাতাসের আগে চলে, খুঁজলে তারে নাগাল পাবে কে

সে মানুষে হিসাব ধরেছে সাধুও তার সন্ধান আছে যার কাছে।

চন্দ্র-সূর্যের দৈনন্দিন আলো দেয়া আবার পৃথিবীর অন্ধকার হয়ে আসা, মেঘের বজ্রপাত ক্ষণে ক্ষণে মানুষকে সতর্ক করে যায়। এমনকি এই গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিপথকে কেন্দ্র করে মানুষের ধর্মীয় প্রার্থনার সময়ও নির্ধারিত হয়েছে। সকল ধর্মে তা স্বীকৃত। এর ফলে লোকগানের বন্দনাতেও অনেক সময় এ সকল উপাদানকে ভজনা করা হয়েছে।

পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর

একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পসর।

চারকোণা পৃথিবী গো বাইন্ধ্যা মন করলাম স্থির

সুন্দরবন মোকামে বান্ধলাম গাজি জিন্দাপীর।।

মৈমনসিংহ গীতিকা

গগনেতে ডাকে দেয়া আসমান হইলো আন্ধিরে বন্ধু

সোনা বন্ধুরে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি।।

তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে সুর নদী

সেই নদীকে মনে হইলো অকূল জলধি রে বন্ধু।।

উইড়া যায়রে চকোয়ারে পঙ্খী পইড়া রইলো ছায়া

কোন পরাণে বিদেশে রইলাই ভুলি দেশের মায়া রে বন্ধু।। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, (১৯১২–১৯৮৬)।

ভাটিয়ালী গানের মহাশূন্য বিষয়ক রীতিটির প্রভাব লালনের গানেও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। লালন বাউল সাধক হলেও তার গানের মধ্যে ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত ঈশ্বর প্রেমমূলক গানের অনেকাংশ জুড়েই ভাটিয়ালী সুরের চরাচর। মহাশূন্যকে ঈশ্বরের প্রকৃত আবাসস্থল কল্পনা করে লোককবিরাও গান রচনা করেছেন। নদী, দেশ-বিদেশ, দেহ ইত্যাদির পাশাপাশি মহাশূন্যের মাঝে বাউল কবি 'লালন সাঁঈ' ঈশ্বরকে খোঁজ করেছেন।

কোথা আছে রে সেই দীন দরদী সাঁঈ

চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর পার।।

চক্ষু অন্ধ দিলের ধোকায় যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়

কে রঙ্গ সাঈ দেখছে সদাই বসে নিগুম ঠাই।

এখানে না দেখলাম যারে চিনবো তারে কেমন করে

ভাগ্য গতি আখেরে তারে দেখতে যদি পাই।।

সমঝে ভজন সাধন করো, নিকটে ধন পেতে পারো

লালন কয় নিজ মোকাম ধর বহু দুরে নয়।। লালন সাঁঈ, (১৭৭৪–১৮৯০)

Rjevq

বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্রের দেশ। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের কারণে বছরের বেশিরভাগ সময় বৃষ্টিপাতই এখানকার তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ছয়টি ঋতুর উপস্থিতি সরাসরিভাবে বুঝতে পারা না গেলেও তিনটি ঋতুর সরব উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। ষড় ঋতুর প্রভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকার মানুষের মনের প্রায় প্রতিটি রূপ, রং ও বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য এই ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান অঞ্চল হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম এই মাধ্যম নির্ভর করে এই জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর। বৈশাখ মাসে খরতাপের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে গানের মাধ্যমে। এটিকে কিছুটা মিশ্রভাবের গান বলা চলে। গানটির প্রথম অংশ গীত হয়েছে ভাটিয়ালী সুরের ঢংএ এবং পরবর্তীতে তাল যুক্ত হয়ে তা সারি গানের রূপ গ্রহণ করেছে।

বেলা দ্বি-প্রহর ধু ধু বালুচর

ধুপেতে কলিজা ফাটে বিয়োগে কাতর

আসমান হইলো টুডা টুডা জমিন হইলো ফাডা

মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে মেঘ দিব তোর কেডা।।

সাধন-ভজন বিহীন মানব জীবনের শেষ বেলাকে বলা হয়েছে ঘোর অন্ধকার সময়। বাস্তবের সাথেও এর অনেকটা মিল রয়েছে। সময় থাকতে স্রষ্টাকে না চিনে না জেনে মানুষ তার ভবের কাজে মত্ত থাকে। এ সময় সে জীবনকে অনন্ত, অসীম মনে করে। কিন্তু যখন সে জীবন নদীর শেষ সীমানায় এসে পৌছে তখন তার মনে হুঁশ জাগে। এ সময় মানবাত্মা স্রষ্টার মুখোমুখি হতে ভয় পায়।

কালো মেঘে সাজ কইরাছে পরাণ তো মানে না

সাবধানে চালাইও তরী বা নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না

আরে ও সুজন নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না।।

ঢাকাশ্বরে প্রেম বাজারে প্রেমের বেচাকেনা

মদনগঞ্জের মহাজন মারা ঐ ঘাটে লাগাইও না বা।।

ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর পারো বইয়া

পার হইমু পার হইমু কইরা আমার দিনতো গেলো গইয়া বা।। কথা ও সুর ঃ রাধারমণ দত্ত, সিলেট

f-Aeqe

হাওড়, বাওড়, নদ-নদী, সাগর, খাল-বিল, চর, উঁচু-ভূমি, পাহাড়-টিলা প্রভৃতি হলো ভূ-অবয়ব। লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে এ সকল অবয়ব সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষভাবে লোকসঙ্গীতে এ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীত গবেষক বুদ্ধদেব রায় তাঁর বাংলা গানের স্বরূপ গ্রন্থে বলেছেন- পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল মুলুকের গান বলে এই গান 'ভাটিয়ালী' গান নামে পরিচিত। মাঝিদের কণ্ঠের একক গান হল ভাটিয়ালী। বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান ধারা। বাংলায় প্রচলিত প্রায় সকল ধরনের লোকসঙ্গীত ধারার মধ্যে এ রীতির প্রভাব পাওয়া যায়। বিরহ, ব্যথা, বেদনা নিয়ে এটি গীত হয়। বাংলার একান্ত নিজস্ব উপাদানে এই সঙ্গীত গঠিত হয়েছে বলে এর মধ্যে লোকজীবনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপাদানও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। দেহ শব্দের রূপক হিসেবে যে ঘর, নৌকা কিংবা জীবন সাগরের কথা বলা হয়েছে সেগুলোও বাংলার একান্ত নিজস্ব উপাদান। কোথাও কোথাও প্রকৃতির উপাদান নিজ নিজ নামেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে

ও দরদি কে দিল ভাঙ্গিয়া রে, মন কাঁন্দে পদ্মার চরের লাইগা।।

পানিতে কাঁন্দে পানি কাউরী শুকনাত কাঁন্দে টিয়া

আমার অভাগ্যার মন কাঁন্দেরে পোড়া দেশেরও লাগিয়া।।

দরদি রে আমার

আম গাছে ধরেনি মুকুল, ঝিঁঙা মাচায় ফুটেনি ফুল

আইনি বকুল তলায় আউলা চুলে সন্ধ্যা নামিয়া

গহিন রাইতে একলা ডালেরে, দুখিনী ডাকেনি পাপিয়া।।

কার্তিক মাসে বুকে খির ক্ষেতের ধানে ধানে

অঘ্রাণ রান্ধুনি পাগল নয়া ভাতেরও অঘ্রাণে, ক্ষেতের ধানে ধানে।

দরদি রে, আশ্বিন মাসে কত খুশিতে ভাইধন আইতো নায়োর নিতে

ভরা গাঙ্গে রঙ্গিলা নাউ বাইয়া

আজ কোলে আমার লক্ষ্মিন্দর বিষে অঙ্গ জরজর

আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া, দরদি রে মন কাঁন্দে পদ্মার চরের লাইগা।।

(হেমাঙ্গ বিশ্বাস-১৯১২-১৯৮৬)

বাংলাদেশ নদী-বিধৌত নিম্ন সমভূমি অঞ্চল। এদেশের অসংখ্য নদ-নদী প্রকৃতির এই মসৃণ রূপকে কোথাও কোথাও বিঘ্নিত করেছে। বাংলাদেশের এমন হাজারো নদী অনেক সময় এখানকার মানুষের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। আবার বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি বয়ে নিয়ে আসে পলিমাটি, যার ফলে কৃষি জমি হয়ে উঠে উর্বর। বেঁচে থাকার জন্য নদীর উপর এখানকার মানুষ নির্ভরশীল, মরণের পরেও সেই মানুষকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এদেশে যে সকল নদ-নদীর প্রাধান্য দেখা যায় তার মধ্যে ধল্লা, তিস্তা, চম্পা, মনসা, সুরমা, যমুনা, পদ্মা বা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ক্ষীর, পারুয়া, উজালা, কর্ণফুলী, ইছামতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নদী কিংবা সাগরের এসব ঢেউ, জোয়ার-ভাটা লোকসঙ্গীতের কথামালাকে সমৃদ্ধ করেছে। লোকসঙ্গীতে ভূ-অবয়বের এমন ব্যবহার থাকার ফলে এর বাণী সাধারণ মানুষের কাছে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নদীর সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক স্থাপনে লোককবিগণ নদীর বালুর সাথে মানব জীবনের তুলনা করেছেন। নদীর পানি শুকিয়ে গেলে যেমন অনেক বড় বালুর চর পড়ে তেমনি নতুন পানি বা জোয়ারের আগমনে সে চর আবার হারিয়ে যায়। মানব জীবনও ঠিক তেমনিভাবে এক জোয়ারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং পরবর্তী জোয়ারে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়।

আমি তোমারও লাগিয়া রে ঘরবাড়ি ছাড়িলাম রে

সাগরও সেচিলাম রে, মানিক পাইবার আশে।।

বন্ধুরে তোমার পাগল আমি রে বন্ধু জানে দেশের লোকে

পাষাণ হইয়া মারলে ছুরি, অভাগিনির বুকে রে বন্ধু।।

বন্ধুরে, নদীর কাছে কইলে দুঃখ পানি যায় উজাইয়া

বৃক্ষের কাছে কইলে দুঃখ, পত্র যায় ঝরিয়া রে।।

বন্ধুরে, দুঃখের কপাল সুখ হইলো না ফিরি দেশে দেশে

যুগল দাসে জন্মাবধি চোক্ষের জলে ভাসে রে।। কথা ও সুর ঃ যুগল দাস

জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আবাসস্থলেরও পরিবর্তন হতে পারে। আবার নদীর বিচিত্র আচরণের কারণে কখনো তার তীরবর্তী এলাকা মানুষের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠে। সে সময় মানুষকে বাধ্য হয়ে সে নদী উপকুল অথবা তার তীরবর্তী এলাকা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। দীর্ঘ দিনের পরিচিত নদীকে ছেড়ে অন্যস্থানে বসবাস করা একজন মানুষের কাছে নিদারুন কষ্টের বিষয়। ভাটিয়ালী গানে লোককবির মন তার ফেলে আসা দিনের মতো ছেড়ে আসা স্থানের প্রতিও সমানভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। সেখানে অন্য কোন নদী কিংবা সরাসরি তার পছন্দের নদীকে কল্পনা করে ভাটিয়ালী গীত হয়েছে।

পদ্মারে আমার সাধের পদ্মা, পদ্মা কউ কউ আমারে

মন বাঁশরি কাইন্দা মরে তোমার বালুচরে রে।।

পদ্মা রে, তুমি আমার ভালোবাসা, তুমি আমার স্বপ্ন আশা

কে বলেরে কিত্তিনাশা কূল ভাঙ্গা তোরে

ও যেজন ভাঙলো কূল, ভাঙলো বাসা রে, সর্বনাশা চিনলি না তারে

মন বাঁশরি কাইন্দা মরে তোমার বালুচরে রে, পদ্মা কউ কউ আমারে।।

পদ্মারে, পরাণ মাঝি হাইল ধরিতো, হোসেন মাঝি গুন টানিতো

ভাটিয়ালীর সুর নাচিতো ঢেউয়ের নুপুরে

কত চাঁন্দের বাত্তি জ্বলতো জলে রে, রাইতের নিঝুম আন্ধারে

মন বাঁশরি কাইন্দা মরে তোমার বালুচরে রে।।

RxeRš

পরিবেশের বর্ণনা কিংবা রূপক উভয় অর্থেই ভাটিয়ালী গানে জীবজন্তু বিষয়ক শব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। গানের বর্ণনায় এগুলো শিল্পীর স্মৃতি কাতরতা থেকেও এসেছে। জীবনের ভালো সময়ের

বর্ণনা করতে গিয়ে জীবজন্তুর সাথে মানব জীবনের তুলনা করা হয়েছে। পরিবেশ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ফলে এর বিষয়বস্তু বর্ণনার সাথে সাথে মানুষের পক্ষে তার বর্ণিত বিষয়াবলীকে খুব সহজেই বুঝতে সুবিধা হয়।

হবিগঞ্জের জালালী কইতর, সুনামগঞ্জের কোড়া

সুরমা নদীর গাঙচিল আমি শূন্যে দিলাম উড়া

তোমরা আমায় চেনোনি, তোমরা আমায় চেনোনি

ডানা ভাউঙ্গা পড়লাম আমি কলকাতার উপর।।

প্রাচীনকালে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রধানত নদী কেন্দ্রিক ছিল। কোথাও কোথাও দূর দেশে খবর পাঠাতে পোষা পাখিকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ভাওয়াইয়া গানে লম্বা ও উদাস সুরে গাড়িয়াল ভাইয়ের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে রূপক কিংবা সরাসরি আঞ্চলিক কথায় পরিচিত পাখির নামে দূর দেশের বন্ধুর কাছে প্রাণের কথা বলা হয়েছে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত ও লিখিত উভয় সাহিত্যেই এমন জীবজন্তুর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

উইড়া যায়রে চকোয়ারে পঙ্খি, পইড়া রইলো ছায়া

কোন পরাণে বিদেশ রইলাই ভুলি দেশের মায়া রে বন্ধু।।

মুর্শিদ বা দয়াল গুরুর কাছে একজন সাধক তার মিনতি জানানোর সময়ও গানের ভাষায় জীবজন্তু বিষয়ক শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে হাতি-ঘোড়ার বিষয়াবলীকে তুলে এনেছেন। তার কারণ হলো প্রাচীন বাংলায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করতে তার কত সংখ্যক এ জাতীয় প্রাণি ছিল সে বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হতো। ভাটিয়ালী গানে একজন সাধক এ সকল কোন কিছুকে গ্রহণ না করে তার নিজের পরপারের দিনের কথা ভেবে থাকে। যা তার নিজের গানের সুরে তারই দয়াল মুর্শিদকে শোনানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইলো না শুনেন গো মুর্শিদ

মুর্শিদ ও, কারো বা আছে হাতি গো ঘোড়া, আমার আছে কানা মেড়া ও

মেড়ায় পুব চিনে পশ্চিম চিনে না ও, শুনেন গো মুর্শিদ

মুর্শিদ ও, কারো বা দলান গো কুঠা, আমার আছে ভাঙা ডেরা ও

ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানেনা ও, শুনেন গো মুর্শিদ ।।

মুর্শিদ ও, কারো বা ধুতি গো চাদর, আমার আছে ছিড়া তেনা ও

তেনায় লাজ ঢাকে তো অব্রু ঢাকেনা ও, শুনেন গো মুর্শিদ।। (সংগ্রহঃ- হেমাঙ্গ বিশ্বাস-১৯১২-১৯৮৬)

D‖™R

বন্ধুর মনের সাথে নিজ মনের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ভাটিকবি নানা ধরনের উদ্ভিজ প্রাণির নাম রূপক অর্থে তার গানে ব্যবহার করেছেন। ভাটি গানের মধ্যদিয়ে বন্ধুকে না বলা কথাগুলো কবি শোনাচ্ছেন প্রকৃতিকে। লোককবির লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক সৌন্দর্য ও গঠন বৈচিত্র্য এবং চিত্রকল্প রূপায়ণের জন্য উদ্ভিজ জগৎ হতে অসংখ্য প্রতীক চয়ন করেছেন। গ্রাম্য জীবনে বাঁশের ব্যবহার বহুমুখী। প্রতিটি গৃহেই বাঁশের বাগান ও ঝাড় দেখা যায়। বাঁশ দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন নৌকার ছই, পাখা, কুলা, খালই, ডালা, মই প্রভৃতি তৈরি করে থাকে। তাই লোকসঙ্গীতেও বাঁশের কথা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।[৩]

ও বাওই রে নলের আগে নল ফুল বাওই, বাঁশের আগে টিয়া রে বাওই

কইও মোর বন্ধুয়ার আগে বাওই না যেন করে বিয়া।।

রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বিষয়ক গানে প্রকৃতির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বেশি। শ্রীমতি রাধাকে রেখে কৃষ্ণের মথুরা গমনে বাঙালি হৃদয় মাত্রই কেঁদে উঠেছে। কৃষ্ণ বিরহে সাধকগণ প্রতিদিন রাধা রূপে কেঁদে চলেছেন বৃন্দাবনের পথে পথে আর অপেক্ষায় থেকেছেন কৃষ্ণের আগমনের জন্য।

সই গো সই, বন্ধু যদি আসে দেশে বলিস তোরা বন্ধুর কাছে

তমাল ডালে বাঁধা আছে তোমার প্রেমের মড়া, সইগো

আমি বন্ধের প্রেম আগুনে পোড়া।।

প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো মানুষের জীবনও প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা পায়। এ সময়ে উদ্ভিজ উপাদানের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সবারই জানা। প্রকৃতির এই উপাদানের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মানব সভ্যতার বিকাশ সুষ্ঠভাবে সম্ভব হতো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যার

ফলে মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কিত যে কোন ধরনের বিষয়াবলীতে এ উপাদানের সাথে তুলনা করে মনের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

তুমি আমার বটবৃক্ষ, আমি তোমার লতা রে বন্ধু

তোমারে ঘেরিয়ারে বন্ধু, কইতাম কত কথা রে।।

বাঙালি জীবনে শুধুমাত্র বড় ধরনের বৃক্ষ-লতা-পাতা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেনি, এর বাইরেও ছোট ছোট গুল্ম, শস্য, ফলমূল, ফুল, লতা-পাতা ভাটিয়ালী গানের অনুসঙ্গ হিসেবে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা সময় কৃষি কাজকে অস্বীকার করে সমাজে টিকে থাকার কথা কোন ভাবেই চিন্তা করা যেতো না। ভাটিয়ালী গানের যে রূপ তা সভ্যতার বিকাশ সাধনের পরবর্তী সময়েও আমাদের লোকজীবনের প্রভাব থেকে কোন রকম বিচ্যুত হয়নি।

কৃষি ব্যবস্থা আমাদের ভাটিয়ালী গানকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। কৃষি ব্যবস্থা বলতে সব রকমের শস্য উৎপাদনকে বলা হয়, খাদ্য শস্যের পাশাপাশি বিক্রয়যোগ্য সকল ধরনের ফলমূল, ফুল, পাতা, শাক-শব্জী ইত্যাদিও বুঝায়। কৃষি নির্ভর করে পানি, মাটি, আলো, হাওয়ার উপর। আগেকার দিনের মতো বর্তমান সময়েও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কৃষি ব্যবস্থা চালু ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিকে অস্বীকার করে কোন কিছুই করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে মানুষ নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে, একে গানের কিংবা কবিতার কথায় লিখে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপদেশ হিসেবে ব্যবহার করেছে। মানুষ যেমন কল্পনা প্রবণ তেমনি সে বুদ্ধিমান। পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাকে সে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শিখে গেল। যে সময় নদীতে বান ডাকে তখন মানুষ উঁচু জায়গায় চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সে বুঝে গেল কখন আম গাছে ফল পাকবে, ঠিক কোন সময় ধান বুনতে হবে আর কখন চারা উঠিয়ে রুইতে হবে। কখন ধান কেটে নিয়ে গোলায় তুলতে হবে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষের বশ নয়। মানুষের মনে হলো বরং উল্টোই। প্রতিকুল প্রকৃতিকে বশ করবার জন্য মানুষ নানা যাদু শক্তির কল্পনা করে নিয়ে ভাবতে লাগল যে এই শক্তির বলে সে প্রকৃতিকে বশ করতে সমর্থ হবে।[৪]

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষেরই বসবাস এখনও পর্যন্ত গ্রামে। শত শত বছর ধরে চলে আসা বাঙালির এই সংস্কৃতির সাথে গ্রাম-বাংলার মানুষ খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। প্রযুক্তির তেমন কোন প্রভাব গ্রাম-বাংলার এসকল অঞ্চলে পড়েনি। বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতিতে এদেশের কুটির শিল্পের একটি বড় প্রভাব বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুগত এবং আত্মিক সংস্কৃতি উভয় উপাদানের মধ্যে এটি পাওয়া যেতে পারে। হাতিয়ার নির্মাণ, জীবিকা, খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত, আশ্রয় নির্মাণ, আসবাব তৈজসপত্র, পোশাক-

পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি হতে সংগৃহীত এই সকল উপাদান লোকসঙ্গীত তৈরির বা কথা সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে।

Z_¨wb‡'k

১। হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪১।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৪। লোক সংস্কৃতি, অনিমেষকান্তি পাল, বিকাশ সাধুখাঁ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

evsjv‡'‡ki †jvKms¯wZ‡Z fwUqvjx Mv‡bi ¯vb

বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশকে জানতে হলে এর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যতটা জানা সম্ভব অন্য কোন মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। প্রাচীন কাল হতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বাঙালির সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো এর সঙ্গীত। বাঙালির ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি এখানকার সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি সাংস্কৃতির প্রাণ'ই হলো এর সঙ্গীত। এটাও বলা যায় যে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে এর সঙ্গীতরীতির উপর নির্ভর করেই। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনও সঙ্গীত রসে সিক্ত হয়েছে। বাঙালির সকল ধরনের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে তার শেষ পর্যন্ত প্রায় সবখানেই সঙ্গীতের আধিক্য দেখা যায়। এখানকার প্রধানতম কবিগণও সঙ্গীতকার হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবিগণ প্রথমত গীতিকার তারপর সাহিত্যিক। সুতরাং সঙ্গীত যে বাঙালির মজ্জাগত এবং চেতনারাজ্যে সঙ্গীতের যে রাজকীয় আধিপত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় সকল ধরনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের ব্যবহার থাকার ফলে একে বাদ দিয়ে কোন অনুষ্ঠানকেই আর সার্থক মনে হয় না। যে ধরনের গীতরসে বাঙালি হৃদয় সবচেয়ে বেশি নেচে উঠে তার মধ্যে লোকসঙ্গীত অন্যতম। লোকসঙ্গীত এখানকার সকল মানুষের তৈরি। কোন ব্যক্তি বিশেষ কখনো এ গান রচনা করলেও পরবর্তীতে তা সমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠে। বাংলার সমৃদ্ধতম সঙ্গীতকলা লোকসঙ্গীত। গ্রামের সহজ-সরল নিরক্ষর কবিদের রচিত গানেই যথার্থ ও সার্থক বাঙালি মানসের পরিচয় বের হয়ে এসেছে। লোকগান রচয়িতাদের বেশিরভাগেরই বসবাস এখনো পর্যন্ত গ্রামে, ফলে গানের মধ্যে খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মনের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধি-অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। লোকধাঁধা, লোকছড়া, লোকপ্রবাদ ইত্যাদি এই সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে এখানকার লোকসঙ্গীত এত বেশি সমৃদ্ধ। মানুষের গর্ভবাস হতে শুরু করে এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে লোকসঙ্গীত লেখা হয়নি। এর বাইরে মানুষ তার কর্ম সম্পাদনের জন্যেও সঙ্গীত রচনা করেছে। লোকমানস হতে সৃষ্ট এ সুরে এত বেশি মাদকতা যে, একবার তা কোনভাবে মানুষের কানে পৌঁছালেই তার স্মৃতিতে গেঁথে যায়। কথার সাথে সাথে সুরের আবেদন লোকসঙ্গীত ধারাকে সমৃদ্ধতর করে রেখেছে। একই সাথে নানা ধরনের লোকগীতির বিকাশ ও প্রকাশ লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে করেছে বৈচিত্র্যময়। ভাটিয়ালী গীতরীতি এদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী ধারা হিসেবে পরিচিত।

মার্গসঙ্গীতের মতো অলঙ্করণ এর সুরের মধ্যে না থাকলেও এর সহজ-সরল কথার আবেদন ও তাল-লয়ের নিখুঁত চাতুর্য সঙ্গীত হিসেবে এর কদর অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ গায়কগণ তাঁদের সৃষ্ট সুরগুলোতে সাধ্যমত কথার ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। তবে স্থায়ীত্ব ও মান বিচারে নগরে বসে সৃষ্ট সঙ্গীতের চেয়ে গ্রামীণ সঙ্গীত অনেকটা এগিয়ে আছে। যদিও শহরের সঙ্গীতকে চেষ্টা করে আয়ত্তে আনার একটি বিষয় থাকে, সে ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের বেলায় তার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেবলমাত্র প্রাণের গভীর আবেগই লোকসঙ্গীতের একমাত্র সম্বল যা নাগরিক ঐশ্বর্যের চেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে লোকমানসে স্থান করে নিয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত প্রধানত অন্তর্মুখী, সঙ্গীতের সাধনা সেখানে আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভের সহায়ক। বাংলাদেশে এই বিশেষত্ব আরো বেশি করে ধরা পড়ে তার ধর্মপ্রবণতার কারণে। পার্থিব জীবনের জ্বরামৃত্যু অতিক্রম করে নির্বাণ লাভের বাসনা প্রতিটি মানুষের। বাঙালি জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-বেদনার মধ্যদিয়ে সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ওইসব গানে অভিব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাহ্যত আদিরসাত্মক রচনা হলেও মূলে আছে ঈশ্বর বা আরাধ্য কৃষ্ণ ও ভক্ত শ্রীরাধার প্রেমব্যাকুলতা। নামের মধ্যেই 'কীর্তন' শব্দটি যুক্ত হয়েছে যা মাহাত্মবর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানেও রাগ, তালের নির্দেশ ছিল। এই কাব্যটিকে বলা হতো 'নাটগীতি পাঞ্চালিকা'। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব প্রেমগীতি। এই মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর ভাবসৌন্দর্য, প্রকাশভঙ্গী, উপমা-অলংকার মিলেমিশে কাব্য ও সঙ্গীতের এক অনুপম যুগলমিলন তৈরি করেছে। কাব্য ও সঙ্গীতের এই মিলন পরবর্তীকালের বাংলা গানেরও বিশিষ্টতা। মঙ্গলকাব্যগুলিও দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন। সঙ্গীত উচ্চমার্গ থেকে ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছুল। ভয়ে ভক্তিতে প্রচণ্ড রাগি বিভিন্ন দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন করতেই হয়েছে নিরাপত্তাহীন মানুষদের দৈবকৃপা লাভের আশায়।[১]

সঙ্গীত শুধুমাত্র মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়। সমাজের মানুষের মধ্যে শুদ্ধ আচার সম্পর্কিত জ্ঞানের বিকাশ ও এর প্রচারে সঙ্গীতের বড় ভূমিকা রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও কোথাও কোথাও সঙ্গীতকে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই দুইয়ের বিবর্তন হয়েছে পরস্পরের গলা ধরাধরি করেই। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও পরিবর্তন হয়েছে। বৈদিক যুগে সঙ্গীত চর্চা ছিল মূলতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধ যুগে তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজাল কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে উচ্চবর্ণের হাত থেকে শাসনবিধি ক্রমশ সাধারণ মানুষের নাগালে এলো। ফলে সেকালের সাংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ গড়ে উঠলো। বৈদিক যুগে ছিল সামগান, বৌদ্ধ যুগে সঙ্গীতে দেশজ সুরের মিশ্রণ ঘটলো, গুপ্ত যুগে তা আরো বিস্তৃত হলো। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসকদলের পরিবর্তন ঘটেছে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে। মোঘল যুগে মুসলমানি গীতধারার প্রকাশ ঘটলো খেয়াল-ঠুংরীর মধ্য দিয়ে, গজল গানে হলো প্রেমগীতির সূচনা। কিন্তু এসব গানই রাজদরবার কেন্দ্রিক। মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ কোন কিছুর আয়ুষ্কালই

দীর্ঘ হয়না অথবা সাধারণ মানুষের আত্মপ্রকাশের বাসনা থেকে পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে ভিন্নতর সাঙ্গীতিক জগত।[২] আমাদের লোকসঙ্গীতের ধারাগুলো একান্ত আমাদের জীবনবোধের মতো করে গড়ে উঠেছে। এখানে জনপ্রিয় কোন সঙ্গীতরীতির প্রভাব তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ভারতীয় সঙ্গীত কেবলই ভাববিলাসের সামগ্রী নয়, অধ্যাত্ম সাধনারই তা পরিপূর্ণ প্রতীক। বাঙালি জাতির ধর্ম মনস্কতাই এখানকার সঙ্গীতকে এমন সাধনার বস্তুতে পরিণত করেছে।

ভাষার দিক থেকে বাংলা ভাষার সীমানা- পূর্বে কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দরং কাছাড় ত্রিপুরা বা পার্বত্য চট্টগ্রাম। পশ্চিমে পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমানা বা এলাকার মধ্যে যে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষীরা বসবাস করেন তা নয় বরং অনেক জায়গায় অন্য বা প্রচলিত অন্য ভাষার সংখ্যাধিক্যও লক্ষ্য করা যায়। তবে মোটামুটি ভাবে এ এলাকার মানুষের ভাষারীতির ভিত্তি রচিত হয়েছে বাংলা ভাষার উপর নির্ভর করেই। যার কারণে এসকল এলাকার মানুষের প্রচলিত সংস্কৃতির মধ্যেও বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাঙালির ভৌগোলিক সীমানার চেয়ে এর ভাষারীতিই গোটা বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে একটি ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছে। বাংলা যার মাতৃভাষা তাকেই বাঙালি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে যেসব অভ্যাস, বিশ্বাস এবং ভালোলাগা জড়িয়ে থাকে তার প্রায় সব কিছুর সমন্বয়েই বাঙালির সংস্কৃতি। বর্তমান সময়ে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে দুটি স্পষ্ট ধারা দেখা দিয়েছে। একটি উচ্চতর বাঙালি সংস্কৃতি অন্যটি নিম্নতর বা লোকসংস্কৃতি। যে সকল এলাকায় কৃষির পরিবর্তে শিল্প কিংবা বাণিজ্যের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বেশি সে সব এলাকাতে উচ্চতর বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যন্ত্র চালিত উৎপাদনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। একে শিষ্ট সংস্কৃতিও বলা হয়।

জাতি হিসেবে বাঙালিকে মিশ্র বলা হলেও এখানকার মানুষের হাজার বছরের সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শনে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমানে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর ভারতীয় আর্য ভাষাভাষীদের থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে বড় একটা গোষ্ঠী এসেছে অষ্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর কোন কোন ভাষারীতি থেকে। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কোন অংশ এসেছে তিব্বতী, বর্মী ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে। এসব ভাষা গোষ্ঠীর লোক এখনও সেসব এলাকায় বসবাস করে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ত্রিকোণাকৃতি ভূ-ভাগের পশ্চিম দিকটি অষ্ট্রিক ভাষীদের, পূর্ব দিকটি তিব্বতী-বর্মী ভাষীদের এবং মধ্য অঞ্চলটি প্রকৃতই বাংলা ভাষাভাষীদের প্রভাবের ক্ষেত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব-দ্বীপের লোকেরা বহির্বিশ্বের সাথে স্থল ও জলপথে খুবই ভাল

যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। এদিক থেকে প্রথম সারির জায়গা দখল করে আছে ভাগীরথী মোহনার তাম্রলিপ্ত বন্দর। তাম্রলিপ্তের প্রাধান্য কিছুটা শেষ হয়ে এলে বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠে হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম। অন্যদিকে মেঘনার মোহনা ছাড়িয়ে কর্ণফুলির মোহনায় মধ্যযুগ থেকেই বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই বন্দর দিয়ে যেমন বাইরের অঞ্চল থেকে এখানে ভোগ্য পণ্য এসেছে তেমনি এই নদীর জল-স্রোতের মাধ্যমে বঙ্গভূমে পড়েছে পলি মাটির প্রলেপ। বাঙালি সংস্কৃতি তার ভূমির মতো বহু উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তিল তিল করে এর ভিত্তি নির্মাণ করেছে। ভাষা ও সাহিত্যের উপকরণের মতো সংস্কৃতি ও রীতি-আচার সংগ্রহের ফলে এখানে মোটমুটি ভাবে উপভাষার চলন তৈরি হয়। ক. কামরূপী, খ. মধ্যবাংলা (বাঙালি), গ. বরেন্দ্রী, ঘ. রাঢ়ী, ঙ. ঝাড়খণ্ডী। বাংলা লোকসঙ্গীতের সাথে সাধু ভাষার কোন যোগ নেই, যোগ আছে কেবল আঞ্চলিক ও উপভাষার সাথে। তবে বাঙালির ভাষারীতির মধ্যে বড় ধরনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ অঞ্চলের মানুষেরা তাদের ভাষারীতিতে বেশ অভ্যস্ত এবং একে অপরের ভাষা খুব সহজেই বুঝতে পারেন।

বাঙালির ভাষার মতো একই সাথে দুই ধরনের সাংস্কৃতিক রূপ এখানে গড়ে উঠেছে। একটি হলো- বস্তুগত অন্যটি আত্মিক। বাঙালির প্রধান খাদ্য হলো ভাত, সঙ্গে তরকারী, ডাল, মাছ ইত্যাদি। এছাড়া চিড়ে, মুড়ি, খই, বাতাসা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়েস ও নানা রকমের পিঠা, মিষ্টান্ন তৈরি করা বাঙালি জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত। চার চালা, আট চালা, কখনো ষোল চালা টিনের অথবা মাটির ঘর বেঁধে মানুষ বসবাস করে। বাড়ির চারিদিকে ঘেরা কিংবা পাঁচিল নির্মাণ করা পশ্চিমাংশের বাঙালি সমাজে বেশ সমাদৃত। সমাজ ও পরিবারে তৈজষপত্রের ব্যবহার বাঙালি সমাজে কিছু বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। খোঁদাই করা কাঠের পালঙ্ক, দড়ি, শিকে, নকশীকাঁথা ইত্যাদি এখানকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোক উপাদান। ভোজন পাত্র হিসেবে যেমন পিতল, কাঁসা, থালা, বাটি প্রচলিত তেমনি কলাপাতা, পদ্মপাতা, শালপাতার ব্যবহারও কম নয়। এখানকার পাট ও পাট জাতীয় পণ্য, রেশম, তাঁত, শঙ্খ, বেত, বাঁশ, পাতা, ঘাস, মসলা, ধান, চাল ইত্যাদি বাঙালির অন্যতম শিল্প হিসেবে পরিচিত।

বাঙালির আত্মিক সংস্কৃতি বা spiritual culture কে এর প্রধান পরিচয় হিসেবে ধরা হয়। সাহিত্য, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে এই উপাদানের প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। বাঙালির লিখিত যে শিষ্ট সাহিত্য, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য তার আসল ভিত্তি এই লোকসঙ্গীতের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে প্রচলিত গীতি ও নৃত্যের গভীরে গেলে দেখতে পাওয়া যায় বাঙালির আদি সৃষ্টি রসের রূপ-রীতি। বাংলার রাগাশ্রয়ী

গান, পঞ্চ-গীতিকবির গান যেমন সঙ্গীত পিপাসু ও রসিক জনের মন আকৃষ্ট করেছে, তেমনিভাবে পদাবলী কীর্তনের রীতি ও বাংলার সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে আছে হাজার বছর ধরে। এখানকার লিখিত সাহিত্যের বয়সও প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্যময়। লোকসাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য বাংলার লিখিত সাহিত্যকে সর্বদাই পুষ্ট করেছে। এর সাক্ষ্য যেমন পাওয়া যাবে রবীন্দ্র রচনায় তেমনি পাওয়া যাবে সত্যজিৎ রায় নির্মিত চলচ্চিত্রেও। বাংলার লোকসাহিত্যের এবং লোকসঙ্গীতের দেশ-কাল অতিক্রমী ক্ষমতা কত প্রবল সেটা জানা গেছে বহুবার বহুরকমের ঘটনা থেকে। বাঙালির ধর্মচিন্তা বাঙালি সংস্কৃতির আর এক বড় বৈশিষ্ট্য। এই ধর্ম চিন্তার মূলও রয়েছে বাঙালির লৌকিক ধর্মের মধ্যেই। চর্যাগানের পদকর্তারা যেমন মানুষের কথাই বড় করে বলেছেন। নানা তত্ত্ব-চিন্তার মধ্যেও তেমনি চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনেও মানুষই পেয়েছে মর্যাদার আসন। বাংলার লোকসংস্কৃতি যে ধর্ম ভাবনার জন্ম দিয়েছে তার উদার, পরমত সহিষ্ণু, সমন্বয়কামী চরিত্রটি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে দূরে থাকতে বাঙালিকে সাহায্য করেছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এ এক অতি উজ্জল উত্তরাধিকার।[৩]

ভাটিয়ালী গানের বাণীতেও তেমনি ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষকে তার অবস্থানে রেখে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব ভাব-ধারাশ্রয়ী কোন কোন ভাটিয়ালী গানে কবি মানুষকে দেবতার সাথে তুলনা করেছেন। আবার কোথাও মর্তলোকের শোকের কথা দেবলোকের বাসিন্দাদেরকে শুনিয়েছেন। বাংলার প্রাচীন যুগে এখানকার মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল বাঙালি হিসেবে। পরবর্তীতে সেখানে নানা ধর্মের প্রভাব পড়ে কিংবা বাঙালির মূল ভিত্তিতে জাতি-ধর্মের ছেদ পড়ে। কিন্তু যে সংস্কৃতিকে সে হাজার বছর ধরে লালন করেছে তার চর্চায় কোন ধরনের বাঁধা পড়েনি। ভাটিয়ালীতেও সেই মানসিকতার ছোঁয়া স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন আছেন বৈষ্ণব বাঙালি, তেমনি আছেন শাক্ত বাঙালি, এমনকি নাস্তিক বাঙালি। আরো আছেন মুসলমান বাঙালি, খ্রীষ্টান বাঙালি। সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাই খুব সহজ করেই বলতে পেরেছিলেন কথাটা- যত মত, তত পথ। মনে হয় বাঙালির লৌকিক ধর্ম ভাবনার গভীর থেকেই উদ্ভুত হয়েছে এই প্রজ্ঞোক্তিটি। বাঙালি মুসলমান সাধুজন, পীর, ফকির লৌকিক ধর্ম ভাবনায় কত সহজে পেয়েছেন শ্রদ্ধা এবং ভক্তির আসন। লৌকিক ধর্মে বনবিবি, বড় খাঁ গাজি, সত্যপীরই কেবল নন বহু পীর-ফকিরের দরগাহ বাংলাদেশের গ্রামান্তরেও লোক সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।[৪]

বাংলা ভাষার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেখা যায় তাকে বলা যায়- unity in diversity বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কবির ভাষায়- 'কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা'। এ জাতির যত বড় ধরনের অর্জন রয়েছে তা এর ভাষা সমন্বয়ের কারণেই সম্ভব হয়েছে। বিশাল বাংলার প্রায় সবটাই নদী বিধৌত হওয়ার কারণে এখানকার সংস্কৃতি একই আদর্শিক স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মকর বা পৌষ সংক্রান্তি হচ্ছে পৌষ মাসের শেষ দিন এবং তা টুসু পরবেরও দিন। উচ্চ বর্ণের মানুষের ঘরে কদাচিৎ টুসু পুজো হয়ে থাকে, কিন্তু ডুলুং, সুবর্ণরেখা এবং কংসাবতী

অববাহিকায় অন্য সকলের ঘরে টুসু পরব মানা হয়। তখন মেয়েরা দলবদ্ধভাবে টুসু গান করে। কার্তিক মাসে গো-মহিষের বন্দনার পরব হচ্ছে 'বাঁদনা'। বাঁদনা পরবেরও আলাদা গান আছে। সেগুলি পুরুষেরাই প্রধানত গেয়ে থাকে। টুসু আর বাঁদনা পরব সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রাণের উৎসব। আবার ঐ মকর সংক্রান্তিতেই পূর্ব মেদেনীপুরে মৎস্যজীবী কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ে গঙ্গাপুজোর সাড়া পড়ে, যা পশ্চিম মেদেনীপুরে দেখা যায় না। দক্ষিণে রামনগর অঞ্চলে গঙ্গাদেবী নয়, মকরীদেবীর পূজা হয়। এই মকরীদেবীর কাছে মেয়েরা প্রার্থনা জানিয়ে গান করে। তবে মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে নদী বা জলাশয়ে পূণ্য স্নান ও নববস্ত্র পরিধানের রীতি দেখা যায় গোটা সীমান্ত বাংলায়। অন্যদিকে মহালয়ায় স্নান তর্পণ ইত্যাদি কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তারা কোন রকমের গানই করেন না। গঙ্গা-ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ইতুপুজো হয় অগ্রহায়ণ মাসে। পঞ্চশস্যের বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের পর ঘটশুদ্ধ সেগুলো গঙ্গায় বিসর্জিত হয়। অন্যদিকে মেদেনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার সীমান্ত অঞ্চলেও এ ধরনের উৎসব হয়ে থাকে।

নদী তীরবর্তী কিংবা নদী অববাহিকায় বসবাসের ফলে এ এলাকার গানে ভাটিয়ালীর প্রভাব খুব সহজেই এসেছে। তাছাড়া বাংলার ভাটি অঞ্চলের সাথে এ সকল এলাকার মানুষের ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান অনেক দিনের। সাঙ্গীতিক দিক থেকে ভাটিয়ালী গান কোন কোন গীতরীতির মধ্যে স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছে। বাউল সংস্কৃতির মধ্যে দুটি ধারার গান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একটি ভাটিয়ালী ঢংয়ের মধ্যদিয়ে বাংলার লালন ফকিরের গানে প্রকাশিত, অন্যটি বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারিত। লালনের সমসাময়িক কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথের গানে অন্য রূপটি বিকশিত হয়েছে। একে ফিকিরচাঁদী বাউল গানও বলা হয়। এ গানের প্রার্থনামূলক রূপ বাউলের গানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ছিল কেবলমাত্র খোল ও খঞ্জনি। বাংলা লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয় যত গীতধারা তার বেশিরভাগই ভাটিয়ালী সুর অথবা কথা প্রভাবিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির ভিত্তি ও উপাদান সম্পর্কে বর্ণনায় দেখা যায়, গীত রসের উপর নির্ভরশীল সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মসমূহ বাংলার লোকমানসে একটি স্থায়ী ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

Z_¨wb‡'k

১। বাংলা গানের আঙিনায়, যূথিকা বসু, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা- ২০০৪, পৃ. ২০।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩। লোক সংস্কৃতি, আনিমেষকান্তি পাল, বিকাশ সাধুখাঁ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৭।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

PZ_ Aa¨vq

evOwji Ava¨wZ¥K †PZbv I fwUqvjx Mvb

বাঙালির অধ্যাত্ম সাধনার ধারাবাহিকতায় এদেশের সাধকগণ বরাবরই মানুষের জীবনলীলার করণ ও কারণ অনুসন্ধান করে চলেছেন। জীবাত্মা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানে কখনও কখনও তাঁরা সাধুগুরুর কাছেও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীত সাধনার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি লাভের বিষয়টি এখানকার মানুষের কাছে ধর্মীয় দিকদিয়েও অনেকটা প্রমাণিত। প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীতের যে ধারা ও হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের যে রীতি তার বলয় থেকে বের হয়ে এসে লোকসাধনার দিকদিয়ে ভাটিয়ালী গানের কথা ও সুর এদেশে একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তাধারা নির্মাণ করেছে। গান রচনায় দার্শন চেতনার বিষয়টি কতটুকু প্রেরনা যুগিছেছিল তা জানা না গেলেও, ভাবের বিষয়টি মানুষের কাছে বেশ স্পষ্ট। রাগসঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে বলা যায় ‘রাগ ভাটিয়ালী’। লোকসঙ্গীতের ভাষায় বিচ্ছেদী। ড. করুণাময় গোস্বামী ‘প্রসঙ্গ বাংলা গান’ গ্রন্থে ভাটিয়ালী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- নদীমাতৃক পূর্ব বাংলাই ভাটিয়ালীর জন্মস্থান। কেবলমাত্র যে নদীর সঙ্গেই ভাটিয়ালীর সম্পর্ক তাহাই নহে, বিশাল প্রান্তরের দিগন্ত প্রসারিত বিস্তার, তাহার উপর দিয়ে অলস মন্থর গতির পদযাত্রা, প্রকৃতির মধ্যে উদাসী বিষণ্ন বৈরাগ্যের রূপ- ইহারা ভাটিয়ালী গানের মূল প্রেরণা দান করিয়া থাকে। দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের বুকের উপর দিয়ে অলস মন্থর গতিতে চলা ভাসমান নৌকার হাল ধরিয়া থাকিয়া যখন মাঝি দেহে ও মনে একটু অবসরের সুযোগ পায়, তখন ভাটিয়ালীর সুর তাহার কণ্ঠে আপনি জাগিয়া উঠে।[1] ভাটিয়ালী গানের ধারাটি প্রাচীন হওয়ার ফলে এ গানের সুরে প্রভাবিত হয়ে আরো অনেক ধরনের লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে। বাংলার অধিকাংশ অধ্যাত্মভাব প্রকাশমূলক গীতরীতিই ভাটিয়ালী সুরকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। পূর্ববাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদা, প্রভৃতি বহু তত্ত্বমূলক সঙ্গীতই ভাটিয়ালীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[2]

ভাটিয়ালীর প্রধান বিষয় হলো প্রেম। তরুণ গায়কের কাছে তা তার ব্যক্তিগত প্রণয় বা জীবনের আশা-নিরাশার বিষয় কেন্দ্রিকও হতে পারে। একজন পরিণত বয়সের গায়কের কাছে এটি আধ্যাত্মিক আশা নৈরাশ্যের সুর হিসেবে ধ্বনিত হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ভাটিয়ালী গানের সুর গায়কের অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে। সে দিক থেকে বিচার করলে ভাটিয়ালী গানের যে সম্মোহনী ক্ষমতা তা শুধুমাত্র বাঙালির নিত্যদিনের নদীবাহিত চলার পথকে সুগম করেনি, সাথে সাথে নদী তীরবর্তী জনমানুষের দেহতরীতে চেপে মানবাত্মার ভবনদী পারাপারের পথকেও করেছে সুগম ও সহজতর। গানের মাধ্যমে এসেছে অনেক নিগুঢ় তত্ত্বের সহজ সমাধান। ভাটিয়ালীকে বলা হয় নিম্নভূমির গান। বাংলাদেশ নদী-বিধৌত অঞ্চল হওয়ার ফলে

প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম আসলে এদেশের মানুষের হাতে জুটে যায় অফুরন্ত অলস সময়। আর সে সময়ে ভাবপ্রবণ বাঙালি হৃদয় হয়ে উঠে আরো বেশি আবেগপ্রবণ, যার নিদর্শন এদেশের লোককবির রচনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এদেশের আদিম সমাজেও লোকসঙ্গীতের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন আচার উৎসব পালন ও কর্মপ্রেরণার সহায়ক হিসেবে আদিম কাল হতেই মানব সমাজে লোকসঙ্গীতের চর্চা হয়ে আসছে। মানুষ যখন থেকে ভাবতে শুরু করেছে তার জন্ম, মৃত্যু, দিন শেষে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসা এবং ভোর বেলা পুনরায় সূর্যের আলো ফোটা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, মহামারি, বন্যা, খরা, কোন উন্নত মানব সভ্যতার ধ্বংস ইত্যাদি তখন থেকেই তার দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত। প্রকৃতির এ ধরনের পরিবর্তন এবং নানা ধরনের সামাজিক পীড়নে আতঙ্কিত হয়ে মানুষ এক সময় প্রকৃতির কাছে আশ্রয়ের সন্ধান করেছে। ফলে প্রকৃতি কিংবা দেব-দেবীকে তুষ্ট করার জন্য রচিত হয়েছে নানা ধরনের মঙ্গলগীত। সামাজিক বা সমষ্টির প্রয়োজনে বা তাদের বিপদ মুক্তির লক্ষ্যে রচনা করার ফলে এর মধ্যে খুব সহজেই আধ্যাত্মিক ভক্তিভাবের সংযোগ ঘটেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন ভাটিয়ালী শুধুমাত্র ভাটি অঞ্চলের গান নয়। এটি মানব মনের একটি বিশেষ ভাবাবেগ বা অনুভূতি। এখানে ভাটি বলতে মানব জীবনের একটি বিশেষ বয়সের বা সময়ের কথা বলা হয়েছে। যখন মানুষের মনে জগৎ, জীবন, সংসার সম্পর্কে নানা ধরনের আত্মোপলব্ধি ঘটে। যার ফলে মানুষ তখন তার চার পাশের জাগতিক সকল কিছুকে ফেলে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের আশায় পথ খুঁজতে থাকে। জগৎ জীবনে একজন মানুষের যে ভোগ-বিলাসের মোহ এ সময়ে তা দূরীভূত হয়। মানুষ হয়ে পড়ে অনুসন্ধানী, প্রকৃতিমুখী। জগৎ জীবন ত্যাগ করে একজন মানুষের আবার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার বাসনাকে অনেকে ভাটির টানে নদীর পানির সমুদ্রে গিয়ে মিশে যাওয়ার রীতির সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ যেখান থেকে তার আসা আবার সেখানেই ফিরে যাওয়ার মত বিষয়ের সাথে মিল খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই ধরনের গানকে আত্মমুখী, ভাটিমুখী বা ভাটিয়ালী গান বলা হয়।

জোয়ারের টানে মানব দেহরূপী একটি নৌকায় চড়ে ভবসাগরে মানুষের আগমন, আবার সময় শেষ হলেই নৌকা ছেড়ে মানুষ (আত্মা) নিজ বাড়ি ফিরে যাবে। ভাটিয়ালী গানের কথায় এ ধরনের বিষয়াবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রাচীন ধারার যে সকল সৃষ্টিকর্ম বা গীতরীতি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রায় সকল ধারাতেই ভাটিয়ারী রাগ বা ভাটিয়ালী সুরের কিংবা কথার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী গানের শুরুর দিকটা কিছুটা উচ্চস্বরে গীত হয় এবং ধীরে ধীরে গানের সুর একেবারেই নীচের স্বরে নেমে আসে। এর কারণ হিসেবে শিল্পীর গায়কির চেয়ে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটি বা বিশেষ

উপলব্ধির বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে করা হয়। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে শতভাগ সঁপে দেওয়ার আগে যেমন একজন মানুষের মধ্যে নিজেকে নিয়ে বড়াই করার মত বিষয়গুলোর উপস্থিতি থাকে, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত উপলব্ধি মনে আসার পর একজন মানুষ তার নিজের জীবনের সর্বস্ব সৃষ্টিকর্তার পায়ে নিবেদন করতে দ্বিধাবোধ করেন না। ধারা সৃষ্টির প্রথমদিকে ভাটিয়ালী গানের মধ্যে তত্ত্বকথার প্রভাব বলতে তেমন একটা কিছু ছিল না। বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় গীতরীতির তত্ত্বকথা বিশেষ করে বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, কবিগান ইত্যাদি গীতধারা থেকে তত্ত্বকথা একসময় ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো অন্য গীতরীতিগুলো কি ভাটিয়ালী প্রভাবিত? নাকি ভাটিয়ালীই অন্যান্য গীতরীতি দ্বারা প্রভাবিত? সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালী সম্পর্কে বলেছেন- 'ইহার মধ্যদিয়া সমগ্র বাংলার লোকসঙ্গীতের কতকগুলি মৌলিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে জন্য এ কথাও মনে হইতে পারে যে বাংলার অধিকাংশ অনুরূপ ভাবমূলক লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালীর ভিত্তির উপরই রচিত হইয়াছে। এমনও মনে হইতে পারে যে, বাংলার লোকসঙ্গীতের একাংশের ভিত্তিই ভাটিয়ালী। ইহার উপর আশ্রয় করিয়া বাংলার বহু আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত আনুপূর্বিক রচিত হইয়াছে'।

ভাটিয়ালী গানকে এভাবে বিবেচনা করা একটি উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। ভাটিয়ালীকে কেউ কেউ একক অনুভূতির গান বলেছেন। মানবিক অভিব্যক্তির সাথে আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত হয়ে এর প্রকাশভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাউল, গুরুবাদী, মনঃশিক্ষা, দেহতত্ত্ব, মারফতি, ফকিরালী, মুর্শিদি, বৈরাগ্যমূলক ইসলামী, সংস্কারমূলক বা সংস্কার বিরোধী গানে ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার দেখা যায়। এ গানের গতি-প্রকৃতি, গায়নরীতি ও বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে তত্ত্বভিত্তিক ভাটিয়ালী গানকে নিম্নলিখিত আটটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এখানে আধ্যাত্মিক চেতনার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ভাটিয়ালী গানকে নিম্ন বর্ণিত শ্রেণিবিন্যাসে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

১. আত্মতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান।

২. বৈষ্ণবপন্থী তত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান।

৩. বিচ্ছেদী ভাবমূলক ভাটিয়ালী গান।

৪. মনঃশিক্ষামূলক ভাটিয়ালী গান।

৫. দেহতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান।

৬. লোকপ্রেমমূলক ভাটিয়ালী গান।

৭. গুরুতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান।

৮. মুর্শিদতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান।

1. আত্মতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান

আমার জনম গেল বিনা সাধনে

সারা জীবনের ভুল ওরে আমার পড়েছে মনে।

এখন কি করিতে কি করি হায় রে

ওরে দিন গেল মনের ভ্রমে।।

সময় থাকতে পথে গেলে রে যেতাম বহু দূর

মায়ার বশে বশী হইয়ারে হারালাম এ কূল

আমার একূল ওকূল দুকূল গেল রে

পড়ে কাম নদীর ওই তুফানে।।

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো আমি ছাড়ি দুখের হাই

কোন মহতের ধরি সঙ্গ ভাণ্ড পূর্ণ করি তাই

আমি ভেবে দেখি আর বেলা নাই রে

আমায় বেঁধে নেবে কাল সমনে।।

বিজয় কাঁন্দে বেলা শেষে ভব নদীর কূলে

দয়া করে দয়াল গুরু আমায় লওগো তুলে

জানায় আমার এই শেষ মিনতি রে

ওরে বান্ধব স্থান দিও ঐ চরণে।।

রচনা ও সুর ঃ কবিয়াল বিজয় সরকার

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের রচিত এ সকল লোকগীতি চর্চার মধ্যদিয়ে চিরন্তন বাঙালি লোকমানসের পরিচয় বের হয়ে এসেছে। এ গান রচনার পিছনে কোন বড় ধরনের অধ্যাত্ম সাধনার বিষয় যুক্ত না থাকলেও গীত হওয়ার পর তা জনসাধারণের সাধনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লোকগানের এমন সৃষ্টিরীতি সম্পর্কে গবেষক আবদুল ওয়াহাব বলেন- আমজনতার যে কোন মননশীল বা সংবেদনশীল ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগণ অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই এ ধরনের গান রচনা করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সরলতা ও অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়। সহজ ভাষা, আঞ্চলিক পরিভাষা, আঞ্চলিক উচ্চারণ, সহজ-সরল সুরের স্বতঃস্ফূর্ততা লোকগীতির প্রাণধর্ম। সহজ কথা ও সরল সুরের সম্মিলনেই হৃদয়গ্রাহী আবেদন সৃষ্টি হয়। লোকগীতির সুরের আবেদন সার্বজনীন হলেও সেই সুরে আঞ্চলিক ছাপ বিদ্যমান, এরই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাহাড়-পর্বত, নদী, হাওর-বিল, সবুজ বনাঞ্চল, কাশফুল, ঘাসফুল, সবুজ ও সোনালী ফসলের মাঠ, নৌকা ও গরু-মহিষের গাড়ি, প্রাকৃতজনের জীবন সংগ্রাম, গ্রামীণ সভ্যতার রূপক ব্যবহার লোকগীতির বিষয়বস্তু। লোকগীতির ভাবব্যঞ্জনায় থাকবে জনমানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের, ব্যথা-বেদনার, নিরাভরণ প্রকাশ, সহজ ও স্বাভাবিক-স্বভাবসিদ্ধ ছন্দের ব্যবহার। মানবিক প্রেমের বিরহ-মিলনজাত ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস লোকগীতির সুরে ও চরিত্রে যে রূপ ফুটে উঠে, তা ব্যক্তি চেতনার রঙে ততটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে সামাজিক রং।[3] লোকঐতিহ্য চর্চার ফলে এদেশের মানুষের কাছে কখনও কখনও তা ধর্মীয় বিষয়াবলীতে প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় রীতি-নীতি চর্চার সময় এদেশের মানুষ বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত এদেশের লোক ঐতিহ্যের কোন কোন উপাদান বা বিষয়াবলীকে খুব সচেতন ভাবেই চর্চা করে থাকে। এ কারণে এদেশের সঙ্গীতের উপাদানের সঙ্গে এখানকার মানুষের মনের ভাবনা বা দর্শন চেতনার বিষয়াবলী খুব সহজে ফুটে উঠেছে। তবে ধর্ম ও সমাজ কর্তৃক অর্পিত সংস্কার, আচার, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদিকে সব সময়ই এখানে ভালোভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এ ধরনের বিষয়ে জোর বিরোধিতা করা হয়েছে এমন উদাহরণ এদেশের লোকগীতৈতিহ্যের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। বাউল যেমন সকল ধর্ম-বর্ণের বাইরে বের হয়ে এসে নিজেকে জানবার জন্য, সন্ধান করবার জন্য, মনের মানুষের অনুসন্ধান করে চলেছে, এদেশের ভাটিয়ালী গানেও তেমনি ভব সাগরের মাঝে নৌকারূপী এ মানব দেহের সঠিক গন্তব্য জানার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের বড় অংশ জুড়েই আধ্যাত্মিক চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সেখানে কখনও কখনও পারিবারিক, সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাবও পড়েছে।

মন তোর মানব তরী বোঝাই ভারী

উজান পাড়ি চলে না রে।

পাছার মাঝি হয় যে জনা দেয় যন্ত্রণা

যুক্তি করে কয় জনারে।।

মাস্তুলে নাই জাঙ্গা টানা হাইল মানেনা

ছিড়া বাদাম হাওয়া নাইরে।

করে তুই লোভের আশা বুদ্ধিনাশা

দস্তা শীশা চিনলি নারে

রূপগঞ্জের বাজারে যাইয়া বেঁহুশ হইয়া

কিনলি কেবল সস্তা দরে।।

তিন ধারে ছুটেছে জল করে কলকল

গুণ ধরেছো পুবের পারে

পার থেকে লোকে হাসে কোন বা দেশে

গিয়া তরী ডুবে মরে।।

দয়ার নামের সারি গেয়ে ভাটি বেয়ে

উজানে যাও সাহস করে

জালালউদ্দিন ভেবে সারা নাই কিনারা

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে।।

কথা ও সুর ঃ শেখ জালালউদ্দিন খাঁ

বর্ষা মৌসুমে নদীবহুল পূর্ববাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌকার প্রয়োজন অপরিহার্য আর এখানকার গানের বিষয়বস্তুতে তা এসেছে অনুষঙ্গ রূপে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গানের কথায় নৌকার বিভিন্ন অংশের নামে চিহ্নিত হয়েছে। দেহকেন্দ্রিক বাউল সাধনার যে তত্ত্ব ভাটিয়ালীতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যুগ ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বৌদ্ধ, শৈব, সহজিয়া, সুফি ধারার সংযোগ গতানুগতিক জীবন ধারার নানা তত্ত্ব, অনুসঙ্গ ও তথ্যের সংযোজন ভাটিয়ালী গীতশৈলীকে সমৃদ্ধ করেছে। সমান্তরালে বিজ্ঞানের

উন্নতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভাটিয়ালী গানে মানব দেহের রূপক অর্থে ব্যবহৃত নৌকার স্থলে রেলগাড়ি, জাহাজ, ইঞ্জিন, হাওয়াই গাড়ি ইত্যাদি শব্দ বা শব্দ সমুহের সংযোগ ঘটেছে।

গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না

চড়িয়া মানব গাড়ি যাইতে ছিলাম বন্ধের বাড়ি

মধ্য পথে ঠেকলো গাড়ি উপায় বুদ্ধি মেলে না।

মহাজনে যত্ন করে পেট্রোল দিল ট্যাংকি ভরে

গাড়ি চালায় মন ড্রাইভারে ভাল মন্দ বুঝি না।

গাড়িতে প্যাসেঞ্জারে অযথা গণ্ডগোল করে

হিউম্যান কণ্ডাক্টরে কেউর কথা কেউ শোনে না।

পার্টস গুলা ক্ষয় হয়েছে ইঞ্জিনে ময়লা জমেছে

ডায়নামা বিকল হয়েছে লাইট গুলা ঠিক জ্বলে না।

ইঞ্জিনে ব্যাতিক্রম করে কণ্ডিশন ভাল নয়রে

কখন জানি ব্রেকফেল করে ঘটায় কোন দুর্ঘটনা।

আব্দুল করিম ভাবছে এবার কনডেম গাড়ি কি করবো আর

সামনে দেখি ঘোর অন্ধকার করতেছি তাই ভাবনা।

কথা ও সুর ঃ শাহ্ আব্দুল করিম

2. বৈষ্ণবপন্থী তত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান

প্রেমের মধ্যে বিরহ, মান, অভিমান সব রসেরই প্রকাশ। তবে বাঙালির কাছে এর সবচেয়ে মধুরতম সুন্দর উপাদান বেদনা। লোক দর্শন অনুসারে প্রেমের কারণেই সৃষ্টি জগতের উৎপত্তি এবং বিরহে এর প্রকাশ। একজন বিরহী আত্মার (মানুষের) মিলন পিয়াসি মন তার সৃষ্টি কর্মে রেখে যায় কাঙ্ক্ষিত বা আরাধ্য বস্তুকে না পাওয়ার ছাপ। বাংলা লোকসঙ্গীত রচনার প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করলে দেখা যায় এখানকার প্রাচীন ধারার লোকসঙ্গীতের প্রায় সকল রীতিই ভাটিয়ালী গানের সুর ও ভাব-রসে সিক্ত। গবেষকগণও এ ব্যাপারে এক মত যে, এ গানের প্রভাব পূর্ববঙ্গের সমগ্র গীতরীতির উপর প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। এ সম্পর্কে ড.

ওয়াকিল আহমদ বলেন- বড়ু চণ্ডীদাস পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ভাটিয়ালী গানের উৎস-ভূমি পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের মাঝিরা ব্যবসার উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গেছে। তাদের মাধ্যমে ভাটিয়ালী গান পশ্চিমবঙ্গে প্রচার লাভ করেছে। চৌদ্দ শতকে ভাটিয়ালী গান এখানে পরিচিত হয়ে উঠলে তারও আগে পূর্ববঙ্গে এ গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুখ্য বিষয়বস্তু। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক অনেক ভাটিয়ালী গান আছে। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ববঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি চৈতন্যদেবের পূর্বে জনপ্রিয় হয়নি। রাধকৃষ্ণের প্রেমলীলায় নৌকা-নদী-পারাপারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এজন্য পূর্ববঙ্গের মাঝির কণ্ঠে লৌকিক প্রেমের ভাটিয়ালী গান পশ্চিমবঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় সহজে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এ পদগুলো সবই রাধার উক্তি-বিশেষ। মিলনের আর্তি ও বিরহের বেদনা নিয়ে গানগুলো রচিত। প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণের আড়ালে সমাজের যুবক-যুবতীর প্রেম-কাতরতা ও বিরহ-যাতনা প্রকাশিত হয়েছে।[4]

জল উজান বাতাস উজান, হুস কইরা নাও বাইও রে

সামনে আছে সাধুর বাজার, কিছু কিইন্যা লইও রে

সদা আনন্দ রাইখো মনে।

হরি গুণাগুণ, রাধা গুণাগুণ, কৃষ্ণ গুণাগুণ গাওরে।

সদা আনন্দ রাইখো মনে।।

রাধা রাণীর প্রেম বাজারে, রসের দোকান খুইলাছে রে

কেহই বেচে কেহই কেনে, দর কইরা কেউ যায়রে।।

ভাইবে রাধারমণ বলে, আমার তরী ভাঙারে

জয় রাধার নামে বাদাম দিয়ে, ব্রজধামে চল রে।।

কথা ও সুর ঃ রাধারমণ দত্ত

প্রবাদ আছে 'কানু ছাড়া গীত নাই, রাধা ছাড়া সাধা নাই' বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের সকল শাখা সিক্ত করে এ ভাবরস বাংলার সাধারণ মানুষের মনেও নানা সময়ে সমানভাবে আলোড়ন তৈরি করেছিল। ফলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তা যেমন- গোবিন্দ দাস, নরোত্তম ঠাকুর, জ্ঞান দাস, লোচন দাস প্রভৃতি কবি ও সাধকের মাধ্যমে বৈষ্ণব ভাবরসের সাথে ভাটিয়ালী গানের সুর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি দস্যু ও পরাক্রান্ত রাজা পর্যন্তও একসময় বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রেমদীক্ষা গ্রহণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এর মতে- বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজা বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ফলে

দেশে স্থাপত্যশিল্প ও শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমগুলো বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতি-পাহাড়, এবং কুকী প্রভৃতি উলঙ্গ পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হইয়াছিল। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লার নিম্ন সমতলভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি। তাহারা স্ত্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে চৈতন্য-চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাহাদের বংশধরেরা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের সহায় ছিল বনবিষ্ণুপুর ও খেতুরির রাজভাণ্ডার। চৈতন্য দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পল্লিতে গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। খাস বাংলাদেশে যত গৌরাঙ্গবিগ্রহ তদপেক্ষা অনেক বেশি বিগ্রহ উড়িষ্যার পল্লিতে পল্লিতে পূজা পাইয়া থাকে। এই প্রচারের উদ্যমশীলতা শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারা সুরধুনীর তীরের কীর্তন সমস্ত বাংলা ও উড়িষ্যা দেশে প্রচলন করিয়াছেন।[5] অহিংস নীতির মনঃকথা এবং মানুষকে সত্য ও সুপথের সন্ধানদানে ভাটিয়ালী সুর যুক্ত হওয়ার পর তা এদেশের সর্বত্রই মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে ফিরেছে।

দয়াল গুরু রে আমায় চির কাঙ্গাল করে দে এ ধরায়

ওরে তোমার নাম লইলে নয়ন পথে

যেন প্রেম বন্যায় ভেসে যায়।।

যে কাঙ্গাল বেশে দেশে দেশে ওরে দয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়

তেমনি ভাবে নিত্য নিত্য যেন ভক্ত সঙ্গ পায়

আমি মান অভিমান তাজ্য করে গো

আমি প্রণাম জানায় ভক্তের পায়।।

দয়াল রে ওরে দয়াল

আমি ধনী হতে চাইনা দয়াল চাইনা কুল মান

কৃষ্ণ নামের মালা গাঁথিরে দিয়া মন প্রাণ রে

নিয়ে তিলক মালা আধলা ঝোলা গো

যেন বাস করি আমি গাছ তলায়।।

দয়াল রে ওরে দয়াল আমার

তুমি আবার যদি পাঠাও দয়াল আমায় এ ভব-সংসারে

একজন কৃষ্ণভক্ত মায়ের গর্ভে জনম দিও আমারে

আমি মুচি হলেও সুচি হব গো

আমার মন যদি কৃষ্ণ অনুরাগী হয়।।

পাগল বিজয় বলে বিষয় ছেড়ে

ওরে দয়াল কবে শুদ্ধ হবে মন

তিলক কেটে কপ্নি এটে যাব মধুর বৃন্দাবন

আমি ব্রজ গোপীর সঙ্গ নিয়া গো

আমি ব্রজ ধুলা মাখবো গায়।।

রচনা ও সুর ঃ কবিয়াল বিজয় সরকার

'রাধা রূপে সাধা' বাঙালির ভাটিয়ালী সুর মূলত রাধা-কৃষ্ণ বিরহের সুরে নিবদ্ধ। ঘাটের মাঝি মূলত 'কৃষ্ণ'। যিনি বা যার নৌকা চড়ে রাধিকার যমুনা পারাপার। এখানকার মানুষ মনে করে কৃষ্ণ নামে শ্রীরাধার ভক্তকূলেরও একই সাথে ভব পারাপার সম্ভব। মানব জনম ধারণ করে এই জীবাত্মা যখন পারের কাণ্ডারিকে (সৃষ্টিকর্তা) ভুলে অন্য পথে ধাবিত হয় তখন তার মানব জনমের উদ্দেশ্য বিফলে যেতে শুরু করে। কোন সৎ গুরুর সঙ্গ নিয়ে যখন সেই মানুষই তার মানব জন্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে, তখন তার কণ্ঠে অনুতাপ বা অনুশোচনার সুর ধ্বনিত হয়। সনাতন ধর্ম মতে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মানুষ মানব জনম লাভ করে। এমন মানব জনম পাওয়ার জন্য তাকে এত সংখ্যকবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। জীবাত্মার মুক্তির সবচেয়ে বড় সুযোগ মানব জনমকে সঠিক সাধনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে ভবনদী পার হয়ে যাওয়ার কথাই ভাটিয়ালী গানে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

এ জনমের ভালবাসা আমার ভাগ্যে নাই

পর জন্মে হে দরদি তোমায় যেন পাই

আশায় আশায় রইলাম আমি দেখা দিও শ্যাম কানাই।।

ভুল করিয়া এ জনমে পাইলাম না তোমায়, দরদি গো

হেলায় হেলায় দেখি আমার বেলা চলে যায়

সময় মত তোমায় আমি খুঁজি নাই।।

অসময়ে মনে পড়লো তোমারই কথা, দরদি গো

কেমন করে পাবো বল তোমারই দেখা

আমার আত্মার সনে নাই আত্মীয়তা, বসে শুধু ভাবি তাই।।

মনে চাইলে বিদায়ের আগে এসে দেখা দিও

ভবপারের পারঘাটাতে পার করিয়ে নিও দরদি, দরদি গো

অধম নারাণ বলে ও কানাই জান

তুমি বিনে বান্ধব নাইরে ভবপারের পারঘাটাতে

সেদিন তুমি ত্বরায়ে নিও, ঘাটের মাঝি তুমি হইও।।

কথা ও সুর ঃ কবিয়াল নারায়ণ চন্দ্র সরকার

3. বিচ্ছেদী ভাবমূলক ভাটিয়ালী গান

ভাটিয়ালী গানের যে বিচ্ছেদ তা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সব সময় সমষ্টির আবেগে রূপ লাভ করেছে। বৈরাগ্যভাব বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি বড় ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাটির টানে মাঝি যে গান করে তা তাৎক্ষণিক লেখা কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, এ গানের মাধ্যমে যে তারই মনের অনুভূতি প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় সকল ধর্ম মতেই সৃষ্টির সেরা জীব হল মানুষ। সুতরাং স্রষ্টার কাছে মানুষের সমাদর অনেক বেশি, কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর মানুষ তার পূর্ববর্তী অবস্থাকে ভুলে থাকার কারণে স্রষ্টার সাথে দুরত্ব তৈরি হয়। মানুষ যখন তার নিজের শেষ পরিণতি জানতে পারে, বুঝতে পারে যে স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার মত পুঁজি অর্থ্যাৎ পূণ্য তার সাথে নেই তখন সে স্রষ্টার কৃপা-পাওয়ার লক্ষ্যে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। তার গানের কথায় যুক্ত হয় বিরহ বা বিচ্ছেদের বোল। আরাধ্য বন্ধুর কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে মনের কথা বলতে না পারায় নদী ও নৌকাকে আশ্রয় করে সে মনের আবেদন প্রকাশ করে।

কই যাওরে, পদ্মার ঢেউ আমার কথা লইয়া যাওরে

আন্ধার রাইতে মাঝ দরিয়ায় বাইতে আছি নাওরে।।

আমি ঘর ফালাইয়া আইলাম চইলা ছাইড়া আইলাম কুল

মাঝি রে, ও মাঝি নাও বাইয়া গান গাইয়া যাও

মাঝি পাল উড়াইয়া যাওরে।

মনডা আমার থুইয়া আইলাম কোন পরানের ফুল রে।।

'পদ্মা নদীর মাঝি' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ভাটিয়ালী গান

একই ভূবনে বা একই সংসারে বসবাস করেও একজন মানুষকে অন্য মানুষ সম্পূর্ণভাবে জেনে উঠতে পারে না। আর যদি বিষয়টি হয় মানব মনের প্রেমাশ্রিত বা প্রেমঘটিত তাহলে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই এক সময় বিরহ বা বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বাউল মতবাদের মত ভাটিয়ালী গানে প্রেমাশ্রিত দর্শন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিচ্ছেদী সুরেই বাঙালির প্রেম তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও সম্পদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই নির্ভেজাল প্রেমানুভূতির মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব। এ প্রকার বিচ্ছেদী প্রেমকে কখনও ভাবের প্রেম আবার কখনও খোদাপ্রেম বলা হয়ে থাকে। ভাবের প্রেম হলো ক্ষণস্থায়ী, আর ঈশ্বর প্রেম হলো মানুষের দীর্ঘ দিনের সাধনার বিষয়। এটি মানুষকে জাগতিক লোভ, মোহ থেকে দূরে রাখে। এর প্রকাশ ঘটে অলৌকিক প্রেমানুভূতির মাধ্যমে। তবে ভাবের পিরিত খোদা পিরিতে পরিণতি পায়। যদি একজন সাধক তার সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভে সক্ষম না হয় তখন তার মধ্যে বিরহী, বাতুলতা, বিচ্ছেদীভাব জাগ্রত হয়। পরমাত্মার সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। লোকসাধক ও কবিগণ এ ভাবরসের আলোকে ভাটিয়ালী গান রচনা করেছেন, যা ধীরে ধীরে এদেশের লোকমানুষের হৃদয়েও বিচ্ছেদের বীজ বপন করে দিয়েছে।

এজনমে নাইবা যদি পায়

পর জনমে গিয়া যেন ওগো বান্ধব তোমায় আমি পায়

এক বাসরে দুজন থাকি তোমার হাতে হাত মিলাই।।

আমার মনের কত আশা মিটিল না প্রেম পিয়াসা

নিদারুণ প্রেমের কথা কেমন করে তোমারে বুঝায়

বিরহ আগুনে আমি জ্বলেপুড়ে হলাম ছাই।।

কত ব্যথা আমার মনে বুঝাব তোমায় কেমনে

বুক ভাসে দু-নয়ন জলে দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়

আমার কানতে কানতে জনম গেল তোমার দেখা নাহি পাই।।

আর কবে পাব দেখা আজো ঘুরি একা একা

নারাণের মনের ব্যথা করো কাছে বলার সাধ্য নাই

না পাওয়ার কি যে ব্যথা বুঝলে না কানাই।।

কথা ও সুর ঃ কবিয়াল নারায়ণ চন্দ্র সরকার

4. মনঃশিক্ষামূলক ভাটিয়ালী গান

মনসুর হাল্লাজ ফকির সেতো বলেছিল আমি সত্য

সই পলো সাঁঈর আইন মতো শরায় কি তার মর্ম পায়।

লালন শাহ্ ফকির

মানুষের নিজের দেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান, বিষয়টি অনুধাবণ করতে পারার মধ্য দিয়েই মানবের মনঃশিক্ষা পর্বের সূচনা হয়। অধ্যাত্মচেতনা উন্মেষের সাথে সাথে সত্যবোধও এ সময় জাগ্রত হয়। শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের সঙ্গে কথোপকথনে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন- সাধকের জন্য সাধ্যবস্তু লাভের পথ জ্ঞান নয়, কর্ম নয়, এমনকি জ্ঞান মিশ্রিত কর্মও নয়। সাধ্যবস্তু অর্থাৎ মুক্তি মিলবে কেবল শুদ্ধ ভক্তিতে। অদ্বৈত বৈদান্তিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের শুষ্ক জ্ঞানমার্গের বিপদকে তিনি বুঝতেন। অপরদিকে দরকার বা প্রয়োজনের গর্ভে কর্মের জন্ম। কর্ম-তৎপরতা মাত্রই অভাবসূচক। কর্মকে মুক্তির পথ হিসেবে নিলে প্রয়োজন কর্মের বৈধতা ঘোষণা করে, হামেশাই যা বিপদজনক হয়ে উঠবে অন্যের প্রয়োজন নির্দিষ্ট কর্মের মুখোমুখি সংঘাতে। জ্ঞান পথ অবলম্বন করেও সাধ্যবস্তুকে পাওয়া দুঃসাধ্য। চৈতন্য ভেবেছিলেন- মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানের বাহিরকে পেতে পারে না। আবিচার করে সে অজ্ঞানের প্রতি, তার হদিস সে পায় না। বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী সাধক জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ওরফে করুণাকে যুক্ত করেছিলেন। চৈতন্য এই সহজপন্থীদের পথেও যান নাই। তিনি শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন করতে চেয়েছেন, যার সঙ্গে জ্ঞান বা কর্মের কোন মিশ্রণ নেই। আধুনিক ইউরোপে জ্ঞান ও জ্ঞানের নিরিখ যুক্তিবৃত্তি পণ্ডিতদের কাছে নিরঙ্কুশ বিবেচ্য হয়ে উঠলে তাদেরকে শাসন করে বিচ্ছিন্নতার অগুনতি দেয়াল। শুদ্ধ যুক্তির পথে প্রথম দফাতেই ভাবের জগৎটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বস্তু থেকে। দুই জগতের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাটিতে অন্ধপ্রায় দাঁড়িয়ে থাকে যুক্তিবোধ। জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির ভেদ যুক্তি দ্বারাই নিস্পন্ন। যুক্তি এমন কি ব্যক্তিকেও তার নিজের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে। তার আবেগ বুদ্ধির নাগাল পায় না, ইচ্ছা পায়না অনুভবের সাক্ষাৎ, বাইরের জগৎ খুঁজে পায় না ভেতরের জগৎকে। একজন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে বহু সত্তায়।[৬]

আত্মার শুভ উপলব্ধিই হলো মনঃশিক্ষা। পূর্বে সৃষ্ট মানব আত্মা মর্তে দেহকে ধারণ করে, দেহকে সে তার মতো করে পরিচালনাও করে। সুতরাং দেহের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আত্মার মুক্তি অর্থাৎ জ্ঞান শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। জাগতিক জীবনের বাইরেও আমাদেরকে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে মনঃশিক্ষার মাধ্যমে তার প্রতি আনুগত্য লাভের ক্ষেত্র তৈরি হয়। সাধকগণ যে শুধুমাত্র জ্ঞানের উপরেই ভিত্তি করে তাঁর সিদ্ধির জগতে প্রবেশ করেন তা কিন্তু নয়। চিন্তা বা জ্ঞানের মধ্যে কেবলমাত্র 'আমি' বা আমার স্থান নিরূপণ করা সম্ভব, যা তারা করে থাকেন। আর আত্মার শুদ্ধির জন্য প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস, অনুভব, ইচ্ছা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। ভাটিয়ালীতে মনঃশিক্ষামূলক গানে কোথাও কোথাও সাধকগণ স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর নিজের প্রতিই খেদ প্রকাশ করেছেন।

কোন দিনে ছাড়িবে নৌকা দয়াল মাঝি আমারে তাই কইও

পিছনে পড়ে যায় যদি মোরে ডেকে নিও।।

কত শত যাত্রী দিবা কিবা রাত্রি বেলা কি অবেলায়

ওরে ভব পারাপার হচ্ছে পারাপার তোমার দেয়া খেয়া নায়

আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি সংসারের মায়ায় রে

মাঝি ডাকদিয়ে জাগায়ো।।

ওরে বন্ধু তুমি আমার সাগর পারের নেয়ে

অনেক দিনের বিরহী আছে পথপানে চেয়ে

তোমার ময়ূরপঙ্খী নৌকা দিয়ে রে

আমায় পার করিয়ে নিও।।

ভ্রান্তমনে ক্লান্ত দেহে তোমায় ডেকেছি কতবার

পাগল বিজয় কাঁন্দে পথ চলিতে প্রভু আমি পারি না যে আর

দিলাম তোমার উপর জীবনের ভার আমায় পথ দেখায়ে লইও।।

রচনা ও সুর ঃ কবিয়াল বিজয় সরকার

আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়

পাড়ে লয়ে যাও আমায়।।

আমি একা রইলাম ঘাটে, ভানু সে বসিল পাটে

আমি তোমা বিনে ঘোর সঙ্কটে, না দেখি উপায়।।

নাহি আমার ভজন-সাধন চিরদিন কু-পথে গমন

আমি নাম শুনেছি পতিত পাবণ, তাইতে দি দোহাই।।

অগতির না দিলে গতি, ঐ নামে হবে অখ্যাতি

ফকির লালন কয় অকূলের গতি কে বলবে তোমায়।।

লালন শাহ্ ফকির (১৭৭৪-১৮৯০)

5. দেহতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান

মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল শক্তি হল দেহ। দর্শন শাস্ত্রে যাকে বিশুদ্ধ প্রেম বলা হয় সেই বিশুদ্ধ সত্তার বসবাস এই দেহের অভ্যন্তরে। অন্যের দেহের সাথে যখন আমরা পার্থক্য রচনা করি তখন তা নিজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। আমি ও আমার শরীরের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শুধুমাত্র ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে নয় বরং ব্যবহারিক দিক দিয়েও তা প্রমাণিত। দেহ ও আমার মধ্যে এরূপ পার্থক্য বিচার আমাদেরকে আত্মমুখী দর্শন চিন্তার দিকে ধাবিত করেছে। বাংলার কোন ধর্মীয়, বাউল-বৈষ্ণব ও ভাবান্দোলন দেহ বা শরীরকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয়নি। গবেষক ফরহাদ মজহার এর মতে- বাংলা শুধু ভাবের কথায় খুশি নয়, কারণ শরীর ছাড়া ভাব নেই। ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তাদেরই আগে খোঁজ পড়বে শরীর যাদের চিন্তা ও চর্চার কেন্দ্রিয় বিষয়, অর্থাৎ দেহতত্ত্ব এবং দেহতাত্ত্বিক করণ যাদের আন্দোলনের মূলে।[৭] দেহের মুক্তির সাথে যুক্ত থাকে আত্মার মুক্তির বিষয়টি। ভাটিয়ালী গানে দেহকে নৌকা আর মনকে নৌকার কাণ্ডারি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মনের ভাবনাজাত বিষয়াদি মানুষের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রাচীন বাংলার প্রাগার্য ও আর্য সংস্কৃতির প্রায় সবটাই জুড়ে রয়েছে কায়া সাধনার বিষয়, যা পরবর্তীতে এ দেশের বাউল সাধন পদ্ধতির সাথেও যুক্ত হয়েছে। ভাটিয়ালীর উদাস, উদার ও লম্বা সুরের সাথে দেহতাত্ত্বিক সাধনার বিষয়টি যুক্ত হওয়ার ফলে ভাবপ্রবণ বাঙালির হৃদয়ে এ ধারার গান একটি স্থায়ী ও মজবুত ভিত্তি রচনা করেছে।

এই দেহের হইয়া কাণ্ডারি, করিও তুমি আমায় পার

ভব পারের কর্ণধর তুমি আমার।।

ইহ কালের প্রেমদাতা পরকালের উদ্ধারকর্তা

তুমি জীবের পরম আত্মা তুমি কাণ্ডারি আমার।।

তোমার মনের মত হয় সে যে জন

তারে তুমি দাও আলিঙ্গন

আমি পাপী হই অভাজন গতি নাই কি আমার।।

এ ধরাধামে আসি বারেবারে, তোমায় ভালোবাসিবারি তরে

নারাণেরই এই প্রার্থনা কেবল ভরসা তোমার।।

(কথা ও সুর ঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার)

নদীবহুল পূর্ববাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌকার অপরিহার্যতা গানের বিষয়ভূমিতে এসেছে অনুষঙ্গ রূপে। মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৌকার বিভিন্ন অংশের নামে রূপক অর্থে সঙ্গীতের ভাষায় চিহ্নিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে দেহকেন্দ্রিক বাউল সাধনার নানা তত্ত্ব সংযোজিত হয়ে তার সীমানাকে ব্যাপ্ত ও বিচিত্রতর করেছে। মানুষ জাগতিক জীবনের বিষয়াবলীতে মত্ত থাকায় এ দেহ যে এক সময় পারাপারের অনুপযোগী হয়ে যায়, দেহতত্ত্বের ভাটিয়ালী গানে সে বিষয়াবলীকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

6. লোকপ্রেমমূলক ভাটিয়ালী গান

লোকপ্রেম বিষয়ক ভাটিয়ালী গানে মূলত মানুষের কাছেই গায়কগণ মনের বাসনা, নালিশ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোবাসা, বিরহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির কথা বলেছেন। মধ্যযুগ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে ঈশ্বর চেতনার স্থানে সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সংযোগ ঘটে। বাংলা গানের বিকাশের ধারায় এটিকে দেশি বা একরৈখিক সঙ্গীত বলা হলেও, লোকসঙ্গীতের ধারায় এ রীতির সংযোগ অনেক দিনের। লোকসঙ্গীতের কথা বললে সর্বপ্রথমে 'প্রেম-সঙ্গীতের' কথা বলতে হয়। কেননা এই সঙ্গীতগুলিই লোক সমাজে সর্বাধিক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের অকুণ্ঠ আবেগ-উচ্ছাসের প্রকাশই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। বিরহ, মিলন, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি যৌবনধর্মী অনুভূতির প্রেরণাই এই সঙ্গীত সৃষ্টির মূলে ক্রীয়া করিয়াছে। প্রেম সঙ্গীতগুলি প্রকৃতপক্ষে একক কণ্ঠে একটি যন্ত্রের সাহায্যে গীত সঙ্গীত। অবসর সময়ে লোকচিত্ত-বিনোদনের জন্যই এগুলি গীত হয়।[৮]

বন্ধু রে পরাণ বন্ধু, তুমি যাইও নারে থুইয়া

আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া

তোমার দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম

মাথার ক্যাশও দিয়া রে।।

ভাটির বাঁকে থাকরে বন্ধু উজান বাঁকে থানা

ও তোমার চোখের দেখা মুখের হাসি

কে কইরাছে মানা রে।।

বাড়ির শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা ডওয়া

ওরে নারীর শোভা সিতা রে সিঁন্দুর, নদীর শোভা খেওয়া।।[৯]

অথবা

এপার থনে ওপার গেলা অইজো ফিরলাই না

ও বন্ধু কই রইলা ও।

ও বন্ধু রে, আরে তুমি আমার বটবৃক্ষ

আমি তোমার লতা রে বন্ধু

তোমারে ঘেরিয়া রে বন্ধু, তোমারে ঘেরিয়া রে আমি

কইতাম কত কথা রে।

ও বন্ধু রে, ওরে অনেকের অনেক থাকে আমার কেবল তুমি রে বন্ধু

শীগ্র কইরা দাওহে দেখা নইলে মইরা যামু আমি রে।

প্রচলিত ঃ সিলেট অঞ্চল

লোকসঙ্গীত একটি সার্বজনীন সমাজ মানসিকতা কিংবা মনোভাবকে প্রকাশ করে। এর মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনকর্মের সহজ সরল চিত্রপটের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বলেই সঙ্গীতকে লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, চাষি, মাঝি, তাঁতি, কর্মকার, ক্ষৌরকার, রাখাল, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, গাড়োয়ান, বেদে-বেদেনি, ভিখারি-ভিখারিনী নিজের মনের তাগিদেই গান রচনা ও পরিবেশন করে

চলে। এ জন্য শ্রোতার প্রয়োজন পড়ে না, স্রষ্টা নিজেই এ গানের শ্রোতা। গ্রাম-বাংলার এই লোককবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- চাষি নির্জন পল্লির প্রান্তরে গাছের ছায়ায় অলস মধ্যাহ্নে আপন মনে বাঁশি বাজায়, বেদেরা নদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়, গান গায়। মাঝি ভাটার স্রোতে অথবা নৌকায় পাল তুলে নৌকা ভাসিয়ে বিগলিত চিত্তে নিজ জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপনে বিভোর হয়ে উদাস সুরে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সকলেই গায়ক, আর সকলেই শ্রোতা। অর্থ্যাৎ সঙ্গীতের শিল্পকলা এদের যতনা আকৃষ্ট করে, তারও বেশি এদের কাছে যা অর্থবহ মনে হয় তা হল সঙ্গীতের মাধ্যমে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের অনুভূতিরই আত্মপ্রকাশ। সাঙ্গীতিক শিক্ষা-দীক্ষার অভাব সত্ত্বেও গ্রামীণ জনসাধারণের অনেকেই সঙ্গীত পরিবেশনায় স্বভাবগত দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে। এজন্য তাদের কোন ওস্তাদ বা গুরুর কাছে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হয় না। স্বীয় পরিবেশ পরিমণ্ডলে প্রতিবেশী কিংবা সমাজের অপরাপর গায়ক-বাদকের সঙ্গীত পরিবেশন শুনে এরা মুখে মুখে গান শিখে নেয়।[১০]

সুজন বন্ধুরে আরে ও বন্ধু

কোন বা দেশে থাক বন্ধু রে, অভাগিরে কাঁন্দাইয়া রে

কন্যার এমন রাখ সুজন বন্ধুয়া রে।।

পিরিত কইরা ছাইড়া গেলাই রে বন্ধু লাগাইয়া মমতা

অন্তরে মোর জ্বালাইয়া বিনা কাষ্ঠের চিতা রে।।

যষ্ঠি না আষাঢ় মাসে রে বন্ধু গাঙ্গে নয়া পানি

আমার কি মনে ছিল না খেলতাম নাউ দৌড়ানি।।

উজান বাঁকে থাক রে বন্ধু ভাইটাল বাঁকে থানা

চোখের দেখা মুখের হাসি কে কইরাছে মানা।।

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, জাতীয়তা, দৈনন্দিন জীবনাচার, বিনোদন, কর্মসাধনা, ধর্মসাধনা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা-সফলতা, আশা-প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, কান্না, হাসি, সুখ, শান্তি, প্রশান্তি ইত্যাদি যখন এখানকার মানুষকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ পায় তখন সেটি সার্থক লোকসঙ্গীত হিসেবে রূপ লাভ করে। সার্বিকভাবে ভাটিয়ালীর কথা ও সুর সেই লোক মানুষেরই সৃষ্ট সঙ্গীত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

7. গুরুতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান

প্রাচীন সকল ধর্ম মত ও পথে যোগচর্চা নির্ভর আত্মসাধনার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, দেহতত্ত্ব, সুফির ফানা, বৌদ্ধ নির্বাণ ইত্যাদি ধর্মমতের ক্ষেত্রেও দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্মণ পাওয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদ যুক্ত হওয়ার ফলে এ সকল ধর্মমত নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এ সকল প্রশ্ন বাংলার লোকগানেও খুব সহজেই এসে যুক্ত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে গুরুতত্ত্বমূলক বিষয়াবলীতে মূলত গুরুর বন্দনা করা হয়েছে। গুরু হলেন তিনি, যিনি হবেন সঠিক পথের নির্দেশক। গুরু নির্দেশিত পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করলেই একজন সাধকের জন্য সিদ্ধি লাভের পথ সুগম হয়। ভাটিয়ালী গান ও সুরে স্রষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্যতম পথ হল মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। স্রষ্টা গুরুকে জানতে একজন মানব গুরুর প্রয়োজন হয়। যিনি সৃষ্টি জগৎ, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, সুনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করবেন। সাধুগুরু বিনে সঠিকভাবে ঈশ্বর সাধনা পূর্ণ না হয়েও উঠতে পারে। মানব জীবনই হলো আত্মার মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ সময়। সুতরাং সঠিক পথের সন্ধান জানতে সৎ গুরু সঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি ও সন্ধান লাভ সম্ভব। বাউল গুরু লালন শাহ্ তার গানের মাধ্যমে বলেছেন- 'তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধবো কি মতে, গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লও গো সুপথে'। ভাটিয়ালী গানে তাই বারবার গুরুর দোহাই ও তার চরণধূলি কামনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মমতে বলা হয়েছে শেষ নবী তাঁর উম্মতদের বেহেস্তে যাওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে শেষ বিচারের দিনে সুপারিশ করবেন। উম্মতকে তিনি তাঁর নির্দেশিত পথের অনুসরণকারী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক ধর্মেই অবতার এসেছেন, মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। ভাটিয়ালী গানে সেই গুরুর কথাই বলা হয়েছে যিনি মানবাত্মার পাপমুক্তি ও সত্যের পথ নির্দেশক হতে পারেন।

দয়াল গুরুজী রাঙ্গা চরণ পাবো কি।

ও গুরুজী, কোন কামলায় বাঁন্ধছে ঘর, বান্ধে বান্ধে জোড়া

নব কোঠায় জ্বলছে বাতি ষোল জন পাহারা

কি গুণেতে ছিল ধন কেহ নাহি জানে

মদনা চোরা করলো চুরি কেমন সন্ধানে।

ও গুরুজী, লাভ করিতে আইলাম ভবে, লইয়া সাধের ধন

পড়িয়া কামিনীর প্রেমে হারাইলাম রতন

হারা হইলাম মুর্শিদের ধন মন হইলো উতলা

গুরু বিনা কে লাগাইবে খোলা বাঁশের তালা।

ও গুরুজী, আমি যদি ডুইবা মরি, পইড়া নদীর জলে

নাম ধরিয়া কে ডাকিবে দয়াল গুরু বলে

পতিতের কাণ্ডারি তুমি সকল শাস্ত্রে কয়

তুমি বিনা কে আছে আর পাপীর দয়াময়।

ও গুরুজী, কত কত সাধু জনা তরী বেয়ে যায়

সোনার নৌকায় পাল উড়াইয়া রঙ্গের বৈঠা বায়

ওয়াহিদ তোমার চরণ তলে তেমনি রইলাম চাইয়া

কূল পাবো কূল পাবো বলে দিন গেলো মোর বইয়া।

কথা ও সুর ঃ পাগল ওয়াহিদ

8. মুর্শিদতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালী গান

মুর্শিদতত্ত্ব মূলত সুফি চেতনা প্রভাবজাত। অসীম ও সসীমের মধ্যে মিলনের এই চূড়ান্ত অবস্থাকেই বৈষ্ণবরা বলেন শ্রীরাধার আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। সুফি দার্শনিকগণ এই অবস্থার নাম দিয়েছেন ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ। মুর্শিদ বা মুর্শিদগুরু হলেন সাধকের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। যে তার সাধনার উদ্দেশ্য সফল হতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সেই মুর্শিদের চরণ পেয়ে সাধনার জোরে মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন 'আনাল হক' অর্থ্যাৎ আমিই পরম সত্য ও সত্তা। হাল্লাজের যিনি আনাল হক, চৈতন্য দেবের 'মুই সেই মুই সেই' আর বাউলের 'জ্যান্তে মরা' এবং ভাটিয়ালী গানের 'দয়াল মুর্শিদ'। শুধু আল্লাহই যদি পরমসত্তা হয়ে থাকেন, তা হলে শেষ বিশ্লেষণে এবং সত্যিকার অর্থে শুধু তিনিই আছেন। এ যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত সুফিদের সত্তার একত্ববিষয়ক ধারণা। এ একত্বের অর্থ অবশ্য এক নয় যে, আল্লাহ চলমান জগতের বস্তু ও ঘটনারাশির একটি নিছক সমষ্টি মাত্র। এমন কথা বলার অর্থ হবে সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করা। কিন্তু সুফিদের একত্বতত্ত্ব তা নির্দেশ করে না। সুফি মতে আল্লাহ কোন বস্তুসমষ্টি বা যৌগিক একত্ব নন, বরং সেই পরম একক সত্তা। তাঁকে জানতে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎলাভ করতে হলে

চাই প্রগাঢ় ধ্যান, চাই অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তিমিশ্রিত অন্তর্দৃষ্টি। সুফি অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তম মুহূর্তে আল্লাহর অপরোক্ষ জ্ঞান এবং সান্নিধ্য অর্জন সুফির চূড়ান্ত লক্ষ্য।[১১] ভাটিয়ালী গানে সেই মুর্শিদের কথাই বলা হয়েছে। তবে ভাটিয়ালীর উদাস সুরে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তির জন্য একক সত্তা বা ঈশ্বরের সাথে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

আমার মন মজাইয়ারে

দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজের দেশে যাও ।

ও মুর্শিদ ও, একে আমার ভাঙা নাও তার উপরে তুফান বাও

ঝলকে ঝলকে উঠে পানি রে

আবের নেওয়ারি রে, কাঁচা-বাঁশের বেড়া রে

বাজার লুটিয়া নিল চোরায় রে।

ও মুর্শিদ ও, একে আমার ভাঙা ঘর তার উপরে নড়েচড়

কখন জানি এই ঘর ভাইঙ্গা পড়ে রে

কইও দয়ালের ঠাই এ তরীর ভরসা নাই

লাহুর দরিয়া দিতে পাড়ি রে।

রচনা ও সুরঃ শাহ্ আব্দুল করিম

ভাটিয়ালী গানের গতি-প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত তত্ত্বভিত্তিক ভাটিয়ালীর উল্লিখিত ভাগগুলো করা হয়েছে। বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাটিয়ালী গান গ্রন্থে ড. ওয়াকিল আহমদ ভাটিয়ালী গানকে যথাক্রমে লৌকিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণ লীলা, গৌরাঙ্গ লীলা, আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তবে যে দেহতরীকে নিয়ে সাধক সব সময় পারাপারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই দেহতরীতে বাসকারী আত্মার কথা বা আত্মতত্ত্বের বিষয়ে এখানে কোন আলোকপাত করা হয়নি। তবে আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, ঈশ্বরপ্রেম, মুর্শিদতত্ত্ব, বিচ্ছেদী ও মনঃশিক্ষামূলক ভাটিয়ালী গানকে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক গানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দিনেন্দ্র চৌধুরী ভাটিয়ালী গানকে মোট ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন যেমন- ১. আধ্যাত্মিক ২. মানবিক ৩. বাউল (বৈষ্ণব ভাবাশ্রয়ী) ৪. গুরুবাদী ৫. ইসলামী ৬. মুর্শিদি। কিন্তু যে লোকপ্রেমের সংযোজনের কারণে লোকসঙ্গীত জনমানুষের গান হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে আলাদা করে

কোন শ্রেণিকরণ করা হয়নি। এ ধরনের সাঙ্গীতিক বিভাগ সাধারণত নাগরিক জীবনে বসে রচিত লোকসঙ্গীত বা পল্লীগীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ভাটিয়ালী গানকে ভাটার টানে, অলস মাঝির মনের কথা হিসেবে পরিচয় করে দিলেও দিনেন্দ্র চৌধুরী নিজে এক পর্যায়ে এ যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গীত কোন বৈষয়িক বিষয়ের তাগিদেই রচিত হয় এমন বিষয়টি লোকসঙ্গীতের বেলায় তেমন প্রযোজ্য নয়। সঙ্গীত রচিত হয় অন্তরের তাগিদে। পরে সেই কথার উপর ভিত্তি করে আলোচনার বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়। ভাটিয়ালীকে শুধুমাত্র নৌকা বা মাঝির গান বলেই এর বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করে করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- ভাটিয়ালী কেবল মাঝির গান নহে, ইহা গো কিংবা মহিষ রক্ষক, রাখাল বা মহিষালের এবং বাউল-বৈরাগীর গান।[১২]

কখনো কখনো মাঝি ভাটার টানে যে ভাটিগান গায় তা নিজের লেখা গান কি না, তাৎক্ষণিক কোন রচনা কি না, সেখানে তার মনের অবস্থার প্রতিফলন ঘটে কি না, গানটি কার রচনা করা বা অন্য কোন রচনা থেকে আত্মস্থ করা কি না, এমন নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। দিনেন্দ্র চৌধুরীর মতে- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা উপলব্ধ, তা থেকে বলা যায় পূর্ব বাংলার বিখ্যাত বাউলা গানের আসরে শ্রুত কোন বিশেষ গানই এ ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়। তাতে বৈরাগ্যভাবের সঙ্গে দার্শনিকতার এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি তৈরি হয়, যাকে আধ্যাত্মিক (spiritual) বলার চেয়ে দার্শনিক (philosophical) দৃষ্টিভঙ্গিজাত বলাই অধিকতর সমীচীন। অথবা মনের অবস্থানুযায়ী বিচ্ছেদ পর্বটিও এ গানে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বয়সধর্ম অনুযায়ী তার প্রকাশ ধারাটিও বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে, সুতরাং বিচ্ছেদ, অনুরাগ, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও বৈরাগ্য চেতনাই ভাটিয়ালীর মূল উপজীব্য বিষয় রূপে গণ্য হওয়া সঙ্গত।[১৩]

ভাটিয়ালী গানে নৌকার মাঝির কণ্ঠে যে গান আমরা শুনতে পাই তার আবেদনে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের চিত্ররূপ খুঁজে পাওয়া যায়। 'আরে ও ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া, আদু ভাইরে কইও আমায় নায়র নিতো আইয়া' গানের সঙ্গে 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রবো আমি পন্থের দিকে চায়া রে' গানের আবেদনে তেমন কোন তারতম্য নেই। একই গায়ক কখনও হয়তো দোতারা হাতে মহিষের পিঠে উঠে কিংবা কখনও নৌকায় বসে লম্বা টানে দুটি গানই পরিবেশন করলে তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশে কোন ঘাটতি থাকবে না। তবে পরকিয়া বা বিবাহ পরবর্তী প্রেমরূপ রূপায়ণে ভাওয়াইয়া গানের মতো ভাটিয়ালী গান তেমন কোন ভূমিকা তৈরি করতে পারেনি। নদী-মাতৃক বাংলাদেশে নদীও নৌকাকে কেন্দ্র করে এমন অনেক গান রচিত হয়েছে। গানের অভিব্যক্তি ও সুরের চলন অনুসারে কোন গান কোন শ্রেণির বা পর্যায়ভূক্ত তা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই সব সূত্র ধরে বিভিন্ন সময়ে নদীর বুকে মাঝির নৌকা বাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে হাজারো গান এবং ভাটিয়ালী গানের আখ্যা নিয়ে কিছু সমস্যা সৃষ্টির সহায়তা করেছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য (perspective) ভিত্তিক এ

জাতীয় গান লোকসঙ্গীতে নবতর সংযোজন বলে গণ্য হতে পারে। এর সঙ্গে ভৌগোলিক কিংবা ঐতিহাসিক মূল্যবোধ যুক্ত হবার অবকাশ নেই। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারায় এর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়, কিন্তু কোন কারণেই তা ভাটিয়ালীর আখ্যায় ভূষিত হতে পারে না।[১৪] ভাটিয়ালীর মূল চেতনা বহির্ভূত অনেক গান বর্তমান সময়েও রচিত হচ্ছে কিন্তু সুরের আবে১দন ও কথার মধ্যে কিছুটা হালকা ও চটকদার রসের মিশ্রণ থাকার ফলে এ ধরনের গানের অস্তিত্ব এক সময় বিলীন হচ্ছে। তত্ত্ব ও তথ্য বহুল ভাটিয়ালী গান সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- ভাটিয়ালী সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা মূলতঃ কোন যন্ত্রের সাহায্যে গীত হয় না। কেবল মাত্র সুরই ইহার মুখ্য অবলম্বন। ইহার সঙ্গে নৃত্য কিংবা আর কোন উপায়ে তাল রক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়া বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা ব্যতিত ইহা গীত হয়। যদিও সকল পল্লিসঙ্গীতই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাদ্যযন্ত্রে সাহায্যে গীত হয়, তথাপি ভাটিয়ালীর মধ্যে এই বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে- ইহার কেবল মাত্র কণ্ঠস্বরই মুখ্য অবলম্বন। তাহার ফলে ইহার স্বরের বিভিন্ন পর্দাগুলি অতি সহজেই সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। যেখানে তাল রক্ষা করিবার প্রয়োজন কেবল সেখানেই বাদ্যযন্ত্র অপরিহার্য হইয়া উঠে। ভাটিয়ালীর সেই দায়িত্ব নাই বলিয়া ইহা এই বিষয়ে স্বাধীন। সুতরাং শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবা চলচ্চিত্রে, বেতারে কিংবা রেকর্ডে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আমরা যে ভাটিয়ালী শুনতে পাই, তাহা প্রকৃত ভাটিয়ালীই নহে- ইহাকে 'নাগরিক ভাটিয়ালী' নির্দেশ করা যায়। সুতরাং এই তথাকথিত ভাটিয়ালী শুনিয়া বাংলার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারা যাইবে না।[১৫]

এভাবেই কালের স্বাক্ষর নিয়ে ভাটিয়ালীর অঙ্গ সজ্জায় প্রসাধনের এক উন্নত শিল্পরূপ যুক্ত হয়ে এর মূল বিষয়ের অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের কথা বা বিষয়বস্তুতে তরী, নৌকা, মাঝি, হাল, পাল, দাঁড়, বৈঠা, ছৈ, মাস্তুল শব্দরাজির জন্য ভাটিয়ালীকে 'মাঝির গান' হিসেবে পরিচয় করে দিতে কোন ধরনের বেগ পেতে হয়না। এই সমস্ত শব্দ যুক্ত থাকার ফলে ভাটিয়ালী গান মাঝির বা রাখালের অবসর বিনোদনের সঙ্গী হতেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তরী-মাঝি শব্দের প্রতীকী ব্যবহার ভাটিয়ালী গানকে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা প্রদান করেছে। 'দেহ' তরীর প্রতীক আর 'মন' তার মাঝি এবং 'জগৎ-সংসার' ভবনদী বা সাগরের প্রতিরূপ। ভাটিয়ালী গান দীর্ঘ বা টানা এক নৈরাশ্যের সুরে ধ্বনিত হয় বলে সবাই জানে। এক সময় শুধুমাত্র মানবিক আবেদনই ছিল এর মূল উপজীব্য। তত্ত্ব ও দর্শন ভাটিয়ালী গানের পরবর্তী সংযোজন। যেখানে সুরে উঠা-পড়ার বিষয়টি স্বাধীন, তালবাদ্য বা আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশে কোন ধরনের সীমারেখা থাকে না। যার কারণে মূল ভাটিয়ালী গানে তালের ব্যবহার ও তত্ত্বের প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবে শহুরে সৃষ্ট ভাটিয়ালী গানে তালের সংযোজন পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী গানে ঠিক কোন সময়ে এসে আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত হলো সে সময় নির্ধারণ করা অবশ্য কঠিন বিষয়। তবে সুপ্রাচীন কাল থেকেই তত্ত্বমূলক বা দার্শনিক, আধ্যাত্মিক চেতনাযুক্ত ভাটিয়ালী শ্রেণির গান পূর্ববাংলার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যেরই

Dhaka University Institutional Repository

অংশ। যা বিভিন্ন ধর্ম মতাদর্শেরও পরিচয় বহন করেছে। ভাটিয়ালী গানের কথা ও সুরের প্রভাবে শুধুমাত্র মধ্যযুগের কবিগণই যে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন তা নয় বরং আধুনিক যুগের কবিগণও নাগরিক জীবনে বসে ভাটিয়ালীর ভাবসাগরে তাঁদের লেখার মাধ্যমে নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন। বাঙালির লোক উৎসবের মত ভাটিয়ালী গানেও ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জনমানুষের মনের আবেগ ফুটে উঠেছে। কেউ এ গানকে করেছেন ভবপারের কাণ্ডারি, আবার কেউ এ গানের আশ্রয়ে মনের না পাওয়া অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন। একই ধারার গানের মধ্যে এত বিচিত্র ধরনের আবেদন বা ভাবের প্রকাশ একমাত্র লোকসঙ্গীতেই সম্ভব, যা এর অন্যতম জনপ্রিয় গীতধারা ভাটিয়ালী গানের পরিবেশনার মধ্যদিয়ে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

Z_¨b‡‘k

১। প্রসঙ্গ বাংলা গান- ড. করুণাময় গোস্বামী- অনুপম প্রকাশনী- বাংলাবাজার ঢাকা- ফেব্রুয়ারী- ২০০৯- পৃ. ৬৫।

২। প্রাগুক্ত- পৃ. ৬৫-৬৬।

৩। লোকগীতির বিষয়গত শ্রেণিবিন্যাস ও সমাজতত্ত্ব, আবদুল ওয়াহাব, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫২ বর্ষ:২য়, পৃ . ১৯৪।

৪। বাংলা লোকসংগীত : ভাটিয়ালী গান, ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৭, পৃ. ২৩।

৫। হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম, দীনেশচন্দ্র সেন, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৮৯।

৬। বাংলার ধর্ম ও দর্শন, সম্পাদনা ঃ রায়হান রাইন, সংবেদ প্রকাশনা ২০০৯, পৃ . ১৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ . ২১৬।

৮। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মুহম্মদ এনামুল হক, ৫২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ . ৫১১।

৯। বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহ ঃ ৫৩, জসীমউদ্‌দীন, গায়িকা ঃ আমেনা খাতুন, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।

১০। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, আবদুল ওয়াহাব, ৫২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ . ১৭২।

১১। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, আমিনুল ইসলাম, ৫২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ . ৬২।

১২। ভাটিয়ালি গান, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, এপ্রিল - ২০০২, পৃ .২৪।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ . ২৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mv‡bi ˆewkó¨

ভাটিয়ালী গানের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ গীতরীতিকে অন্যান্য সকল সঙ্গীতরীতি থেকে আলাদা রূপ প্রদান করেছে। সঙ্গীত পরিবেশনার সময় দু-তিনটি শব্দ একসাথে উচ্চারণ করা হয়। এ ধরনের উচ্চারণের পরই একটানা লম্বাসুরে গান পরিবেশন করা হয়। সাধারণত বাক্যের শেষ শব্দটি দীর্ঘ সুরে উচ্চারিত হয়। গায়কের মর্জি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এ গানের স্কেল, এক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। ভাটিয়ালীর সুর পরিবেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১. চড়া সুরের দিকে চলে যায়, এবং

২. তারপর ধীরে ধীরে, কখনও বা

৩. দ্রুত বেগে নেমে আসে খাদের দিকে, সেখানেই গান যেন ক্রমেই বিশ্রাম লাভ করে।[১]

এছাড়া নদীর গতি-প্রকৃতি, বছরের বিভিন্ন মৌসুম, প্রকৃতির আচরণ ইত্যাদি ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে। বাংলার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ এ গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নদীর বিশাল জলরাশি মানুষকে খাদ্য সংস্থানে সহায়তা করেছে। নদীর ঢেউ, বাঁক, উজান-ভাটি, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি পরিবেশের সাথে এখানকার মানুষের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। ফলে নদী শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা মানুষের মনকেও প্রভাবিত করে। চিরচেনা পরিবেশকে এমন হারিয়ে যেতে দেখে তা মানুষের মনেও বিচ্ছেদের সুরে বারবার আন্দোলিত করেছে। ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দিনেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন- ভাটি অঞ্চলের প্রধান বাহন নৌকা। নৌকা চালনায় ভাটিতে থাকে শ্রমহীন স্বাচ্ছন্দ। হাল ঠিক রেখে শুধু নৌকা সোজা রাখার কৌশলটুকু আয়ত্ত করতে হয় আরোহীকে। ভাটার টানে নৌকা গড়িয়ে চলে নিজের গতিতে। মাঝির মনের সুপ্ত কামনা-বাসনা বাঙময় হয়ে উঠে তার কণ্ঠে, যার গভীরতা অপরিসীম। ভাটিয়ালী গান অবচেতন মনের জীবন জিজ্ঞাসা। 'আমার চিত্ত হয়গো দাহন/হায়গো মনের আগুনে'। ভাটি অঞ্চলের মূল সুরধারাটি ভাটিয়ালী। তবে সকল শ্রেণির সঙ্গীতে তা প্রতিফলিত হয়, এ ধারণাও হয়তো ঠিক নয়। কারণ বিবিধ শ্রেণির গানে কিছু সুর বৈচিত্র্য স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ নৌকা মাঝি সম্পর্কিত এবং (spiritual) কিছু গানেই ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।[২]

ভাটিয়ালী গানের সুরকে অনেকে শুধুমাত্র নৌকা বা মাঝির গান বলেছেন, যা এ গানের বৈচিত্র্য ও ক্ষেত্রকে অনেকটা ছোট করেছে। ভাটিয়ালী গানের মধ্যদিয়ে লোকসঙ্গীতে প্রচলিত প্রায় সকল প্রকার গীতিধারারই প্রকাশ পেয়েছে। ভাটিয়ালী গানের মধ্যে বিদ্যমান কিছু গুণাবলি মৌলিক উপাদান হিসেবে অন্যান্য গানের ধারা বিনির্মাণে সহায়তা করেছে। ভাটিয়ালী একটি উন্নততর সঙ্গীত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী। ড. করুণাময়

গোস্বামীর মতে- অনেক গবেষক ও সংগ্রাহক ভাটিয়ালীকে একটি সঙ্গীত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা না করে এক ধরনের ভাটির গাঙের মাঝির গান হিসেবে বিবেচনা করে এর বিস্তার, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে খর্ব করেছেন।[৩] ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সঙ্গীত গবেষক সুরেশ চক্রবর্তীর মতামতকে অনেকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। ক. ভাটিয়ালী গান গায় একজনে, এটি হয়তো শোনেও একজনে। হাতে কোন কাজ নেই পাল তুলে দিয়ে হাল ধরেছে নৌকার মাঝি। এই অবসরটুকু আনন্দে ভরে তুলবার জন্য সে গান ধরেছে। নদীর জলের সঙ্গে, উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে এর সুর বাঁধা। অন্যকে গান শোনাবার তাগিদ এখানে নেই। সুরের মধ্যে নেই কোন চাঞ্চল্য। এ গান ছন্দের বাহনে সুরকে চঞ্চল করে তোলে না। এর সুর তার নিজের গতিতে মাঝির মনের কথাকে সঙ্গে নিয়ে একটানা লম্বা সুরে ঢেউয়ের সঙ্গে দিগন্তে পাড়ি জমায়। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিয়ালী গানের সংযোগ একটি চরম বিস্ময়ের বিষয়। গানে কোন ছন্দ না থাকলেও পরিবেশনার কৌশলে ভাটিয়ালী নিজেই নিজেকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের প্রয়োগের মাধ্যমে যে অপরূপ সৌন্দর্যময় পরিবেশ একজন ভাটিয়ালী গায়ক তৈরি করেন, তার থেকে শ্রীবৃদ্ধির জন্য অন্য কোন যন্ত্রানুসঙ্গের প্রয়োজন পড়ে না।

খ. অন্যান্য গীতরীতিতে যেমন একটি একটি করে শব্দ উচ্চারিত হয়, ভাটিয়ালীর বেলায় সেটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এখানে দু-তিনটি শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। এই শব্দসমুহের উচ্চারণের পরই সুরটি হয় অনেক দীর্ঘ বা লম্বা। কথার আবেদনকে আরো বেশি উপভোগ্য করে তুলবার জন্য এখানে সুরের আন্দোলন অনেক জোরালো থাকে। এই স্বর কতটুকু লম্বা হবে তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের মেজাজ, রুচি এবং ইচ্ছার উপর। অনেক সময় সুরের উঠা-নামার বিষয়টিও গায়কের মর্জির উপর নির্ভর করে। এ সময় নদীর কূলে দাঁড়ানো মানুষের কাছে সুরগুলো কখনো মিলিয়ে যায় আবার হঠাৎ করে তা ফিরে আসে।

গ. সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাটিয়ালীর একটি নিজস্ব রীতি আছে। যার কারণে অতি সহজেই একজন শ্রোতা এ গানের পরিবেশনা শুনে ভাটিয়ালীর রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। গানের শুরুতেই যে চড়া সুরের প্রয়োগ তা ধীরে ধীরে খাদের দিকে নেমে আসে। কখনও এ সুর খুব দ্রুত খাদে এসে পড়ে আবার কখনও সুরের আন্দোলনের মাধ্যমে খাদে এসে পড়তে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এমন একটি খাদ বা স্বরে এসে গান থামবে, মনে হবে সুর যেন বিশ্রাম গ্রহণ করলো। প্রাণের কোন গভীর বেদনাকে প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের মন যেমন হালকা হয়ে উঠে, ভাটিয়ালী গান পরিবেশন শেষে সুরের খাদে এসে বিশ্রাম

গ্রহণের বিষয়টি অনেকটা সে রকম হয়ে দেখা দেয়। সুরের খাদ যেন মানুষের জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে নদীর জোয়ার-ভাটা ও স্রোতের সংযোগ ঘটানো হয়। মাঝি তার জীবনের অতীতকে খুব কাছে থেকে দেখতে পারে।

ঘ. ভাটিয়ালীতে এক সময় কম সংখ্যক স্বরের ব্যবহার ছিল, যা প্রাচীন ধারার গীতরীতিতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে স্বর প্রয়োগের দিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভাটিয়ালী গানে সাতটি স্বরের ব্যবহার হয়, কখনো কখনো এটি দুই সপ্তক জুড়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের সুর শুরুতেই অনেক উপরে উঠে যায় এমন বিষয়টি সার্বজনীনভাবে গৃহীত নয়। অনেক ভাটিয়ালী গান শুনতে পাওয়া যায় যেগুলো নিচের স্বর থেকে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ খাদ থেকে শুরু হয়ে এ সকল গান ধীরে ধীরে উপরের সুরে আরোহন করে। উত্তরাঙ্গে স্বর-প্রয়োগের পর আবার তা পূর্বাঙ্গে নেমে আসে। তবে স্বরের চলাচলের সময় ও স্থান নিরূপণ করলে দেখা যায়, পুরো একটি গানে, সুরের মোট প্রয়োগের বেশিরভাগ সময়ই তা উত্তরাঙ্গে অবস্থান করে। ভাটিয়ালীতে কৌসুলী-ঝিঁঝিঁট রাগের রূপ পাওয়া যায়, তার স্বররূপ মুদারার ধৈবতে নেমে আসে। স র ম। প ম গ র স ণ্ ধ্। ধ স স র গ, র গ স। এছাড়াও অনেক সময় ভাটিয়ালী সুর আরোহী অঙ্গে উদারার ধ্ পর্যন্ত চলে আসে।

ভাটিয়ালীর প্রথম চড়া গলার সুর বা তারসপ্তকে সুরারোহন অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়। মাঝি, বন্ধু, পাগল মন, ওরে, ও নদীরে ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ তারসপ্তকের র্স র্র র্গ র্ম পর্যন্ত পৌছায়। সেখান থেকে সুর আবার নিচে অর্থাৎ খাদে নেমে আসে। ভাটিয়ালীর অবরোহন কখনো প ম গ র স ণ্ ধ্ আকারে পরিবেশিত হয়। আরোহন ও অবরোহনের এরকম ভিন্নতার কারণেই ভাটিয়ালী গানের অনেক আঞ্চলিক রীতিও তৈরি হয়েছে। রাধ-কৃষ্ণের বিরহ-বিচ্ছেদ বা প্রেম সংক্রান্ত বিষয়াবলী ভাটিয়ালী গানে যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। প্রথম সময়ের যে ভাটিয়ালী গান পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীন লোকরীতির উপাদান অর্থাৎ নদী-নৌকা, প্রকৃতি-প্রেম ইত্যাদি বিষয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। নদী হলো মানব জীবনের সময়, যে সময় ধরে একজন মানুষ দেহের উপর বসবাস করে। নৌকা হলো দেহতরী বা যে দেহের উপরে একজন মানুষ বা আত্মা বসবাস করে। ভাটিয়ালী গানের মধ্যে যেমন বিবর্তন আছে তেমনি এর সুরেও নানা সময় পরিবর্তন এসেছে।

। স স র জ্ঞ । ম জ্ঞ র স । স র গ ম । গ র স া ।

। কা লো মে ঘে। ০ ০ ০ ০ । সা জ ক ই। রা ছে ০০।

। স গ া গ ।ম প ম গ ।গ ম ধ ণ । র্স ণ ধ প ।

।প রা ণ্ তো । মা নে না০। সা ব ধা নে। চা০ ০ ০।

। প প ধ ণ । ধপ গ ম ধপ। প ম গ স । স া গ া ।

। লাই ও ত রী। নাও যে ন ০। ডু বে না গো। না ই য়া০ ।

। প ম া ম। গ গ র স । া গ র স । া া া া।

। ন দী র কু । ল পা ই লা ম । গ না ০ ০। ০ ০ ০০।

এখানে কোমল গান্ধার এবং কোমল নিখাদের আন্দোলিত ব্যবহার ভাটিয়ালী গানের পরিবেশন রীতিটিকে আরো বেশি আকারে মানুষের কাছে আবেদনময় করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল হিসেবে খ্যাত সিলেট ও নেত্রকোণা এলাকার ভাটিয়ালী গানে এ ধরনের স্বর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়ালীকে প্রথমে নেয়ে বা নাইয়ার গানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ভাটির নাইয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে গান গাইতে গাইতে নৌকা বেয়ে ছুটে আসছে। গ্রামের কোন নারীর উদ্দেশ্যে এটি গীত হতে পারে। এ ধরনের কোন না কোন বিষয় ভাটিয়ালী গানে ক্রীয়াশীল থাকে। কিন্তু নামের সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধ টানা যায় না। এটির তেমন মিল লক্ষ্য করা যায় না। ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের গান, ছন্দোবিহীন টানা অবরোহী যার সুর, আরম্ভ তারস্বর থেকে। মাঠ, নদী, গাঙ, খাল, বিল প্রভৃতি এলাকার টানা সুর। যে গাইছে সে শুনছে, গায়ক ও শ্রোতা গায়েন নিজেই।[৪] ভাটিয়ালী গান নদী-নৌকা কেন্দ্রিক হলেও লোকালয়ে এসে তালের সঙ্গে মিশে লোকালয়ের জনপ্রিয় কোন গীতিধারার অবলম্বনও হয়ে উঠেছে। ভাটিয়ালী বৃহৎ বাংলার পূর্বাংশ বর্তমান বাংলাদেশেরই গান। বিশেষ উচ্চারণ ও ভাষার প্রয়োগরীতি এ গানকে কয়েকটি আকারভেদ প্রদান করেছে। সুষঙ্গী, ভাওয়াল্যা, বাখরগঞ্জ্যা, গোপালগঞ্জী, চানপুর্য্যা, সিলোটি ইত্যাদি। উচ্চারণের কায়দাকে লহর বা উচ্চ স্বরযুক্ত সুরে সাজানো হয়। লহর বা টানের বর্ণনা বিচ্ছেদী, সারি, ঝাঁপ, ফেরুসাই আকারে প্রকাশ পায়। টানা সুরে বিচ্ছেদী লহর, দ্রুত তালে সারি লহর, হঠাৎ করে সুর অনেক চড়ে গেলে তা ঝাঁপ এবং বাকী সুর বা ইচ্ছামত সুরের বিচরণকে বলা হয় ফেরুসাই। লহরটি সাধারণত বাক্যের শেষ অথবা একেবারে প্রথম স্বরটিই লহরের অন্তর্গত।

লহরে তেমন কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ না থাকলেও যাকে উদ্দেশ্য করে ভাটিয়ালী গীত হয় মূলত তার কথাই আবেদনের সুরে প্রকাশ করা হয়। ভাটিয়ালীকে কেউ কেউ পুরুষ কণ্ঠের গান বলেছেন তবে কেবলমাত্র বিবাহের গানগুলো ছাড়া অন্য সকল গানকে চাষির বা যারা গৃহের বাইরে কাজ করেন তাদের গান বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে পালাগানের কয়েকটি রীতি যেমন- হলদ্যাফাটা, সাইগোরী বা সাওরী ও মুড়াই। হলদ্যাফাটা চট্টগ্রামের পালা গান মুড়াই ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলের গীতি। বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রায় সমগ্র গীতরীতির মধ্যে এ গানের দোলা লক্ষ্য করা যায়। সাইগরী বা সাওরী দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে নদীর মাঝিদের গান হিসেবেই পরিচিত। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বেশ কিছু গান এ সুরের দ্বারা প্রভাবিত। ভাটিয়ালী গানে বাক্যের যেখান থেকে আহবানসূচক কোন শব্দের ব্যবহার দেখি সেখান থেকেই তারসপ্তকের গান শুরু করা হয়। তারসপ্তকের মধ্যম, গান্ধার হয়ে এ সকল শব্দে সুরের ব্যবহার মুদারার সা তে এসে দাঁড়ায়। অথবা তারসপ্তকের র্সা থেকে সুর শুরু হয়ে উদারার ধা্ তে এসে দাঁড়ায়। সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে গানের প্রথম দুটো কলিতে বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ অংশে তাল প্রয়োগের বিষয়টি অনেকটা গৌণ থাকে। তবে গান তার ছন্দোবদ্ধ রীতিকে ধারণ করলে দুই, চার অথবা তিন মাত্রার তালকে আশ্রয় করে তা গীত হয়। গানের বহু কলিতে প্রথম অন্তরার সুর উচ্চারিত হয়। তবে কথার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থের কারণে তা বিরক্তিকর মনে হয় না। ভাটিয়ালীর অন্তর্গত সুরের গানকে অনেকে শুধুমাত্র বিচ্ছেদের গান হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বিরহ প্রকাশক এ ধরনের গানকে পুরুষ কণ্ঠের গান হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণ স্বরূপ বলেছেন ভাটিবাংলা বা গ্রামীণ জীবনে সমাজের ও ধর্মীয় নানাবিধ নিয়মনীতির ফলে নারীদের উচ্চস্বরে সঙ্গীত পরিবেশনের বিষয়টি অনেকাংশেই অননুমোদিত ছিল।

ময়মনসিংহ গীতিকার পরিবেশনরীতির ক্ষেত্রেও আমরা তার প্রভাব দেখেতে পাই। গীতিকা পরিবেশনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রের ব্যবহার থাকলেও কেবলমাত্র পুরুষেরাই তা পরিবেশন করে থাকে। ঘাটু গানে ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় ও গান পরিবেশন করে থাকে। তাছাড়া ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে যে সকল ধর্মে নৃত্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ সেই ধর্মেরই রীতি পালনের সময় 'জারি' গানের মধ্যে নৃত্যের ব্যবহার দেখা যায়। মুর্শিদি মূলত বাউল প্রভাবিত ইসলামী ধারার গীত হলেও তা ভাটিয়ালী সুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গীত হয়। ভাটিয়ালী সুরের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রভাব থাকলেও জনপ্রিয়তার কারণে এর ব্যবহার প্রায় সকল ধারার গানে কোন না কোন ভাবে হয়েছে। বিয়ে ও কর্মসঙ্গীতের ধারায় এটি মিশ্রিত হয়ে নারী সমাজের দোরগোড়ায় সুরের সাবলীল চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। বাংলার বাউল ও মরমি

Dhaka University Institutional Repository

সাধকগণ এ ধারার গানে রচনা করেছেন সাধন সঙ্গীত। সুরের সহজ-সরল চলন ও সাবলীল বাণী বৈশিষ্ট্যের কারণে ভাটিয়ালী গান সমগ্র বাংলা গানেরই একটি বড় সুরের আশ্রয় হিসেবে পরিচয় পেয়েছে।

Z_¨wb‡'k

১. বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, জুন- ১৯৮২, পৃ. ১৪৭।

২. ভাটিয়ালি গান, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা- ২০০২, পৃ. ৯।

৩. প্রসঙ্গ বাংলা গান, করুণাময় গোস্বামী, অনুপম প্রকাশনী- ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৭।

৪। লোকসঙ্গীত জিজ্ঞাসা, সুকুমার রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mv‡b fvlv I ¯‡ii c‡qvM

ভাটিয়ালী গান বাংলা ভাষায় রচিত এদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে একটি অন্যতম পরিচিত ও জনপ্রিয় গীতিধারা। তবে অঞ্চলভেদে এ গানে ভাষার ব্যবহারে কিছুটা হলেও তারতম্য দেখা যায়। ধ্বনি সমষ্টির অর্থপূর্ণ রূপই হলো ভাষা। মনের ভাব প্রকাশের জন্য মনের চিন্তার প্রতিফলন ভাষায় প্রকাশিত হয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার প্রয়োজন। একক সত্তার জন্য ভাষার প্রয়োজন পড়ে না। 'ঐ দ্যাখো কে যায় রে নিশান টাঙ্গাইয়া নাও বাইয়া' ভাব প্রকাশের এই যে মাধ্যমটি তা বাঙালি সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। অন্যভাষা ও সম্প্রদায়ের জন্য উদ্ভব হয়েছে অন্য ভাষাসহ ভিন্ন রীতিনীতি। সুতরাং একই ভাষারীতি বা চলন অন্য দেশে কার্যকর হবে এমন নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সমষ্টি থেকে উদ্ভুত ভাষাই ভিন্ন প্রদেশের বা জাতির ভাষা হিসেবে গণ্য হয়। আর সে অঞ্চলের মানুষও ঐ বিশেষ ধরনের ভাষার চলনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যার ফলে এক সময় ঐ রীতিটিই হয়ে যায় নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের নিজস্ব ভাষা। বাংলা ভাষাভাষী এবং ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় এটি ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সমূহে যে ভাষারীতি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, শাব্দিক ব্যঞ্জনাসহ বাকভঙ্গি বর্তমান, তার মধ্যেও তারতম্য আছে। ভাষা বাংলা হলেও, আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যে মূলভাষা থেকে এর রূপ পৃথক হয় বলেই একে আঞ্চলিক উপভাষা বলা হয়েছে। উপভাষাতেও ভাষান্তর ঘটে। উপভাষাঃ মূলভাষা বা সাহিত্য ভাষা থেকে ধ্বনিগত, রূপগত, বাগধারাগত পার্থক্য নিয়ে প্রচলিত। একই ভাষার মধ্য থেকে আঞ্চলিক ব্যবধানে গড়ে উঠে এক একটি উপভাষা। ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন ৫-৮ কিলোমিটার স্থান ব্যবধানে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।[১]

লোকসমাজে যেভাবে ভাষার পরিবর্তন হয় একইভাবে লোকসংস্কৃতিতেও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অঞ্চলভেদে যে ভাষারীতি প্রচলিত তার রূপ ও গঠনশৈলী ভাটিয়ালী গানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে এ সঙ্গীত চর্চাকারী জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক সীমানার সাথে বেশ সম্পর্ক রয়েছে। কোন কোন তাত্ত্বিকের মতে সঙ্গীতের উৎপত্তি কথা-রচনা থেকে অথবা আবেগের (Emotion) প্রকাশ থেকে। এই দুই'ই আকস্মিক অনুভূতির প্রকাশ বা উচ্চরোল (চীৎকার)। আদিম মানুষ যখন কিছু বক্তব্যের সন্ধান পেয়েছে, তাকে সুরে প্রকাশ করেছে। এই অবস্থায় বিশিষ্ট অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি অবলম্বনে লোকগীতি গঠিত। ভারতের পূর্বাঞ্চলের উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রভৃতি সর্বত্রই আদিমগান বা লোকগীতি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই বিশিষ্টতা ফুটে উঠে আদিম বা গ্রামীণ ভৌগোলিক-প্রকৃতির প্রতিফলনে, সমাজ ও রীতিনীতির নিয়ম পদ্ধতির জন্যে এবং অঞ্চলের ভাষা-প্রকৃতি ভৌগোলিক ছাপ

ধারণে।[২] বর্তমান বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে স্থানের পার্থক্যের কারণে ভাষার উপস্থাপনায় বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর মূল কারণ হিসেবে অনেকে ১৯৪৭ এর বাংলা ভূ-খণ্ড বিভক্তের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আসাম অঞ্চলের ভাষা বাংলাভাষী জনসাধারণকে হয়তো এক সময় একই ভাষার দুটি উপভাষা হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্তু রাষ্ট্র বিভাগ ও প্রশাসনিক পার্থক্যের কারণে উপভাষারীতি থেকে তা দুটি স্বতন্ত্র ভাষারীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার ভাষা প্রায় একই। এটিও একই বা মূল ভাষার দুটি উপভাষা। দুটি ভাষার ভাবগত বিষয়াবলী একই ধরনের থাকলেও তারতম্য বৃদ্ধি পেয়ে বোধগম্যতার সীমানা অতিক্রম করলে তা স্বতন্ত্র ভাষারীতি হিসেবে স্থান পায়। তবে ঘরোয়া ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যে ভাষায় মানুষ একে অপরের সাথে আলাপ বা কথোপকথণ করে থাকে সাহিত্যে সে ভাষা অনেকটা গৌণ হিসেবে স্থান পায়। আবার লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ও লোক রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা মানুষের মুখের ভাষাই সৃষ্টিকর্মের মূল উপজিব্য বিষয় রূপে দেখা যায়। এমনকি কোন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমও অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষারীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে দেখা যায়। লোকসঙ্গীতের ভাব ও আবেগ প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষারীতির যেমন আবেদন রয়েছে তা সাধুরীতির বাংলা ভাষায় প্রকাশ করলে মূল বিষয়বস্তু অনেকটা শ্রীহীন হয়ে পাড়ে। আঞ্চলিক ভাষারীতির ভিত্তিতে রচিত এমন গানের উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীহট্ট বা সিলেট ঃ কানাই তুমি খেউড় খেলাও কেনে, রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই খেউর খেলাও কেনে।

চট্টগ্রাম ঃ ও সাধের তালতো ভাই, তোঁয়ারে কইলাম নাইওর নিতারে, না নিলা কিল্লাই।

অথবা- বানুরে, কি কি কি? আই যাইয়ুম ঢাহার শহর তোরলাই আনুম কি?।

ঢাকা ঃ কালাচান বাবড়ী ওয়ালা, পান খাবি তো পয়সা ফালা।

অথবা- বুকে চাক্কু মাইরা চইলা গেলি কালাচান।

যশোর ঃ গিরাম (গ্রাম) বেড়ে অগাধ পানি, নাই কিনারা নাই তরণি পারের।

খুলনা ঃ নাতি খাতি বেলা গেলো শুতি পারলাম না।

বরিশাল ঃ সব দেখতে আছি, সব বোঝতে আছি, কিছু কইতে আছি না।

ভাষার এ রকম পরিবর্তন সম্পর্কে পবিত্র সরকার বলেছেন- কোন ভাষাই সেই অর্থে একটি অভিন্ন বৈচিত্র্যহীন, সুসংহত রূপ নয়। একটা ভাষার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক ভাষা।[৩]

অনেক ভাষা বলতে সেই রীতিকে বলা হয়েছে যা এদেশের গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত। বরিশালের সাথে দিনাজপুরের গ্রামের ভাষার বিস্তর পার্থক্য দেখা যেতে পারে। এটিই তাদের মাতৃভাষা এবং উভয় ব্যক্তিই নিজেকে বাংলাভাষী হিসেবে দাবি করতে পারেন। স্থান ভেদে ভাষার মধ্যে এমন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দের মধ্যে বা শেষে ই-কার কিংবা উ-কার থাকলে ই কিংবা উ-কারের অপিনিহিতি ঘটে। যেমন-

আজি = আজ = আইজ, কালি = কাইল, রাতি = রাইত, রাখি = রাখিয়া = রাইখ্যা, দেখিয়া = দেইখ্যা, শুনিয়া = শুইন্যা, সাধু = সাউধ, মাছ = মাউছুয়া ইত্যাদি।

স্থানের পার্থক্যের কারণে এমন উচ্চারণ ভাটিয়ালী তথা লোকগানের ভাষারীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। যেমন- বাক্য = বাইক্য, ধান্য = ধাইন্য, যজ্ঞ = যইগ্যঁ,

কোথাও কোথাও মৌখিক ভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার দেখা গেলেও ভাষার লিখিত রূপে এসে তা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন- ড়-এ উচ্চারণ হয় র, ঢ়-এ উচ্চারণ হয় রহ, এ হয়ে যায় এ্যা। ‘পইড়া’ থেকে উচ্চারণ হবে পইর‍্যা, ‘আষাঢ় মাসে’ উচ্চারণ হবে ‘আষার মাইস্যা’ এ রকম আরো বেশ কিছু শব্দ যেমনঃ দেশ = দ্যাশ, কেশ = ক্যাশ, তেল = ত্যাল, বেল = ব্যাল।

আইলা না আইলা না বন্ধুরে, ও বন্ধু রইয়াছো বিদ্যাশ

তোমার লাইগ্যা বন্ধু সুনার যৈবন করলাম শ্যাস রে।

ও-কার যুক্ত শব্দের উচ্চারণ উ-কার হয়ে যায়, যেমনঃ কোন = কুন, তোমার = তুমার, চোর = চুর, পরিতোষ = পুরিতুষ ইত্যাদি।

অপিনিহিতি থেকে উদ্ভুত ই-কার বা উ-কার এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার রূপের পরিবর্তন ঘটায়। স্বর-ধ্বনির এই পরিবর্তনকে অভিশ্রুতি বলা হয়।[৪]

পূর্ববাংলার ভাষারীতির মধ্যে এমন অপিনিহিতির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে বাংলা সাহিত্যে সেটি মানসম্পন্ন চলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। সেখানকার মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষাভাষীর কাছে অনেকটা সহজবোধ্য। যেমনঃ আসিয়া = এসে, কইন্যা = কনে, বাইদ্যা = বেদে, নইদ্যার = ন’দের ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিছু অংশসহ সিলেটের একটি বৃহৎ এলাকা এর অন্তর্গত। ভাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারীতিতে উচ্চারণের তারতম্য থাকার পরও অন্যান্য এলাকার মতো সে ভাষায় একই বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। ক এর স্থলে খ অক্ষর এর ব্যবহার ও খ এর স্থলে ক এর বিপরীতমুখী ব্যবহার সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। যেমন-

কালা কাজলের পাখি দেইখ্যা আইলাম কই

জলে গিয়াছলাম সই।

এই দু'চরণের উচ্চারণ করা হয়-

খালা খাজলের ফাকি দেইক্যা আইলাম খই

জোলে গিয়াছিলাম সোই।

ভাটিয়ালী গান সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় গীতরীতি হলেও এটিকে মূলত পূর্ববাংলার গান বা ভাটিয়াল মুলুকের গান হিসেবে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে। গানের কথাগুলির বেশির ভাগই উদাস করা। বিরহ, ব্যথা, দুঃখ নিয়েই এই গান তৈরি। কেহ কেহ মনে করেন 'ভাটি' শব্দ থেকেই ভাটিয়ালী কথাটি এসেছে। ভাটির টানে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিয়ে এ গান গায় বলেই এ গানের ঐরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ গানের সুর টানা টানা- বাঁধা তাল নেই। একক সঙ্গীত হিসেবেই এ গান প্রচলিত।[৫] একক গান হওয়ার ফলে আঞ্চলিক ভাষার বাইরে এসে, কারো কাছে উপস্থাপন করার বিষয়টি এখানে না থাকায়, গায়ক তার নিজের ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। ফলে সুর বিস্তারের মতো আঞ্চলিক কথার প্রভাব পড়েছে ভাটিয়ালী গানের সর্বাঙ্গজুড়ে।

বাঙালির ভাষার গঠন দেখলে বোঝা যায় যে, এখানকার ভাষা-গোষ্ঠী এবং নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ একত্র মিলিত হয়ে হাজার বছরের চর্চায় বাঙালিয়ানাকে গ্রহণ করেছে, গড়ে তুলেছে একক বাঙালি জাতিসত্তা। নানাবিধ আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, অভ্যাসের মধ্যদিয়ে এই সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর বাঙালির সংস্কৃতি বললে অবশ্যই এই সকল বিষয়কে বোঝানো হবে। তবে কেউ কেউ সংস্কৃতির অন্য সব বিষয়ের সাথে ভাষাকে মিলিয়ে না দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে- বাংলা ভাষা হচ্ছে বাঙালির ভাষা, বাঙালির মাতৃভাষা। কিন্তু তা বাঙালি জাতির মতো একটি মিশ্র সত্তা নয়। বাঙালি জাতির মধ্যে আর্য, দ্রাবিড়, নিষাদ, কিরাত এই সব উপাদান মিশে থাকলেও আর্য উপাদানটি নিতান্তই অল্প।[৬] বাংলা ভাষায় নিষাদ, কিরাত, দ্রাবিড় অর্থ্যাৎ দেশি উপাদানের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করার মত। এর সাথে ইংরেজি, ফরাসি, আরবী, পুর্তগীজ ভাষারও সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলা ভাষার লিখিত রূপকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১। সাধু ভাষা ২। চলিত ভাষা (মান্য চলিত বা শিষ্ট

ভাষা)। সবচেয়ে বেশি ভাষারীতির হেরফের দেখা যায় কথ্যরীতির বেলায়। কথ্যরীতিকে এ কারণে সুনির্দিষ্ট কোন ধরনের ব্যাকরণসম্মত ভাষারীতি বলা হয় না। এখানে ভাবের সাথে আঞ্চলিকতার প্রভাব মিশ্রিত হয়ে নতুন ধারা তৈরি করে তোলে। এ ধরনের প্রায় পাঁচটি উপভাষা পাওয়া যায়। ১. কামরূপী ২. বঙ্গালি ৩. বরেন্দ্রী ৪. রাঢ়ী ৫. ঝাড়খণ্ডী।[৭] ধর্মভেদেও ভাষার ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়। একই জিনিষের নাম কোথাও 'পানি' আবার কোথাও 'জল', কোথাও বলা হয় 'নাস্তা' কোথাও বলা হয় 'জলপান'। তবে গানের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে কবিগণ এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টির ব্যবহার করেছেন যাতে মনের ভাব প্রকাশে কোন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়নি। ভাটিয়ালী গান মূলত বাংলা ভাষায় রচিত। তবে এর সুর বাংলার সীমানাকে অতিক্রম করে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য গীতরীতির সঙ্গেও মিশেছে।

বাংলার সঙ্গীত চক্রাকারে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের ইন্টারঅ্যাকশনে লাভবান হয়েছে। রাগসঙ্গীতের প্রাণশক্তি যখন অতি ব্যবহারে ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে লোকসঙ্গীতের ভাবসম্পদ ও সুর সম্পদ তাকে উজ্জীবিত করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সুবর্ণ যুগের শেষে সুদীর্ঘ হিন্দুস্থানি কচকচানির পর রবীন্দ্রনাথ বাংলার সঙ্গীতকে বাঙালি করে তুলেছিলেন এই বাউল ভাবসম্পদ ও সুরসম্পদ দিয়ে। বাংলাদেশের অতি আধুনিক তরুণ সমাজে অতি জনপ্রিয় গানের ভাষা বাংলা। ভাষা বাদ দিয়ে এর সঙ্গীত বাজালে এর পরিচয় আর যা হোক বাংলা হবে না।[৮] বিষয়ের বিবেচনায় বাংলা ভাষায় রচিত অনেক ধরনের গান থাকলেও ভাটিয়ালী একটি সতন্ত্র রীতি বা ঘারানা হিসেবে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভাষার বিচারে এটি বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ও মনের ভাষায় সমৃদ্ধ হয়েছে। ভাটিয়ালী গান উঁচু ও নিচু দুই ধরনের স্বরেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ গানের কথাকে প্রাধান্য দিয়েই শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। তবে লোকভাষা এর গানের মূল বৈশিষ্ট্যকে সুসংহত করেছে। লোকমানসে এদেশের গ্রাম-বাংলার প্রতি যে ভালোবাসা সুপ্ত আছে তা এদেশের লোকসংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যদিয়ে ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, ভাটিয়ালী এর অন্যতম ধারক হিসেবে পরিচিত।

Z_¨wb‡'k

১। দিনেন্দ্র চৌধুরী, ভাটিয়ালী গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র- ২০০২, কলকাতা, পৃ. ৯৪।

২। সুকুমার রায়, লোকসংগীত জিজ্ঞাসা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৯৮৩, পৃ. ২১।

৩। দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৫। বুদ্ধদেব রায়, হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা-২০০০, সঙ্গীত পরিচয় অংশ।

৬। অনিমেষকান্তি পাল, লোকসংস্কৃতি, কলকাতা-২০০৯, পৃ. ২৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৮। করুণাময় গোস্বামী, প্রসঙ্গ বাংলা গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ৭২-৭৩।

cÂg Aa¨vq

fvwUqvjx Mv‡bi weKvk, mi I ivM i‡ci cwiPq

আমাদের লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী গান ও এর সুর একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা লোকগানের ধারায় ভাটিয়ালী গানের চর্চার ইতিহাসও দীর্ঘ দিনের। এদেশের প্রায় সকল প্রকার লোকধারার গান কোন না কোন ভাবে ভাটিয়ালী সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় সঙ্গীত সাধনায় এ সুর চর্চিত হয়েছে খুব সাবলীলভাবে। ভাটিবাংলার এ সুর মানুষের মনকে যেমন বিষণ্নতায় ভরে দেয় তেমনি হৃদয়ে তোলে দারুণ হাহাকার, যা প্রাণ থেকে প্রাণে ছড়িয়ে যায়। আমাদের সমগ্র সঙ্গীত দুইভাবে বিকশিত হয়েছে। তার একটি হল রাগসঙ্গীত অন্যটি লোকসঙ্গীত। একটি ব্যাকরণ সম্মতভাবে বিকশিত হয়েছে অন্যটি সুর রূপকে ধারণকরে বিস্তার ও বিকাশ লাভ করেছে। কোন কোন লোকসঙ্গীতের সুরকে নবরূপে সুর কাঠামোর মধ্যে এনে রাগসঙ্গীতে রূপান্তর করা হয়েছে। কোথাও রাগসঙ্গীতের জনপ্রিয় সুরের আবেশে লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে এদেশের গীতরীতিতে এ দুই ধারার পথ চলা। ভাটিয়ালী এদেশের লোকসঙ্গীতে একটি জনপ্রিয় রীতি যেটি কখনো নিজে রাগ হিসেবে পরিচয় পেয়েছে আবার কখনো সমগোত্রীয় রাগরীতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। ভাটিয়ালী সুরটি বা এ নামে আদৌ কোন প্রকার রাগরূপ ছিল কি না সে বিষয়েও অনেক সময় প্রশ্ন উঠেছে। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন রীতি সমূহে ভাটিয়ালী বা এর কাছাকাছি রাগরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কখন থেকে এর ব্যবহার শুরু সে বিষয়ে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। রাগ হিসেবে বাংলা গীতসাহিত্যে ভাটিয়ালীর ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্তী একাধিক আলেখ্যগীতি গ্রন্থে ভাটিয়ালীর ব্যবহার আছে। কিন্তু তার পরই রাগ হিসেবে ভাটিয়ালীর ব্যবহার আর কোথাও পাওয়া যায় না। বরং ভাটিয়ালীকে পাওয়া যাচ্ছে বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে।[১] প্রাচীন বাংলার যে সকল সঙ্গীত ও সাহিত্য গ্রন্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে 'বঙ্গাল' নামে একটি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রচয়িতা ভুসুকুপা। তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এলাকার নাম অনুসারে রাগের এমন নামকরণ হতে পারে এমনটি অনেকে মনে করেন। বঙ্গাল রাগকে কেউ কেউ ভাটিয়ালী রাগের আদিরূপ হিসেবে মনে করেছেন। তবে এটির বিষয়ে যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধ দোহাগীতিতে ভাটিয়ালী রাগের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাটিয়ালী (ভাটিআলী) রাগের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের জনপ্রিয় সুর-রীতি হওয়ায় একদিকে নিজেই বিকশিত হয়েছে অন্যদিকে নানা ধরনের লোকসঙ্গীতের ধারায় সংমিশ্রণের

ফলে এর সুর লোকসঙ্গীতে একটি নিজস্ব ঘারানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ভাটিয়ালী প্রভাবিত বা সমগোত্রীয় বঙ্গাল রাগের গঠন নিম্নরূপ-

আরোহ : স ঋ গ ম প দ র্স

অবরোহ : স দ প ম গ ম ঋ স

বাদী স্বর : দ

সমবাদী স্বর : ঋ

জাতি : ষাড়ব

ঠাট : ভৈরব

সময় : দিবা প্রথম প্রহর

বঙ্গাল রাগের প্রায় কাছাকাছি এমন আরেকটি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীত রীতিতে বর্তমানে ভৈরব রাগ বেশ জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। বঙ্গাল-ভৈরব নামে একটি রাগের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, যার সুর ভাটিয়ালী সুরের সমগোত্রীয় এটির গঠন নিম্নরূপ-

আরোহ : স ঋ গ ম প দ র্স

অবরোহ : র্স দ প ম গ ম ঋ স

বাদী স্বর : ম

সমবাদী স্বর : স

জাতি : ষাড়ব

ঠাট : ভৈরব

সময় : দিবা প্রথম প্রহর

ভাটিয়ালী গান মূলত একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক। যিনি গায়ক তিনিই শ্রোতা। যার কারণে এ গান পরিবেশনার সময় বাদ্যযন্ত্রের খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। গায়ক তার নিজের মত করে কতগুলো শব্দ সাজিয়ে নেন এবং সেখানে দীর্ঘসুরে উচ্চ টানে মনের ভাব প্রকাশ করেন। চড়া সুরে লম্বা টান শেষে সুর খাদে নেমে আসে। এই দীর্ঘ টানটি ভাটিয়ালী গায়কের দম ও মর্জির উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। গানের বিষয়

অনুসারে ভাটিয়ালীর সুর প্রধানত করুণ। প্রেমের গানে বিরহ-বিচ্ছেদ এবং আধ্যাত্মিক গানে অনিত্য সংসারের হতাশা-নৈরাশ্য এবং ঈশ্বরকে না পাওয়ার শূন্যতা-বেদনা প্রকাশ পায়। গায়কের আবেগ মথিত চিত্তদীর্ণ এই কান্না দীর্ঘস্থায়ী হয়না। এজন্য ভাটিয়ালী গানের অবয়ব ক্ষুদ্রকার হয়। অনেক গান স্থায়ী ও অন্তরা দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তবে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী যুক্ত গানেরও দৃষ্টান্ত আছে। সারিগান বর্ণনাত্মক, এতে ঘটনার বা জীবনচিত্রের বর্ণনা থাকে। এজন্য আকারে বড় হয়। ভাটিয়ালী ভাব-প্রধান গান, উপরন্তু তা বিষাদাত্মক। অতএব ভাটিয়ালীর বাণী সংক্ষিপ্ত।[২] ভাটিয়ালী সুর প্রধান গান। সুরের কাছে কথাগুলো উপভোগ্য হয়ে উঠে। আবেদনের বাণী সুরের পরশে এসে আরো আবেদনময়ী হয়ে উঠে। আমাদের চিরায়ত গীতরীতিতে কথা ও সঙ্গীতের মিলন দেখা গেলেও ভাটিয়ালী গানের ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র সুরের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। ইহার প্রথম কয়েকটি শব্দ এক সঙ্গে গীত হইবার পর ইহার সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকে, এই দৈর্ঘের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমান নাই, গায়কের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী ইহা যে কোন সীমায় গিয়া পৌছতে পারে। প্রারম্ভ পদটি সর্বাপেক্ষা চড়া সুরে উচ্চারিত হইবার পর পরবর্তী পদগুলির ভিতর দিয়া তাহা কখনও ক্রমে কখনও বা আকস্মিকভাবে খাদে নামিয়া আসে। ভাটিয়ালীর সমস্ত জোর গিয়া প্রথম পদটির উপরই পড়ে এবং প্রথম পদটির ভাবই ক্রমে অন্যান্য পদগুলির মধ্য দিয়া নিম্নতর সুরে প্রকাশ পায়।[৩]

ভাটিয়ালী গানের গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় এটি বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম গীতধারার মধ্যে পড়ে। কথার প্রয়োজনীয়তা এখানে কম বলে রাগসঙ্গীতের মত এর আঙ্গিকরূপ এমন ছোট হয়। ভাটিয়ালী গানের কথায় এর লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। গানের কথায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভণিতা অনুপস্থিত। ভণিতাহীন গানগুলো অন্যান্য ভাটিয়ালী গানের চেয়ে ছোট আকৃতির হয়। তবে ভণিতাযুক্ত বা লেখকের নাম উল্লেখ আছে এমন ভাটিয়ালী গানের কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়। কখনো তা অনেক বড় ও বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। ভাণিতাহীন গান নিম্নরূপ-

নদীর কূল নাই কিনার নই রে

ও আমি কোন কূল হতে কোন কূলে যাব, কাহারে শুধাই রে।

ও পারে মেঘের ঘটা কনক বিজলী ছটা, মাঝে নদী বহে সাই সাই রে

আমি এই দেখিলাম সোনার ছবি আবার দেখি নাই রে।।

বিষম নদীর পানি ঢেউ করে হানাহানি, ভাঙা এ তরণি তবু বাইরে

আমার অকূলের কূল দয়াল আল্লার যদি দেখা পাই রে।।

ভণিতাযুক্ত গান হচ্ছে-

ভাটিয়ালী ভাবরসে সিক্ত এমন ভণিতাযুক্ত গান যেটি প্রাচীন ধারাশ্রয়ী, সেটি ভণিতাহীন গানের চেয়ে গঠনে বড় আকৃতির হয়ে থাকে।

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়, বন্ধুয়ারে কর তোমার মনে যাহা লয়।

নিঠুর বন্ধু রে বলেছিলে আমার হবে

মন দিয়াছি এই না ভেবে, সাক্ষী কেউ ছিল না সেই সময়

সাক্ষী শুধু চন্দ্র-তারা এক দিন তুমি পড়বে ধরা রে বন্ধু

ত্রিভূবনের বিচার যেদিন হয়।

নিঠুর বন্ধু রে, দুঃখ দিয়া হিয়ার ভিতর একদিন ও না লইলে খবর

এই কি তোমার প্রেমের পরিচয় ও বন্ধু রে

মিছামিছি আশা দিয়া কেন বা প্রেম শিখাইলা রে বন্ধু

দূরে থাকা উচিত কি আর হয় রে বন্ধু।

নিঠুর বন্ধু রে, বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া তোমার প্রেম বিকি দিয়া

করবো না প্রেম আর যদি কেউ কয়, ও বন্ধু রে

উকিলের হয়েছে জানা কেবলি চোরের কারখানা রে বন্ধু

চোরে চোরে বেওয়াইয়ালা হয় রে বন্ধু।

ভাটিয়ালী গান সম্পূর্ণ রূপে অশ্লীলতা মুক্ত। সারি কিংবা অন্যান্য আঞ্চলিক গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বা জলভরণের বিষয়কে কেন্দ্র করে যে ধরনের গান পরিবেশিত হয় সেখানে অশ্লীলতার ছাপ কিছুটা হলেও পাওয়া যায়। তবে এর মাত্রা কোনভাবেই সমাজের মার্জিত রুচিকে অতিক্রম করেনি। কবি ও সঙ্গীত সাধকদের বেশিরভাগই তাদের সাধনা বা তত্ত্বমূলক গানগুলো রচনা করেছেন ভাটিয়ালী সুরে। দার্শনিক চিন্তার পাশাপাশি এ সকল গানে ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ও যুক্ত থাকার কারণে এ সুরের সাথে অশ্লীল বা অমার্জিত কোন বিষয়ই সহজে যুক্ত হতে পারেনি। মানব জীবনে ঘটে যাওয়া ভুল-ভ্রান্তির জন্য এ গানের সুরে সৃষ্টিকর্তার কাছে কান্না বা বেদনার সুরে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। বাংলা লোকসঙ্গীতে অনেক জনপ্রিয় ধারা দেখতে পাওয়া গেলেও নির্দিষ্ট গোত্র বা জাতিভুক্ত না হয়ে সকল মানুষের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠা একমাত্র ভাটিয়ালী সুরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। ভাটিয়ালীর সুর বা স্বররীতি প্রধানত তিনটি। শুদ্ধ স্বরযুক্ত ভাটিয়ালী যা বিলাবল ঠাটের পর্যায়ে পড়ে, কোমল নিষাদ যুক্ত ভাটিয়ালী যা খাম্বাজ ঠাটের পর্যায়ে পড়ে ও কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ যুক্ত ভাটিয়ালী যা কাফি ঠাটের পর্যায়ে পড়ে। এই তিনটি সুর পর্যায়কে কেন্দ্র করেই বাংলার নানা অঞ্চলে ভাটিয়ালী গানের বিকাশ ঘটেছিল।[৪] বেশিরভাগ লোকগানের জাতি ঔড়ব বা পঞ্চস্বরের হয়ে থাকে, তবে

ভাটিয়ালী গানের বেলায় আমরা সাতটি স্বরের ব্যবহার দেখতে পাই। সাতটি স্বরের এমন ব্যবহার লোকসঙ্গীতের ধারায় ভাটিয়ালীর স্থানকে আরো সুসংহত করেছে। পূর্ববাংলার ভাটিয়ালী গানে কোমল স্বরের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। এটিকে গবেষকগণ খাম্বাজ ঠাটের অর্ন্তগত ঝিঁঝিট রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আরোহ : স র ম প ধ র্স

অবরোহ : ণ ধ প ম, র্স ণ ধ

পূর্বাঙ্গে 'ধ' তে এমন বিশ্রাম নেওয়ার বিষয়টিকে সঙ্গীত রসিকগণ কৌসুলি ঝিঁঝিটের রূপ হিসেবে দেখেছেন। এই ধরনের স্বর কাঠামোর উপর ভিত্তি করে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালীর ভিত্তি রচিত হয়েছে।

আমি বন্ধের প্রেম আগুনে পোড়া, সই গো

আমি মইলে পোড়াসনে তোরা।

সই গো সই, যে দিন বন্ধু ছেড়ে গেছে

সেদিন পোড়া দিয়ে গেছে, সে পোড়াতে হয়েছি আঙ্গেরা

শোন বলি গো প্রাণ সখি পুড়িবার কি আছে বাকি

পোড়া জিনিস কি পোড়াবি তোরা, সই গো।

সই গো সই, আমায় তোমরা না পোড়াইও, যমুনাতে না ভাসাইও

তমাল ডালে বেঁধে রাখিস তোরা

বন্ধু যদি আসে দেশে বলিস তোরা বন্ধুর কাছে

তমাল ডালে বাঁধা আছে তোমার প্রেমের মড়া।

সই গো সই, বনের আগুন সবাই দেখে, মনের আগুন কেউ না দেখে

থেকে থেকে জ্বলছে এতক্ষণ

আমি জ্বলে পুড়ে হলেম যে ছাই, পুড়িবার আর অন্ত যে নাই

পোড়া জিনিস যায় কি কখনো পোড়া।

বেশিরভাগ ভাটিয়ালী গানে শুধুমাত্র স্থায়ী এবং অন্তরা থাকে। তবে অনেক গানে সঞ্চারী অংশও দেখা যায়। সঞ্চারী অংশের সুরটি সাধারণত নিচে নেমে যেতে দেখা যায়। এ সময় খাদের স্বরটি উদারার পঞ্চম স্বরে ছুঁয়ে আসে। উচ্চ স্বরে গীত ভাটিয়ালী গানের এমন রীতি বৈচিত্র্যের কারণে সুরটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। বিষয়বস্তুর দিকদিয়ে ভাটিয়ালী গানের সাথে সারি ও মুর্শিদি গানের সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করে নৌকার মাঝি-মাল্লাকে কেন্দ্র করেই এ দুই রীতির গানের বিকাশ ঘটেছে। ভাবগত মিলের সাথে সাথে সুর-তাল-লয়-পরিবেশনা ইত্যাদির বেশ মিল পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী সুসংহত ও অগ্রসর সমাজের গান। অন্যান্য গীতরীতি মানুষের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও ভাটি গানের মধ্যে দৈনন্দিন বিষয়ের সাথে দর্শন চিন্তার বিকাশ ও চর্চা হয়েছে সমানতালে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালীতে বিচ্ছেদী রসের সঞ্চার হলেও মুসলিমদের আগমনের পর এ ধারা চর্চার পথ আরো সুগম হয়েছে। মুর্শিদি গানে আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক চেতনা যুক্ত হওয়ার পর থেকে দয়াল-স্রষ্টাকে স্মরণ করার জন্য বারবার ভাটিয়ালী গান গীত হয়েছে। দয়াল মুর্শিদের করুণা লাভের আশায় জিকিরের রীতির মত ভাটিয়ালী গানের মধ্য দিয়ে আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের সুর নিয়েই মুর্শিদি গানের সৃষ্টি, আবার মুর্শিদি গানের বিষয় নিয়েও ভাটিয়ালী গান রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের মধ্যে নর-নারীর প্রেম-বিরহ-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তার মাধ্যমে রূপক অর্থে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানবকূলের মিলনের ইচ্ছার বাসনাই ব্যক্ত করা হয়েছে। ভাটিয়ালি গানের গায়ক মাঝি-মাল্লা। নৌকার পাল তুলে দিয়ে হাল ধরার পর মাঝির বিস্তর অবসর। এই অবসর সময়টি অর্থপূর্ণ বাগ্ময় করার মানসে সে সাধারণত: গান করে থাকে- নদীর জলের সাথে, নদীর উন্মুক্ত প্রান্তরের সাথে। নদীর স্রোতের সাথে এ গানের সুর একই সূত্রে গাঁথা। প্রবহমান নদীবক্ষে নিঃসঙ্গ মাঝি অনন্ত নীলাকাশের নৈসর্গিক পরিবেশে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। তার মনের রুদ্ধদ্বার আপনিই আলগা হয়ে যায়। সে গান গেয়ে উঠে। তার কণ্ঠ থেকে যে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল করে তোলে না। সুর তার সচ্ছন্দ গতিতে মাঝির মনের কথার দু-একটিকে মাত্র একেকবারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা টানা পথে ঢেউয়ের সাথে সাথে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।[৫] লোকসঙ্গীতের সাথে রাগসঙ্গীতের তুলনা করতে গেলে রাগ সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ সুর বিচার শুধু একটি গানের কাঠামোতে পাওয়া কঠিন। ভাটিয়ালী গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের আবির্ভাবও খুব কম হয়েছে। তাছাড়া লোকসঙ্গীত পরিবেশনার সময় এর কথার সাথে সঙ্গতি রেখে সুরারোপ করার ফলে রাগ রূপের বিচারটি গৌণই থেকে যায়। তাছাড়া ভাটিয়ালী গানের সুর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেকে কেবলমাত্র নদী বা মাঝির গানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু এর বাইরেও ভাটিয়ালী গানের একটি বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে বাংলা লোকসঙ্গীতে। ভাটি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত সিলেট, ত্রিপুরা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে নয়, এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের আসাম, কাছাড়, দামোদর ও ভাগিরথী নদী তীরবর্তী এলাকাও ভাটিয়ালী গানের

সুর বিচারের মধ্যে পড়ে। পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সুর বৈচিত্র্যের কারণে এর স্বভাবগত পরিবর্তন ও লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন গানের চলন খুব ধীর, কোন কোনটি চঞ্চল। অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক গানগুলোতেও ভিন্ন স্বভাব লক্ষ্যণীয়। কীর্তনের আসরে যে ভাটি সুরের আহাজারি শুনতে পাওয়া যায় সাধারণ ভাটিয়ালীতে তার মেজাজ কিছুটা আলাদা। সাধনা, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্রষ্টার মন জয় করার মতো বিষয়াবলী এ গানের পরিবেশনায় পার্থক্য এনেছে বলে অনেকে মনে করেন। বাংলার জনপ্রিয় লোকপালা নিমাই সন্ন্যাসে বিষয়বস্তুর ভিন্নতায়ও ভাটিয়ালী সুর গীত হয়েছে।

নিমাই দাঁড়ারে, দাঁড়ারে নিমাই

দেখিব তোমারে রে নিমাই।

যখনই জন্মিলি নিমাই নিম্ব তরুতলে

বাছিয়া রাখিলাম নামটিরে (ও নিমাই রে)

ও নিমাই চাঁন তোমারে রে।

কোথা হতে এলো গুরু বসতে দিলাম ঠাই

সেই অবধি নিমাইর মুখে রে (ও নিমাই রে)

নিমাই'র মা বলা ডাক নাই।

দেখ দেখ নগরবাসী দেখ বাহির হইয়া

নিমাই চাঁন সন্ন্যাসে যায় রে (ও নিমাই রে)

ও নিমাই জননী ছাড়িয়া রে।

ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়া জলন্ত অগিনী

আর কত দিন রাখবো তারে রে (ও নিমাই রে)

নিমাই দিয়া মুখের বাণী রে।

স্বরলিপি- (স্থায়ী অংশ)

। া া সা সা । সা রা গা পা । ধা পা মা গা । া ধা ধা ধা । ধা না র্সা না ।

০ ০ নি মাই দাঁ ড়া রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ দাঁ ড়া রে নি ০ মা ই

। না ধা পা ধা । পা ধা ণা পা । ধা পা পা মা । গা া মগা রসা ।

দে ০ খি ০ বো ০ তো০ মা ০ রে ০ নি ০ মা০ ই০ ।

।া সা রে গা । পা ধা পা মা । গা া া । া া া া ।

০ দাঁ ড়া রে । ০ ০ ০ ০ । ০ ০ ০০ । ০ ০ ০০ ।

অন্তরা-

। া া গা গা । া রে সা রা । রে গা গা া । পা া পধা নধা ।

০ ০ য খ ০ নি জ ন মি ০ লা ০ নি ০ মা০ ই০

। া া গা গা । া রা সা রা । রা গা া া । া া া া ।

০ ০ নিম ব ০ ০ ত রু ত লে ০ ০ ০ ০ ০ ০

। া া ধা ধ । া না র্সা না । না া র্সনা ধপা । া ধা া না ।

০ ০ বা ছি য়া ০ রা ০ খি ০ লা০ ম০ । ০ না ম টি ।

। ধনা ধা া া । া পা ধা র্সা । র্সা া া া । র্সা না ধনা পা ।

রে০ ০ ০ ০ ০ ও নি মাই রে ০ ০ ০ । ০ ০ ০০ ০

। পসা নিসা ধনা ধপা । া া পা া । া ধা র্সা র্সা । র্সা রা র্সা নি ।

০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ও ০ ০ নি ০ মাই চা ন তো ০

। দা পা পা মা । া গা মগা রসা । া সা রা গা । পা ধা পা মা ।

মা ০ রে ০ ০ নি মা০ ই০ ০ দাঁ ড়া রে ০ ০ ০ ০

। গা া া া । া া া া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ।

বাংলার মধ্য অঞ্চলে ভাটিয়ালীর এরকম সুরের প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। 'বিলাবল' ঠাটের আধিক্য এখানে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। বহু ধরনের লোক ও আদিম সুর কাঠামো এই রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত বলে জানা যায়। ভাটিয়ালীতে সুরের উত্থান-পতনের সাথে এমন অনেক শুদ্ধ স্বরের

ব্যবহার আছে। এ ধরনের সুর কাঠামোকে কেন্দ্র করে আদিম সঙ্গীতাঞ্চলকেও চিনতে পারা যায়। তবে বিলাবল ঠাটে লোকসঙ্গীত পরিবেশনার সময় এর স্বর কাঠামো নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে বা রীতিতে প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে লৌকিক সুরের রীতিটি আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠে। বিলাবল ঠাটে প্রকাশিত এমন সুর কাঠামো বা স্বর লক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঠাট ঃ বিলাবল

ক. সা রা গা মা পা ধা না ।

খ. সা রা গা- পা- ধা- ।

গ. সা রা মা পা ধা ।

উল্লিখিত স্বররীতিতে ভাটিয়ালীর ধর্মীয়, বাউল ও সাধনা কেন্দ্রিক গানগুলো গীত হয়ে থাকে। আবার-

ঘ. সা রা গা ।

ঙ. সা- গা- পা ধা

চ. সা- গা মা পা- না

উল্লিখিত স্বররীতিতে ভাটিয়ালীর সাঁওতালী বা আদিবাসী শ্রেণির গানগুলো অন্তর্গত। সুরের উত্থান-পতন রচনার জন্য ভাটিয়ালী শিল্পীগণ মোটামুটিভাবে এই স্বরগুলোকেই ব্যবহার করে থাকেন। স্বরগুলোর প্রয়োগেই কেবল ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সরগা, সরগমা, সরগপা, সগপধা, প্রভৃতি স্বরগুচ্ছের নানা উত্থান-পতনে গানের লক্ষণ স্পষ্ট হয়।[৬] কোন কোন লোকসঙ্গীত মূলত একজনের গান। ভাটিয়ালী গানের বেলায় সে বিষয়টি প্রযোজ্য। এছাড়াও যে সকল গানে দোহারসহ পরিবেশনা থাকে সেগুলোকে ইংরেজিতে কোরাস বা বৃন্দগায়ন বলা হয়। এক্ষেত্রে দোহারগণ গানকে বা গানের সুরকে আরো বেশি জোরালো করার জন্য বারবার একই সুর পরিবেশন করে থাকে। ভারতীয় লোকসঙ্গীতে সাধারণত একজনাই মূল গায়েন এবং সঙ্গে সকলেই দোহারের শামিল হয়ে দাঁড়ায়। যে সমবেত গান চলে তাকে বৃন্দ গান বলা চলে না। কোথাও সহযোগী বাদকেরা দোহারমণ্ডলী রূপে থাকে। প্রায় সকল উপস্থিত জনই গান করে- তা প্রত্যক্ষে হোক অথবা অপ্রত্যক্ষে হোক। কাজেই সুর কলিগুলোতে কোন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভবও নয়। একই সুরকলার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। নিয়ত পুনরাবৃত্তি গানকে শ্রোতার (গ্রামীণ সমাজের) মজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। সঙ্গীতরূপটি পুনরাবৃত্তির জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুরের দিক থেকে বলতে গেলে বহু সুরেরই দুটি অঙ্গ বিদ্যমান- যাকে স্থায়ী ও অন্তরা বলা চলে। এই দুটি অঙ্গ কোথাও একটু বড় অথবা কোথাও ছোট। স্থায়ী ভাগের পদ পুনরাবৃত্তির তুক অবলম্বন করে। এতে দোহারির সহযোগিতা সহজ হয়। ছন্দের দোলা সঙ্গীতে বড়ই প্রবল। তাল এতে

প্রধান। হালকা ছন্দ সহজভাবে নৃত্যের ভঙ্গিতে চলতে থাকে আর তালযন্ত্র বড় হয়ে বাজে। সুরযন্ত্র হয়তো অনেকস্থানেই নেই। সুরের আরোহী ও বিশেষ করে অবরোহী প্রকৃতির দ্বারা কিছু লোকসঙ্গীতের লক্ষণ নিরূপণ করা যায়। লোকসঙ্গীতের সুরের অর্ধরূপ এবং পরিপূর্ণ রূপের নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। এই নির্দিষ্ট কাঠামোকে শ্রেণিবদ্ধ করতে গেলে দেখা যায় যে সুরটির পূর্ণরূপ ধারণার যোগ্য এবং সে জন্য সুরকে শ্রেণিবদ্ধ করে ভারতীয় সঙ্গীতের মেল বা ঠাটের শ্রেণিতে বিশ্লেষণ করা যায়। সুরের আংশিক বা অর্ধরূপকেও একইভাবে ধারণা করা যায়।[৭] রাগসঙ্গীতে 'মা' এবং 'পা' দুটি স্বরের ব্যবহারে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ভাটিয়ালী গানের বেলায় তা কিছুটা হলেও ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। ভাটিয়ালী গানের স্থায়ী অংশের কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছোট হয়ে থাকে। স্থায়ী অংশে যে সুর গীত হয়, অন্তরা অংশের শেষ হওয়ার পর ভাটিয়ালীর সুর সেখানে বা শুরুর স্থানে এসে মিশে যায়। সহজ-সরল গীতপ্রকৃতির কারণে কোথাও উচ্চস্বরে আবার কোথাও নিচু স্বরে গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। গানের গতি নদীর নৌকার মতো সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। এক স্বরকে ছেড়ে এ গানের সুর অন্যস্বরে বা উচুতে যাওয়ার সময় মীড়ের কাজ খুব বেশি চোখে পড়ে না। কোথাও মীড়ের কাজ থাকলেও তার স্থায়িত্ব থাকে কম সময়ের জন্য। শেষ অংশে যে সুরের কাজ থাকে তা ভাটিয়ালী গানের সুরের চলনে পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে। এ সময়ে সুরের উচ্চে আরোহন ভাটিয়ালী সুরের ব্যাপ্যতা ও বিশালতাকে নির্দেশ করে। বারোমাসী গানে সুর প্রয়োগে কিছুটা ব্যতিক্রমি ভাব লক্ষ্য করা যায়। বছরের বারো মাসের বর্ণনা করতে গিয়ে রাগ রূপায়ণেও ভিন্নতা এসেছে। সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত বারোমাসী গানে ভাটিয়ালী সুরের যে সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানে কোথাও কোথাও গানের সুর পরিবেশনায় কড়ি মধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়। রসিকলাল দাস রচিত গানে এর প্রয়োগটি স্পষ্ট।

জৈষ্ঠ মাসে আম কাঠালের মধুর রসে মন ভাসে

ওরে এমন মধুর মাস যায়রে গইয়া নৈরাশে

ও রসময় রইলাই কোন দেশে।

ও বন্ধুরে, আরে সন্ধ্যা হইলে বনের পাখি গান করে নিজবাসে

ও বন্ধু সময় মতে আষাইঢ়া জল কল কল করে চার পাশে।

ও বন্ধুরে, সদাই চাইয়া থাকি পন্থপানে, যতদুর দেখি নয়নে রে

ওরে তোমারনিরে খবর আনে দইখনালিয়া বাতাসে।

ও বন্ধুরে, গাছের শোভা লতাপাতা চান্দের শোভা আকাশে

ওরে নারীর শোভা স্বামীর গৃহ কয় দীন রসিক দাসে। কথা ও সুর ঃ রসিকলাল দাস, সিলেট অঞ্চল

'বিলাবল' রাগের থেকে আরো একটু বেশি বৈচিত্র্য রয়েছে রাগ 'আলাহিয়া' বিলাবলে। ভাটিয়ালী গান রাগ বিলাবল থেকে যেখানে সামান্য একটু পরিবর্তিত হয়েছে সেখানে এটি 'আলাহিয়া বিলাবল'এ রূপ নিয়েছে। পূর্ববাংলার মরমি শ্রেণির ভাটিয়ালী গানে এ রাগের প্রভাব উল্লেখ করার মতো। মরমি সাধনার বাউল কবি হাসন রাজার গানের সুর পদ্ধতিতে ভাটিয়ালীর প্রভাব স্পষ্ট। হাওর অঞ্চল যেখান থেকে শুরু হয়েছে হাসন রাজার চরাচর সে অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই। তাছাড়া নদীর সাথে কবির আজীবন সম্পর্ক তাকে ভাটিয়ালী গান রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। হাসন রাজা রচিত এমন একটি গানের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

একদিন তোর হইবো রে মরণ রে হাসন রাজা

একদিন তোর হইবো রে মরণ

মায়াজালে বেড়িয়া মরণ না হইলো স্মরণ রে হাসন রাজা

একদিন তোর হইবো রে মরণ।।

যখন আইসা যমের দূত হাতে দিবে দড়ি হায়গো

আর টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইবো যমের পুরিরে হাসন রাজা।।

কোথায় গিয়া রইবো তোমার সুন্দর সুন্দর স্ত্রী হায়গো

কোথায় রইবো রামপাশা আর সাধের লক্ষ্মণশ্রী রে হাসন রাজা।।

রাগ ঃ আলাহিয়া বিলাবল

ঠাট ঃ ঐ

জাতি ঃ ষাড়ব সম্পূর্ণ

বাদীস্বর ঃ গান্ধার, সম্বাদী স্বর ঃ নিষাদ

পরিবেশন সময় ঃ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

আরোহন ঃ স, র, গর, গপ, নধ, নর্স

অবরোহন ঃ সন ধপ, ধণধপ, মগ, মরস

পকড় ঃ গর গপ ধ নর্স।[৮]

স্থায়ীঃ

।স া সগ। গ গ া। গ া ম। ধ ধ ণ ।ণধ প া। া পণ া। ধ া প। া ম া।

এ ক দি০ ন তো র হ ই বো রে ম ০ র০ ণ০ ০ রে০ ০ হা ০স ন রা০

।গ ম া। গ া া । প া প । া ম প।ম া গ।র স া।স া া। া া া।

জা ০০ ০ ০ ০ এ ক দি ন তোর হ ইবো রেম ০ র ণ০ ০০০

। ম প া। ন ন া। র্স র্স র্স ।র্স র্স প। প া ধ ।ণ ণ ধ ।প প া। া প ণ।

মা য়া০ জা লে ০বে ড়ি য়া ম র ণ না০হই লো স্ম০ র ণ ০ ০রে ০

। ধ া প। া ম া। প ম া।গ া া। প া প। া ম প।ম া গ। র স া।

হা ০স ন রা০ জা০০ ০ ০ ০ এ কদি নতোর হ ইবো রে ম০

। স া া। া া া।

ণ ০০ ০০০

অন্তরা

। ম প া। ন া ন। র্স র্স া। র্র র্স ন। ন ন া।র্স র্স র্র। ন র্স া। ন ধ প।

ঐ খ ন আ ইসা য মের দূ ০ ত হা তে০ দি বে০ দ ড়ি ০ হা য় গো

। ন ন া।র্স র্স র্র। ন র্স া। া া া।

হা তে০ দি বে ০ দ ড়ি০ ০০০

। ন ন া। র্স র্স া। ন া র্স। ন ধ প।ন ন র্স। ন ধ া। প প া। া প ণ।

টা নি০ য়া টা০ নি ০য়া লই ০য়া যা ই বে য মের পূ রী০ ০ রে০

। ধ া প। া ম া। প ম া। গ া া। প া প। া ম প। ম া গ। র া স।

হা০ স ন রা০ জা ০০ ০০ ০ এ কদি নতোর হ ইবো রেম ০

। স া া। া া া।

। র ণ ০ ০০০

'দাদরা' তালে গীত এই গানের পরবর্তী অংশগুলো সাধারণত একই সুরেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের ক্ষেত্রে দাদরা তালের প্রয়োগ কিছুটা গতি আনলেও গানের কথা ও সুরের প্রয়োজনে অনেক স্থানেই তা ব্যবহার করা হয়েছে। সুফি প্রভাবজাত মরমি ধারার ভাটিয়ালী গানে সুরের এমন চঞ্চলতা প্রায়ই দেখা যায়। ভাটিয়ালীর অনেক পরিচিত গান আরেকটি জনপ্রিয় রাগে রচিত, তা হলো রাগ ভূপালি। রাগটি পূর্বাঙ্গ প্রধান। সমস্বর বিশিষ্ট আর একটি রাগ বর্তমান, যা 'দেশকার' নামে পরিচিত। এর ঠাট বিলাবল। স্বর সাদৃশ্য থাকলেও এর চলন বক্র এবং গতি-প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা ও চঞ্চলতা আছে। এছাড়া শুদ্ধ কল্যাণ রাগটিও ভূপালির আঙ্গিকে কড়ি-মধ্যম ও শুদ্ধ-নিষাদ যুক্ত হয়ে সুপ্রচলিত। এই বৈষম্যের জন্য তা কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত।[৯]

ভাটিয়ালীতে এই তিনটি রাগের প্রভাব অনেক প্রাচীন। ভাটিয়ালীর কোন কোন গানে এর সমপ্রয়োগ দেখা যায়। শুধুমাত্র সঙ্গীতের জন্যই যে সকল কবিতায় সুর প্রয়োগ করা হয় কেবলমাত্র সেখানেই ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। পালা বা বর্ণনাধর্মী গানেও এর ব্যবহার পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির গানে বা কথায় ভাটিয়ালী সুর নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দিনেন্দ্র চৌধুরীর মতে-

ক. রাগ ঃ ভূপালি, ঠাট ঃ কল্যাণ, জাতি ঃ ঔড়ব,

বাদীস্বর ঃ গান্ধার, সম্বাদীস্বর ঃ ধৈবত, পরিবেশনকাল ঃ রাত্রি প্রথম প্রহর

আরোহন ঃ স র গ প ধ র্স

অবরোহন ঃ র্স দ প গ র স

পকড় ঃ গ, র, সধ, সরগ, পগ, ধপগ, রস।

খ. রাগ ঃ দেশকার, ঠাট ঃ বিলাবল, জাতি ঃ ঔড়ব

বাদীস্বর ঃ ধৈবত, সম্বাদীস্বর ঃ গান্ধার, পরিবেশনকাল ঃ দিবা প্রথম প্রহর।

আরোহন ঃ স র গ প ধ র্স

অবরোহন ঃ র্স ধ প, সপ ধপ গ র স

পকড় ঃ ধপ গপ গ র স

গ. রাগ ঃ শুদ্ধ কল্যাণ, ঠাট ঃ কল্যাণ, জাতি ঃ ঔড়ব সম্পূর্ণ

বাদীস্বর ঃ গান্ধার, সম্বাদীস্বর ঃ ধৈবত, পরিবেশন সময় ঃ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহন ঃ স র গ প ধ র্স

অবরোহন ঃ র্স ন ধ প ক্ষ গ র স

পকড় ঃ গ, রস, ন্ ধ্ প্, সগর, গরস।

কাহারবা তালে নিবদ্ধ শুদ্ধ কল্যাণ ঠাটে রচিত ও গীত ভাটিয়ালী গান হিসেবে নিম্নবর্ণিত গানের কথা বলা যেতে পারে।

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না

আমি জনম ধইরা বাইলাম বইঠা রে, নৌকা ভাইটাই সয় আর উজায় না।।

ওরে জঙ্গি রসি যতই কষি, ওরে হাইলে তে জল মানে না

আমি আর বাইতে পারলাম না।।

নায়ের তলী খসা গোড়া ভাঙ্গা রে, ও নাউ গাব-গয়ানি মানে না।।

।ধা স স ।স া স র।গ া প া ।ধা র্স া ।া া া া ।া া র্সন ধপ ।প ণ ধ প ।ম গ র স ।ম ০ ন মা ঝি ০ তো র বৈ ০ ঠা ০ নে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আমিআর ০০ বা ই০তে

।র গ ম গ ।রসা প প ।া া প ধ ।র্সর্সর্সর্স ।র্রর্গর্গ া ।র্র ার্রর্গ ।র্রর্স া া া ।া ার্স র্স ।

পা র লা ম না ০০ আ মি ০ ০ জ ন ম ভই রা ০ বা ই লা ম বৈ ০ ঠা ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ত রী

।ন র্র র্স র্র ।র্স ন ধ প ।ধ া ধ র্স ।র্স া া া ।প ণ ধ প ।ম গ র স ।র গ ম গ ।রস া া া ।

ভা ই টা ই স য় আ র উ ০ জা য় না ০ ০ ০ আ মি আ র বা ই তে ০ পা র লা ম না০ ০ ০ ০

প্রথম অন্তরা

।া া া া ।া া ধ ধ ।া া ধ ধ ।ণ ধ পা ।া া ধর্স ।া র্স র্র া ।র্স া া া ।া া ন ন ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে ০ ০ জ ঙ্গি ০ র সি ০ ০ ০ য ত ই ক ষি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে

।ন র্স র্স র্র ।র্স ন ধ প ।ধ া ধ র্স ।র্স া া া ।প ণ ধ প ।ম গ র স ।র গ ম গ ।রস া া া ।

হ ই লে ০ তে ০ জ ল মা ০ নে ০ না ০ ০ ০ আ মি আ র বা ই তে ০ পা র লা ম না০ ০ ০ ০

(দ্বিতীয় অন্তরার সুর প্রথম অন্তরার সুরের মত করে গীত হয়)[10]

দিনেন্দ্র চৌধুরী গানটির ‘উৎসরূপ ঃ শুদ্ধ কল্যাণ’ (ভাটিয়ালী গান-পৃ.নং-১১৩) হিসেবে বলেছেন। কিন্তু গানটির চলনে আমরা খাম্বাজ ঠাটের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি। আরোহতে শুদ্ধ-নি এবং অবরোহে কোমল-নি স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পূর্ববঙ্গের গানের পরিবেশনরীতির সাথে কখনো কখনো পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশনরীতির বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা যায় যে স্থানের পার্থক্যের কারণেও সুরের এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে।

রাগ সঙ্গীতের বেলায় গঠনের দিক থেকে নানা প্রকার সঙ্গীতিক উপকরণ ও প্রকাশশৈলী আমরা দেখতে পাই- ভাটিয়ালী গানের কাব্যাংশ তিন বা চার তুক-এ গঠিত। দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধ সঙ্গীতের যুগ থেকেই চার তুকে বা স্তবকে গঠিত গানের প্রচলন ছিল। প্রাচীন পারস্পরিক ধারার ভাটিয়ালীতে সঞ্চারীর প্রয়োগ না থাকলেও অন্তরা অংশের কাব্য বিস্তৃতির জন্য কোন কোন গানে আঙ্গিকগতভাবে তার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান সূচিত হয়েছে। কিন্তু তা শাস্ত্র নির্দেশিত পথে নয়, সহজাত স্ফুরণেই ক্রীয়াশীল থেকেছে। আখ্যানমূলক, সারি, জারি, ব্রতগীত বা গীতিকাগুলি আকারে সুদীর্ঘ তাই তুকের পরিবর্তে পঙ্‌ক্তি, পাঁচালির এই ধারাটি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে অনুসৃত হয়ে আসছে।[১১]

প্রাচীন ধারার ভাটিয়ালী গানে সঞ্চারীর ব্যবহার তেমন লক্ষ্য করা যায় না। লোকসঙ্গীতের এই রীতিটি শুধুমাত্র ভাটিয়ালী গানের বেলায় প্রযোজ্য নয়, এ রীতির প্রায় সকল ধারাতেই সঞ্চারীর এমন অনুপস্থিতি একটি স্বাভাবিক বিষয়। সঞ্চারীতে সুর খাদে নিপতিত হলে মূল রাগের থেকে কোথাও কোথাও পরিবর্তিত সুর ব্যবহার হতে দেখা যায়। একটি গানে খাদ বা সঞ্চারীর সংখ্যা সাধারণত একটি হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের সুর ব্যবহারে দেখা যায় গানের স্থায়ী অংশ সাধারণত মধ্য সপ্তকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। অন্তরা'তে এসে তা তারসপ্তকে গিয়ে পৌছে। এ সময় সুরারোহন তার সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত গিয়েও পৌঁছে। যখন তা সঞ্চারীতে ফিরে আসে এর নিম্নগামিতা উদারার পঞ্চম স্বর বা তারও নিচে গিয়ে পৌঁছে। বিচ্ছেদী ঢংএর ভাটিয়ালী গানে সুরের এই নিম্নগামিতা এর আবেদনকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। রাগ সঙ্গীতের বেলায় সুরের অবরোহনের সাথে সাথে স্বরও নিচে নেমে আসে। সেখানে কথা আর সুরের সম্পর্কের বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না থাকায় পরিবেশনার চাহিদা অনুসারে তা করা সম্ভব হয়। লোকসঙ্গীত কিংবা ভাটিয়ালী গানের বেলায় তা অনেকটা কঠিন কারণ এখানে গানের কথা আর সুরের মেলবন্ধনের বিষয়টিকে মাথায় রেখে সঙ্গীত রূপায়ণ করতে হয়। ভাটিয়ালী পরিবেশনের জন্য শিল্পীর কণ্ঠকে তিন সপ্তকেই সমানভাবে বিচরণ করার মতো ক্ষমতা অর্জন জরুরি। যা যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন হয়না। লোকসঙ্গীত মানুষের জীবন ও কর্মের সাথে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে মানুষের স্বভাব ও সীমাবদ্ধতার অনেক বিষয়াবলী এতে প্রকাশ পায়। আর রাগ সঙ্গীত হলো মানুষের অনুভূতির ফসল। কখনো আমরা আনন্দ পাই আবার কখনো আমরা বিরক্ত হই এই রাগ বা অনুরাগের প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায়। আদিম চেতনাবাহী সেই সৌন্দর্য ভাবনার যে বিকশিত মনোহর রূপ আমরা সৃষ্টিকলায় রূপদান করতে পেরেছি তাই হলো রাগসঙ্গীত। এখানে প্রয়োজন হয় অনুশীলনের। লোকসুরের মতো সাবলীল প্রকাশের এখানে কোন সুযোগ নেই। সুরের চর্চা করতে গিয়ে লোকসুরের মধ্যে অনেক ধরনের বৈচিত্র্য এসেছে, যা নতুন নামের গীতধারা হিসেবেও পরিচয় লাভ করেছে। গানের বর্ণনা করতে গিয়ে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ ইত্যাদি স্তবকেও বিভক্ত

হয়েছে। কোথাও প্রতিটি স্তবকে আলাদা আলাদা সুর পাওয়া যায় আবার কোথাও তা অনুপস্থিত। তবে সঞ্চারী অংশের সুর সব সময় গানের অন্যান্য অংশের থেকে আলাদা সুরে প্রকাশিত হয়েছে।

ভাটিয়ালী গানের সুর যে সকল গীতিধারার মধ্যে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে কবি ও ভাওয়াইয়া অন্যতম। কবিগানের প্রকাশভঙ্গিতে কোথাও কোথাও সরাসরিভাবে ভাটিয়ালীর পরিচিত অঙ্গগুলো স্থান পেয়েছে। কবি গান পরিবেশনায় ভাটিয়ালীর যে কয়েকটি রীতিকে অনুসরণ করা হয় তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাজশেখর বসু প্রণীত 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধান অনুসারে-

১. মহড়া বা মোহরা- অগ্রভাগ

(গানের শুরুর অংশ 'স্থায়ী' তুক রূপে গণ্য হতে পারে। মধ্যসপ্তক যার বিচরণ ক্ষেত্র)

২. চিতেন- কবিগানে মহড়ার পরের অংশ যাহা উচ্চস্বরে গাওয়া হয়।

(উচ্চকণ্ঠ বলতে উচ্চে আরোহন বা কণ্ঠের ব্যাপ্তি বা রেঞ্জ বোঝায়। তার সপ্তকে উচ্চে আরোহন রীতি হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং অংশটি অন্তরার সমার্থক বলা যেতে পারে।)

৩. পরচিতেন- অভিধানে উল্লেখ নেই।

(তবে অন্তরার পরে অতি অন্তরা রূপে গাওয়া যেতে পারে। যা রামপ্রসাদী সুরের অন্তরায় এবং বহু ভাটিয়ালী গানে লভ্য।)

৪. ফুকা- ফুৎকার- উচ্চস্বরে বলা। নকীব ফুকরায়।

(জোরে বলার উপযোগীতা অর্থ্যাৎ bold and vigour expression হতে পারে।)

৫. মেলতা- মেল অথে মিলন, ঐক্য।

(সঙ্গীত শাস্ত্রে মেল্ অর্থ ঠাট বোঝায়। এখানে আবর্তন সম্পূর্ণ করে মহড়া বা স্থায়ীতে ফেরার অনুকল্প হওয়াই স্বভাবিক।)

৬. খাদ- নীচু স্বর বা নিম্ন স্বর।

(অর্থ্যাৎ সঞ্চারী অংশ বা উদারা সপ্তকে আরোহন রীতিটির ইঙ্গিতবাহী।)[১২]

বাংলা অভিধানে এসকল গানের বাণীকে কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষারূপের উপস্থাপনও বলা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবি কিংবা ভাটিয়ালী গানের বাণীতে অঞ্চলিক ভাষারীতির প্রভাব দেখা যায়। শ্রী জ্ঞানেশ প্রসাদ সংকলিত ও সম্পাদিত, সহিত সংসদ প্রকাশিত, বাংলা ভাষার অভিধানেও প্রায় একই ধরনের প্রকরণ লক্ষ্য করি।

মহড়া ঃ মোহরা- মোআড়া- মুখপাত, পথেন মুখ, মোড়, সম্মুখ ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ স্থায়ী, অস্থায়ী বা মুখড়া।

চিতেন ঃ উচ্চ বা চড়া সুরে যা গাওয়া যায়। গানে মহড়ার পরে যে অংশ গলা ছাড়িয়ে গাহিতে হয়। (অর্থ্যাৎ উচ্চ স্বরে বা পর্দায়।)

পর-চিতেন ঃ দূর, অন্তর, অনন্তর, অতঃপর, পরে, পশ্চাৎ (অর্থ্যাৎ অতি অন্তরার সমর্থক, যা ক্ষ্যাপাবিষয়ক ডাকমালসীতে কবিগানে প্রচলিত।)

মেলতা ঃ মেল, ঐক্য, মিলন (অর্থ্যাৎ link line, যা দ্বারা মোহড়া বা স্থায়ী অংশে ফেরা সম্ভব হয়। মোহড়ার কাব্য বিষয়ক অন্তমিলেও সাযুজ্য থাকে।)

ফুকা ঃ ফুক, ফুৎকার, লঘুতম চাপ বা আঘাত (অর্থ্যাৎ সঞ্চারী তুকের গায়নরীতির অনুকল্প। স্বরের আরোহনে গলায় চাপ নিজস্ব নিয়মেই লঘু হয়ে যায়।)[১৩]

হাজার বছর ধরে লোকসঙ্গীতের একটির সাথে অন্য গীতিধারা মিশে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন গীতরীতি। লোকসঙ্গীতের এই বিশাল ভাণ্ডারকে রাগ পরিচয়ে আলাদা করারও প্রয়োজন পড়েনি। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের ভাটিয়ালী গান পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই সুরের সঠিক কাঠামো সম্পর্কে বিতর্ক থেকে গেছে। লোকসঙ্গীতের বিশাল ব্যাপ্তি এর একটি বড় কারণ। কেউ বলেছেন চর্যাপদে ভাটিয়ালী সুরের ব্যবহার ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন চর্যাপদ সংকীর্তনের সুরে গাওয়া হতো। চর্যাপদের শিরোদেশে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকায় কিছু প্রশ্ন উদিত হয়েছে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। চর্যায় উল্লিখিত রাগ যথাক্রমে গাবড়া (গউড়া), অরু, গুর্জরী, পটমঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনাসী, রামক্রী, বরাড়ী (বড্ডালী), শবরী (শীরবী) মল্লারী, মালসী, মালসী গুবড়া, কাহ্ন-গুঞ্জরী, বঙ্গাল ইত্যাদি। তাই নিশ্চিত পরিবেশন রীতিটি অনুমান নির্ভর হয়ে বিরাজ করছে, যার আজও কোন সমাধান হয়নি।[১৩] লোকসঙ্গীতের আদি নিদর্শনের মধ্যে উল্লিখিত রাগ ও তালের আসল রূপটি এখনও মানুষের কাছে অনুমান নির্ভর থাকার ফলে, বাংলা গানের আদি যে সকল ধারা এখনো সমানভাবে জনপ্রিয় সে সকল রীতিরও মূল ভিত্তি বা সুররূপ নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। তবে বঙ্গাল রাগের মতো ভাটিয়ালী সুরও যে বাঙালির একান্ত নিজস্ব সৃষ্ট সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালী গানের সুরশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গানের রাগ পরিচয়ে বৈচিত্র্যভাব থাকলেও ঠাট বিচারে তার বেশিরভাগই বিলাবল, খাম্বাজ ও কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ভাটিয়ালী গানের যত সুর প্রচলিত তা কোন না কোন ভাবে এই তিনটি ঠাটের পর্যায়ে পড়ে। তবে পূর্ব বাংলার ভাটি গানে ভৈরবী রাগ ও ঠাটের একটি প্রচলন রয়েছে। এ রাগে বারোটি স্বরের ব্যবহার ও পূর্বাঙ্গ প্রধান গীতরীতি পূর্ববাংলার বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। রাঢ় অঞ্চলের বাউল গানে প্রচলিত ভৈরবীতে উত্তরাঙ্গের প্রাধান্য। এই রাগের অন্তর্গত দুটি রূপ স্বতন্ত্র। ব্যতিক্রম

বলার কারণ পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই, যেখানে ভৈরবীর ব্যবহার নেই।[১৫] ভাটিয়ালী সুরে কাফি ঠাটের প্রাধান্য অনেক বেশি। 'কাফি'তে কোমল নিষাদ ও গান্ধার ব্যবহারের ফলে যে বেদনা ভাটিয়ালী রচয়িতার মনে অনুরোণিত ছিল তার প্রকাশ হয়েছে সর্বত্র। এখানে কাফি ঠাটে রচিত ও গীত ভাটিয়ালী গানের কথা বলা যেতে পারে।

রাগ ঃ কাফি, ঠাট ঃ কাফি,

জাতি ঃ সম্পূর্ণ, বাদীস্বর ঃ পঞ্চম, সম্বাদীস্বর ঃ ষড়জ

পরিবেশনকাল ঃ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কারো কারো মতে সব সময় গাওয়া যায়।

আরোহন ঃ স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স।

অবরোহন ঃ র্স ণ ধ প ম জ্ঞ র স।

পকড় ঃ সস, ররর, জ্ঞজ্ঞ, মম, প।

রাগ ও ঠাট ঃ কাফি

জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না

ঢেউয়ের পানি তো হাইল মানে না।

কেমনে দেবো ভব পাড়ি, নদীতে ঢেউ বয়রে ভারি

অকূলে পইড়্যাছে তরী, তরী কূলের দিশা পাইলো না।।

কোন মিস্তরি গড়লো তরী, মাস্তুলে নাই জাঙ্গা দড়ি

বাইনে বাইনে চুয়ায় পানি, বুঝি প্রাণে বাঁচা হইলো না।।

সারা জীবন বাইলাম তরী, ও তার নাই কিনারা নাই কাণ্ডারি

বলো গুরু কি উপায় করি, সাধের পালে হাওয়া বইলো না।।

স্বরলিপি ঃ স্থায়ী অংশ

। । । স । । র স ণ । । স র জ্ঞ ম । জ্ঞ র স স। স । । । । । । । । ।

০ ০ জী র্ ণ ত রী র ভা ব না ০ গে ০ লো ০ না গ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ।

। া া স স । র ম ম া। প ধ ণ ধ। পধ প মপ ম। জ্ঞম জ্ঞ র স। র ম ম া। প ধ ন ধ।

০০ঢেউ য়ের পা ০ নি ০ তো ০ হাই ল মা০ ০ নে০ ০ না ০ ০ঢেউ য়ের পা ০ নি ০ তো ০ হাই ল

। পা া মা া। জ্ঞ া র স ।

মা ০ নে ০ না ০ ০ ০ ।

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে দুটি ধারা বা শৈলী বিদ্যমান। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানি রীতিকে আমরা অনুসরণ করি। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী ধারার সঙ্গীতে মোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ঠাটের ব্যবহার রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সুর ও ধারা বিভক্ত হয়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে। আমাদের হিন্দুস্থানী রীতিতে ঠাট ১০ (দশ)টি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় একাধিক সমগোত্রীয় রাগ হয়তো একটি ঠাটের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যার কারণে লোকসঙ্গীতের রীতিতে একই গানের মধ্যে একাধিক রাগের ছোঁয়া বা চলন অনুভব করি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাটিয়ালী গানে ঝিঁঝিট, খাম্বাজ ও কাফি রাগের ব্যবহার দেখা যায়। বলা যায় এই তিনটি রাগ'ই ভাটিয়ালী গানের প্রধান ভিত্তি। দুটি গানের মধ্যে শুদ্ধ কিংবা বিকৃত স্বরের ব্যবহার একই থাকার পরও অনেক ক্ষেত্রে স্বরের স্থায়ীত্বের কারণেও গানের রূপ ভিন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র স্বর প্রয়োগ বা সুরের চলনের উপর নির্ভর করেই যে ভাটিয়ালী গানের সার্বিক রূপ কিংবা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় তা নয়। ভাটিয়ালী গান আধুনিক বাংলা গানের রীতিকে অনেকটা অনুসরণ করে থাকে। এখানে অন্যান্য গীতিধারার মতো সুরের পাশাপাশি কথারও সমান ভূমিকা রয়েছে। লোকসঙ্গীতের সার্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেও ভাটিয়ালী গানের নিজস্ব চলনের কারণেই এর সাথে রাগ সঙ্গীতের যোগসূত্র ঘটেছে। সুর ও বাণী উভয় বিচারেই ভাটিয়ালী একটি অনন্য গীতিধারা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

Z_¨wb‡‘k

১। প্রসঙ্গ বাংলা গান, করুণাময় গোস্বামী, অনুপম প্রকাশনী-ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬০।

২। বাংলা লোকসঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালী গান, ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৩০।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৫। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১৪৬।

৬। লোকসঙ্গীত জিজ্ঞাসা, সুকুমার রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ১৯৮৩, পৃ. ৬৭ ।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

৮। ভাটিয়ালি গান, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা-২০০২, পৃ. ১১০।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

fwUqvjx Mvb msMn I ¯iwjwc ms‡hvRb

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ দাম, গ্রাম- রামনগর চর, ডাকঘর- আগদিয়া শিমুলিয়া, উপজেলা ও জেলা নড়াইল। কবিয়াল বিজয় সরকার পরবর্তী সময়ে এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভাটিয়ালী সুরের ভাবরসে যারা গীত রচনা করেছেন তাদের মধ্যে কবি, গীতিকার জিতেন্দ্রনাথ দাম অন্যতম। তিনি বাংলা ১৩৪৪ সনের ১৪ শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- শ্রী গিরিশ চন্দ্র দাম, মাতা- শ্রীমতি যশোদাময়ী দাম। নিজ গ্রামের স্কুল থেকে মাইনর পাশ করে গোবরা পার্ব্বতী বিদ্যাপিঠ থেকে ম্যাট্রিক এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে যশোর পিটিআই থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন ও সঙ্গীত চর্চা করে চলেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য ভাটিয়ালী গান হল-

১. ভাটিয়ালী (গুরুতত্ত্ব)

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তুমি দয়াময়

তোমার মত নাই দরদী সাধের দুনিয়ায়

তোমার দয়ায় তোমারে পাই, দয়া কর দয়াময়।।

তোমারই ঘর তোমার বাড়ি সবই তোমার দান

তোমার কৃপাসিন্ধু তীরে ঘুরি সর্বক্ষণ

তুমি পালক তুমি চালক সর্ব জীবের আশ্রয়।।

তুমি যদি কর দয়া বোবা কথা কয়

অন্ধ পারে পথ দেখিতে খোড়া হেটে যায়

দয়া করে দয়াল আমায় চালাও তোমার ইশারায়।।

তোমারই তুলনা তুমি বিশ্ব মাঝারে

কোটি কোটি বিশ্ব তোমার ইঙ্গিতে ঘোরে

জিতেন বলে ঘোরাও মোরে যেমন তোমার মনে লয়।।

(গানটি কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত 'এই পৃথিবী যেমন আছে' গানের সুর ও তালে গীত হয়)

Dhaka University Institutional Repository

২. ভাটিয়ালী

মানব কুলে জনম পেয়ে দয়াল তোমাকে ভুলে

জনম গেল বিফলে

আর কি পাবো এমন জনম এই মানব কূলে।।

কত জন্মের ভাগ্য ফলে এলাম এই মানব কূলে

তোমায় রহিলাম ভুলে

ভুলে-ভুলে গেল জীবন তোমার কথা হলনা স্মরণ

মরণকালে নেবে কি তুলে।।

মানব জনম পেয়ে হে দয়াল তোমায় ভুলে রহিলাম

আমার কি পোড়া কপাল

সাধু গুরুর মধুর বাণী কর্ণে কভু নাহি শুনি

মায়া মোহে রহিলাম ভুলে।।

হরি ভক্ত সৎ আলাপন শুনে জুড়ালো জীবন

কাঁটলো না মায়ারই বাঁধন

জিতেন বলে কর্মফলে সময় সুযোগ গেল চলে

অধম বলে দিওনা ফেলে।। রচনাকাল ঃ ১০-০৮-২০০২

৩. ভাটিয়ালী

তোমার খেয়াল ভুলে দয়াল তোমায় পেলাম না

তোমায় চিনতে পারলাম না।

কি খেলা খেলিলে দয়াল আমায় বুঝতে দিলে না।।

এই না ভব রঙ্গশালায় কত করলাম অভিনয়

কেবল রিপুর তাড়নায়।

ভাবলাম না কে খেলায় খেলা, ডুবে এলো জীবন বেলা

আপন ভোলার ভুলতো ভাঙলো না।।

রঙ্গ মঞ্চে আমাকে পাঠায় তুমি করাও অভিনয়

দিয়ে মায়ার ডুরি পায়।

বালক যেমন ঘুড়ি উড়ায় সুতা ধরে পুতুল নাচায়

পুতুল কিছু বুঝতে পারে না।।

এই নিবেদন করি তোমায় দয়াল থেকে কিনারায়

আমায় দিওনা ভাসায়।

জিতেন বলে তোমার খেলায় ভুলে ভুলে দিন চলে যায়

তব খেলা শেষে ফেলে দিওনা।।

৪. ভাটিয়ালী

দয়াল গুরুরে আমার কত দিনে কাটবে মায়াজাল

আমার আশায় আশায় জনম গেল বাড়িল ভবের জঞ্জাল।।

মায়ার খেলায় ভুলে দয়াল বুনলাম মায়াজাল

হয়ে নিজের জালে নিজে বন্দী দয়াল, গেল আমার পরকাল।।

আশা করে ঘর বাঁধিলাম বাস করবো চিরকাল

আমার আশার বাসা ভেঙ্গে গেল দয়াল, গ্রাস করিল মহাকাল।।

সম্বল কেবল ছেঁড়া পাটি আর ছেঁড়া কম্বল

গোনা দিন ফুরায়ে গেল দয়াল পেলাম না পারের সম্বল।।

ফেলে যেতে হবে সবই যাবে কর্মফল

জিতেন বলে যার কপালে দয়াল, লিখেছে যে ভাগ্যফল।। রচনাকাল- ১১-০৮-২০০২

(গানটি কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত 'মাতা শচী গো আমি চার যুগে হই' গানের সুরে ও তালে গীত)

Dhaka University Institutional Repository

৫. ভাটিয়ালী

গুরু দেবের থলির ভিতর ভগবান

বাইরে তুমি যতই খোঁজ মিলবে না কোন সন্ধান।।

গুরুগিরি ব্যবসা খুলে ঘাড়ে বাঁধায় কর্মের থলে

পরপারের কথা বলে ধর্ম পথের দেয় বিধান।

ধর আমার কথা ধর পরকালের হিসাব কর

যেমন বলি তেমন তর পর কালের সুখ সন্ধান।।

ভিন্ন গুরুর ভিন্ন মতে শিষ্যরা সব উঠছে মেতে

মিল হচ্ছে না কোন পথে অমানবিক আচরণ।

গুরু আমার স্বয়ং ঈশ্বর-তার চরণে করেছি সার

এ জগতে সবই অসার সারৎসার গুরুর চরণ।।

এমন অনেক গুরু গোঁসাই বেড়ায় দিয়ে ধর্মের দোহাই

জীবের আর কোন গতি নাই গুরু বাক্যের অনুসরণ।

গুরুর কাছে আছে শুনি স্বর্গ সুখের পরশমণি।

জিতেন বলে আরো শুনি তারাই আসল ভগবান।।

৬. ভাটিয়ালী (দেহতত্ত্ব)

আপন ঘরে থেকে দয়াল দেখা দিলে না

তোমায় চিনতে পারলাম না

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ ভেবে দেখলাম না।।

আপন ঘরে তুমি আপন জন আমি ভাবি সর্বক্ষণ

তোমায় দেখলাম না কখন।

থেকে দয়াল অন্ধকারে আমায় রাখলে অন্ধকারে

আমার অন্ধ নয়ন তোমায় চিনলো না।।

পাঠাইয়া এ মানব কুলে জ্ঞানের নয়ন না দিলে

জনম গেল বিফলে

সবাই তোমায় দয়াল বলে তাইতে ভাসি নয়ন জলে

আমায় আপন বলে চেনা দিলে না।।

দিনে দিনে গোনা দিন গেল সন্ধ্যা ঘনায়ে এলো

কপাট বন্ধ রহিল

তুমি ঘরের খোদ মহাজন খুলে দাও মোর জ্ঞানের নয়ন

জিতেনের মন শাসন মানে না।।

(গানটি কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত 'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী' গানের সুর ও তালে গীত হয়)

৭. ভাটিয়ালী

মাটির দেহ মাটি হবে শোন ভাই

ধনী গরিব ছোট বড়, ভেদাভেদ তো দেখি নাই।।

শুদ্র-ভদ্র, কায়স্ত-মালি, ডোম-কামার, মুচি-তেলি

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-ঢুলি, বিভাগ কেন কর ভাই।

একই ঘাটে স্নান কর একই অন্নে উদর ভরো

মিছে কেন বিভেদ কর এক মাটিতে হবে ঠাঁই।।

আল্লাহ হরি আর ভগবান ভাষা ভেদে এক জনের নাম

গড বলিয়া ডাকে খ্রীষ্টান বিশ্ব পিতার শরীক নাই।

মায়ের কোলে পেয়েছ স্থান মায়ের দুগ্ধ করিলে পান

Dhaka University Institutional Repository

সকলে এক মায়ের সন্তান কেন কর জাতির বড়াই।।

জাতির গৌরব করে করে মনটা গেল হিংসায় ভরে

মানবতা নষ্ট করে ধর্মের কথা বলে বেড়াই।

ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন পদ্ম পত্রে জলের মতন

কখন যেন হবে পতন ভেবে দেখার সময় নাই।।

আরবি ভাষায় বেহেস্ত-দোযখ বাংলায় বলে স্বর্গ-নরক

একই জায়গা নামে পৃথক ভিন্ন জায়গা নাই।

জিতেন বলে শাস্ত্রের কথা সকল জাতির একই পিতা

মানুষ বলতে একই কথা জাতির গৌরব ছাড় ভাই।।

রচনাকাল- ২৮-০৮-২০০২

৮. ভাটিয়ালী (বিচ্ছেদী)

বিরহে কাঁদায়ে বন্ধু আশার সুর বাজাও

সকল কাজে তোমার মাঝে ঐ সুরে নাচাও

জীবনে মরণে বন্ধু তোমার বাঁশরী শোনাও।

মালা যখন গাঁথি তখন দেখি তোমার মুখ

আরোপে পরায়ে মালা পাই যে কত সুখ।

প্রেমানন্দে ভরে যাক বুক, সুখ সলীলে তুমি ভাসাও।

বিরহে আনন্দ আছে কান্নায় আছে সুখ

মনের দর্পণ করে দর্শন তোমার হাসি মাখা মুখ

হারা নিধি পাওয়ার কি সুখ সেই সুখে মজাও।।

মনের সুখে কেঁদে মনে কত লাগে ভাল

তোমার আশায় আশায় বন্ধু জীবন বেলা গেল

জীতেন বলে হেসে খেলে তরণী ভাসাও।

(গানটি বিজয় সরকার রচিত 'এই পৃথিবী যেমন আছে' গানের সুরে গীত)।

৯. ভাটিয়ালী

মন নিয়ে সে মন চোরা ফাঁকি দিল সই

প্রাণ পাখি কোথায় গেল কার কাছে শুধাই।

আশায় আশায় বুক বেঁধে রই মনের দুঃখ কারে কই।

সইতে নারি কইতে নারি ভুলতে না পারি

সরল প্রাণে গরল ঢেলে মন করে চুরি।

এখন আমি প্রাণে মরি সইতে পারি কই।।

জানতাম যদি ফাঁকি দেবে চুরি করি মন

তারে কি আর দিতাম সখি জীবনও যৌবন

চির দুঃখী হলাম এখন কেমনে এ জ্বালা সই

ভালোবেসে কাঁদতে হবে ভাবি নাই তখন

এখন দেখি মরণ সম হল এ জীবন

জিতেন বলে ধন্য জীবন তার পদে সপে দেই।

(গানটি বিজয় সরকার রচিত 'এই পৃথিবী যেমন আছে' গানের সুরে গীত)।

১০. ভাটিয়ালী

দীন বন্ধুরে তুমি কত দুঃখ দিলে মোর পরাণে

আমার কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল ভবে সুখ না হল জীবনে।

মাতৃগর্ভে তোমার কথা ছিল স্মরণে

Dhaka University Institutional Repository

ভবে এসে ভুলে গেলাম দয়াল পড়ে মায়ার বাঁধনে।

মাতৃহারা পিতৃহারা হলাম ভুবনে

মাতার স্নেহ পিতার আদর দয়াল পেলাম না জীবনে।

দুঃখে দুঃখে জনম গেল তুমি বিহনে

তুমি স্বার্থক কর মানব জনম দয়াল দেখা দিয়ে গোপনে।

গোপনে আসিয়া দয়াল বস মনের কোণে

জিতেনের মন মানেনা বারণ দয়াল সু-পথে লও টেনে।

১১. ভাটিয়ালী

প্রাণ সখিরে আমার বন্ধুতো আর ফিরে এলো না

আসি বলে গেল চলে সখি ফিরে তো আর এলো না।

অবোলা অখোলা ছিলাম কিছু বুঝি না

গোপনে প্রাণ বন্ধুর সনে সখি করলাম প্রেমের লেনাদেনা।

বন্ধুর প্রেমে পরাণ দিয়ে সহি যাতনা

গোপনে গোপনে কাঁদি সখী মুখে বলতে পারি না।

না বলা এ গোপন ব্যথা প্রাণে সহে না

বন্ধুর কি পড়ে না মনে সখী আমার প্রাণের বেদনা।

ভালোবেসে কাঁদতে হবে কভু জানিনা

জিতেন বলে ভালোবাসলে সখী সইতে হবে যাতনা।

রচনাকাল- ১৩.০৮.২০০২

Dhaka University Institutional Repository

১২. ভাটিয়ালী

পোড়া মনের সাথে পারা হল বিষম দায়।

এইতো দেখি ঢাকায় আছে হঠাৎ সে যায় কোলকাতায়।।

বিদ্যুৎ গতি আছে মনে চলে গেল বৃন্দাবনে

দেখলো রাধাকৃষ্ণ সনে বসিয়া কদমতলায়।

গোপীগণকে নিয়ে দলে নামিল যমুনার জলে

জলকেলি আর সাঁতার খেলে দেখিয়া নয়ন জুড়ায়।।

ঐ দেখ মন রওনা হলো দিল্লি থেকে বোম্বে গেল

শ্রীক্ষেত্র ঘুরে এলো কাশীবাসী হতে চায়।

ত্রিবেণী আর কুম্ভকমেলা দেখলো কত সাধুর খেলা

জুড়ায় গেল ত্রিতাপ জ্বালা, খেলা নাহি সাঙ্গ হয়।।

পোড়া মনের এমনি খেলা খেলতে খেলতে ডুবলো বেলা

সাঙ্গ হবে ভবের খেলা গুণা দিন ফুরায়ে যায়।

ডুবে এলো জীবন বেলা শেষ হলো না মনের খেলা

জিতেন বলে মনরে ভোলা দেহের সাথে হবি ক্ষয়।।

১৩. ভাটিয়ালী (রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বিচ্ছেদী)

পরাণ বন্ধু প্রাণের জ্বালা কেন বোঝেনি

প্রাণ সজনি চোখের জলে কাটে রজনি।

ভালোবেসে কাঁদতে হবে আগে ভাবিনি।

সখীরে, কোন পরাণে বন্ধু আমায় ভোলে সজনি

কেঁদে কেঁদে কাটাই আমি দিবস রজনি।

Dhaka University Institutional Repository

সখীরে, আমার চেয়ে ভালোবাসে আছে কে শুনি

আমাকে রয়েছে ভুলে নয়নের মনি।

সখীরে, ভালোবেসে কাঁদতে হবে আগে বুঝিনি

বুঝলে আমি দিতাম না সই সরল প্রাণখানি।

সখীরে, এ জীবনে পেলাম না বন্ধুর শ্রীচরণখানি

জিতেন বলে ঐ শোনা যায় মিলনের ধ্বনি।

রচনাকাল- ৩০.০৭.২০০২

১৪. ভাটিয়ালী

কি অপরূপ রূপের ছবি দেখলাম নয়নে

প্রাণ সজনী, তারে আমি ভুলবো কেমনে।।

সখীরে, পরাণ আমার গেছে সই তার রূপের ভুবনে।

না পাওয়ার বেদনা আমি সহি কেমনে।।

সখীরে, কি যাদু করেছে আমায় বুঝায় কেমনে।

জীবন মরণ সমান হলো বন্ধু বিহনে।।

সখীরে, রইতে নারি কইতে নারি কাঁদি পরাণে

জিতেন বলে মিলন হবে সুখের স্বপনে।।

রচনাকাল-৩১.০৭.২০০২

১৫. ভাটিয়ালী

নিশি যোগে আসি বন্ধু স্বপ্নে কথা কয়

প্রাণ সজনি বন্ধুবিনে বাঁচা হল দায়।

প্রেমের পরশ লাগলো প্রাণে বলা নাহি যায়।।

সখীরে, পরাণ আমার নিল কেড়ে চোখের ইশারায়

ভুলি ভুলি আশা করি ভোলা নাহি যায়।।

সখীরে, স্বপ্ন যদি সত্য না হয় হবে কি উপায়

কে এখন দরদি আছে বন্ধু কে জানায়।।

সখীরে, শোনরে পবন বলি তোরে গিয়া বন্ধুর গাঁয়

গোপনে প্রাণ বন্ধুর কানে বলিস নিরালায়।।

সখীরে, এ জীবনে বন্ধুর পরশ লাগলো না মোর গায়

জিতেন বলে পরকালে হবে পরিচয়।। রচনাকাল- ৩১.০৭.২০০২

fwUi Kwe Kvgvj DÏxb

পশ্চাৎপদ ভাটি অঞ্চলের জনগণকে সঙ্গীতের সাধনার পথে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে যিনি মরমি সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন, সেই গৌরবোজ্জল কৃতি সন্তানের নাম কামাল উদ্দীন। কোন পণ্ডিতের ভাষায় নয়, একেবারে নির্জলা মায়ের বুলি আওড়ানোর মাতৃভাষায় সঙ্গীত রচনা করে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে করেছেন সু-সমৃদ্ধ। অজস্র কবিতা, অবিনাশী বাউল গান, জারি সারি মুর্শিদি, মারফতি ভাটিয়ালী তথা পল্লিগীতি গাঁথা সংগ্রহ, রচনা, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে নিজের সাধনা দ্বারা তিনি দেখিয়ে গেছেন গীতিসাহিত্যের কি এক অমূল্য খনি পল্লি জননীর বুকের কোনে লুকিয়ে আছে।

বাউল কামাল উদ্দিন ১৯০৩ সালে তৎকালীন সুনামগঞ্জ মহকুমার, দিরাই থানার, ভাটিপাড়া গ্রামে তালুকদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আজিম উদ্দিন (সকলে ডাকতো টিয়ার বাপ বলে), মাতার নাম ঠান্ডার মা।[১] তাঁর সঙ্গীত জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ের মধ্যে অসংখ্য শিষ্য তৈরি ও বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকা লাউ, বাঁশের লাঠি ও এক টুকরো সুতার সাহায্যে সঙ্গীত স্রষ্টা কামাল উদ্দিন নিজের হাতেই বিশেষ ধরনের একতারা তৈরি করেন। স্ব-উদ্যোগে উদ্ভাবিত একতারার মধ্যে স্ব-রচিত গানের সুমধুর সুর সৃষ্টির একক কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। কথিত আছে ভাটি অঞ্চলে তার পূর্বে অন্য কোন মালজোড়া শিল্পী সঙ্গীত সাধনায় একতারা ব্যবহার করেননি। একতারাকে সম্বল করেই তিনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একতারাই ছিল তার সঙ্গী। তালুকদার ও মিরাশদার এর ন্যায় নানকাররাও (নিম্নবর্গের চাষী) যাতে

ভূমি মালিক হিসেবে তাদের মানবিক দাবিকে প্রতিষ্টিত করতে পারে সে লক্ষ্যে ১৯৩৫ সালে কামাল উদ্দিন জমিদারদের আগ্রাসন এর বিরুদ্ধে নানকার বিদ্রোহ শুরু করেন। নিজ গ্রাম ভাটিপাড়া, রফিনগর ইউনিয়ন, দিরাই শাল্লা নির্বাচনী এলাকা থেকে শুরু করে তাঁর এ প্রজাবিদ্রোহ সমগ্র পূর্ববঙ্গে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা করুণাসিন্ধু রায় ও কৃষক নেতা লালা সরবিন্দু দে (বুলি বাবু) সহ অনেক নেতারা কামাল উদ্দিনের স্থানীয় এ আন্দোলনকে মডেল ধরে, এটিকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করেন।[২] নেত্রকোণা জেলার জালাল উদ্দিন, শরৎচন্দ্র সরকার, উকিল মুন্সী, আবেদ আলি, জারু মিয়া, চাঁন মিয়া, আব্দুল মজিদ তালুকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মনমোহিনী সরকার, অমিয় ঠাকুর, কুমিল্লার অবনীমোহন ঠাকুর, সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার দূর্বিন শাহ, গোবিন্দগঞ্জের মানউলা বেজ, সিলেটের ক্বারী আমির উদ্দিন, সদর উপজেলার বাউল আব্দুল মতলিব, মফিজ আলি, উজির মিয়া, হাবিব পাগলা, এমরান আলি, দিরাই উপজেলার জলিল ফকির, শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ বাউল, ভাটিয়ালী ও পালা গানের শিল্পীরা কামাল উদ্দিনের সাথে গানের আসরে অংশ নিয়েছেন।

১. ভাটিয়ালী

নদীর স্রোতে নিঝুম রাতে কে যাও তরী বাইয়া

দয়া করি প্রাণের বন্ধু আমারে যাও কইয়ারে।।

ঐ পথে বহুদিন হয় গেল শ্যাম কালিয়া

আসিব আসিব বলে গিয়াছিল কইয়া

শ্যামল বরণ রূপের কিরণ নয়ন দুটি বাঁকা

একজনে বলেছে তার পাইয়া ছিলাম দেখারে।।

তুমি কেগো ধীরে ধীরে নৌকা বাইয়া যাও

হাতে ধরি পায়ে ধরি তোমার নায় উঠাও

দেখবো তারে তালাশিয়া পাইলে তাহার খবর।।

জলে স্থলে আছে কিংবা পাহাড় বন্দরে রে

না পাই যদি অভাগিনির ঐ দয়াল বন্ধুরে

এ কলঙ্ক পুড়া মুখ আর দেখাইব না কারে।।

মরিব মরিব আমি তাহার ব্যথায়

রাখবো না অসাড় জীবন কয় কামাল মিয়ায় রে।।

(সংগ্রহঃ- দেওয়ান মহসীন রাজা চৌধুরী ও মুক্তিযোদ্ধা এস,এন,এম মাহমুদুর রসুল, সুনামগঞ্জ)

২. ভাটিয়ালী

ভাটিয়াল পানে কে যাও বাইয়ারে ঘাটে ভিড়াও নাও

আমি অভাগিনি দীন দুঃখিনীর খবর লইয়া যাওরে।

মায়ে বাপে দিল বিয়া কঠিন স্বামীর ঠাই

স্বামীর সনে মিল পড়েনা কেমনে দিন কাটাই।

কইও কইও ওরে নাইয়া পাইলে আমার মায়

তোমার কন্যা কাঁন্দিতেছে নাইওরের আশায় রে।

মায়ে বাপে দিল বিয়া দুর দেশান্তর

আমারও বাপেরে মাঝি জানাইও খবর।

কইও কইও ওরে নাইয়া মোর মাথা খাও

নইলে বাবার জাতি যাবে না পাঠাইলে নাও রে।

চিনাইয়া দেই বাপের বাড়ি দুর দেশান্তর

সেই না দেশে যাইতে একটা মায়ারই সাগর।

তার সেপারে বহু দুরে সাদা রঙের ঘর

কামাল বলে সেই ঘরেতে জানাইও খবর ওরে।।

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার আহমদাবাদ ইউনিয়নের বনগাঁও নিবাসি গবেষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান তাঁর 'সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমি কবি' শীর্ষক গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্টায় বলেছেন- কবি কামাল উদ্দিন মরমি মারফতি সঙ্গীত রচনা ছাড়াও অন্যের রচিত গানে সুর সংযোজন করতেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

৩. ভাটিয়ালী

জীবন মুক্তি হবে কিসে, বদ্ধ রইলে তুই অক্টোপাসে

চিনবে সে মানুষে কিসে চিনবে সে মানুষে ।

মানুষে মানুষ চিনে থাকে যে পশুর স্থানে

আচারে আলাপনে নয়নে যে ভাসে

শুদ্ধ জীবে রুদ্ধ মানুষ ভাগ্য গুণে আসে

কানে শোনা সোনার মানুষ ধরা দেয়না কোন বা দোষে ।

যে মানুষ পরশমণি, নিকটে তার অষ্টোফণি

চিনে যারা জ্ঞানী গুণী উড়ে যায় তার পাশে

কেউ যদি ধরতে চায় সাহসের পরশে

অনায়াসে সাধু সে জন হয়রে ভক্তির বিশ্বাসে।

সময় থাকতে কথা ধরো নিজে নিজের বিচার করো

আছে সে নিজের ঘরে খুজলে পাবে শেষে

অধম পাগল ঠেকে রইলাম মাকড়েরই আশে

গুরু বলেন ঠেকলে আজিম অল্প একটু অবিশ্বাসে।

৪. ভাটিয়ালী (পারঘাটা)

নাও নিয়া বসিয়াছেন নবীজী কাণ্ডারি

আয় কে দেবে ফুলসিরাত পাড়ি

চার রং এর নৌকাখানি চার তক্তায় তারজুত গাঁথুনি

আর চার জন নিয়া সাজাইয়া তরী

উম্মতি উম্মতি কইয়া গো নবী করতেছেন আহাজারি।

নবীজী বৈঠা ধরিলো আলি মস্তুল উঠাইল

ফাতেমার বাদাম জাঙ্গার দড়ি হাসান হোসেন

ভাই দুইজনা দুই পাশে ধরিয়াছেন দাড়ি

যদি পাড়ি দিতে চাও বেলা থাকতে উঠিয়া যাও

করতেছেন উম্মতের এন্তেজারি।

কলেমা তৈয়ব সারি গাইয়া উঠ সবুজ ঝান্ডা ধরি

কৃপাবলে পাঞ্জাতনে কত পাপী-তাপী নিবে টেনে

নইলে দীর্ঘ পথ কেমনে দেবে পাড়ি

ডুববে রবি আঁধার হবে অন্ধকারে বিপদ তরী।

কামাল কয় নাই আর উপায় কেমনে উঠে নবীজীর নায়

ডাকতে গেলে সঙ্গে করি চোরের মণ্ড করবো খণ্ড গো

যদি মুর্শিদ দেয় তেজস্বী ছুরি।

৫. ভাটিয়ালী (মুর্শিদি)

হিরামন মানিকের দেশে আমার মুর্শিদ আছে

সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া কেমনে যাই তার কাছে ।

সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিতে পারি যদি

বলব কথা নিরবধি যতদিন পরান বাঁচে ।

মুর্শিদ আমার নায়েরগো মাঝি তার নামে করিয়া পুঁজি

খুলিব জান্নাতের কুঞ্জি যাব ফেরদাউসে ।

মুর্শিদ চাঁন্দের গো বাড়ি যেমনও মদিনা পুরি

এ কামাল কয় হুরি নুরি গায় আনন্দে নাচে ।

৬. ভাটিয়ালী (মুর্শিদি)

আমারে তরাইও গো অকুলে কেউ নাই আমার

একে আমার ভাঙ্গা তরী আরোও জানিনা সাঁতার।

তরী রাখতাম বা কোথায় নাও রাখিবার নাইরে কাড়ি

অকুল দরিয়ায় নৌকা বাওয়া হইল রে বিষমদায়

দেখে বিষম অন্ধকার।

তরী ছাড়তাম কেমনে, ভয়েতে পরানী কাঁপে ঢেউয়ের গর্জনে

সুর সুর করে উঠেরে ঢেউ নৌকায় পানি উঠে বেশুমার।

এখন উপায় কি করি, মুর্শিদ যদি দয়া করে ধরেন কাণ্ডারি

নইলে কি আর চাইতে পারি, এই পাপী কামাল তোমার।

৭. ভাটিয়ালী (পারঘাটা)

ভাঙ্গা তরী উঠে ভরি তরী কেমন করিয়া

অকুল সাগর ঢেউ ভয়ংকর, ভয়েতে কাপে হিয়া।।

সুজন মাঝি করে রাজি কতজন দিল পাড়ি

অন্ধকারে কাল কুমিরে নিতে পারে প্রাণ কাড়ি

মুর্শিদ নামে গাইয়া সারি গেল ডংকা মারিয়া।।

বেদিশা কাণ্ডারি আমার হুঁশবুদ্ধি নাইরে তাহার

সঙ্গেনি কেউ দেখিয়াছে প্রাণ পাখি যেতে আমার

ডুবু ডুবু তরী আমার কোন সময় যায় ডুবিয়া।।

মুর্শিদ যদি দয়া করে হন আমার কাণ্ডারি

অনায়াসে অকুলেতে আমি ধরতে পারি পাড়ি

নইলে উপায় কিবা করি বলে যে কামাল মিয়া।।

৮. ভাটিয়ালী (মুর্শিদি)

মুর্শিদও ঠেকিয়াছি দুই কুলের মাঝে

মুর্শিদও, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশে কোন সময় প্রবল বাতাসে

ঢেউ উঠিয়াছে দিল দরিয়ার মাঝে

ঢেউয়ের টানে দিলে আমার মুর্শিদ নামটি বাজে।।

মুর্শিদও, জ্ঞান মাস্তুলের জ্ঞানের বলে প্রেমের সুতায় বাদাম তুলে

যাইব চলে ঢেউয়ের মাঝে মাঝে।

কাল কুমিরের ভয় না লাগে দূরে থাকবো লাজে।।

মুর্শিদও, দিল দরিয়ায় নাই আর আশা শুধু তোমার নাম ভরসা

বলে কামাল পাশা ঢেউ উঠেছে গর্জে

হীরামণ মানিকের দেশে যাব মুর্শিদ ইষ্টিমারে গো

সেই না দেশে আমার সোনার মুর্শিদ বিরাজে।।

৯. ভাটিয়ালী (পারঘাটা)

মুর্শিদও আমি বলো কেমনে মহাজন বুঝাই

আমার লাভে মূলে সব হারাইলাম, রংপুরের হাটে চালান বাই।

মুর্শিদও, আগে দিয়াছি প্রমাণ লাভ দিয়া বুঝাইতাম চালান

হইলে লোকসান মালিক দায়ী নাই।

আমার নৌকা গেলো চালান গেলো গো মুর্শিদ, কোনদিন জানি আমি হারাই।

ও মুর্শিদ গো আমি হারাইলে যে খুঁজে আনবে

এমন বান্ধব কেবা আছে, ভবানন্দে আমার কেহ নাই।

আমার মাঝিমাল্লা সব পলাইলো গো মুর্শিদ, আমি তাদের খুঁজে কোথায় পাই।

ও মুর্শিদ গো কেমনে দেই নৌকার ভাড়া, বাইনে বাইনে ছুটলো জোড়া

সর্বহারা কেমনে নাও বাঁচাই।

আমি ঠেকছি কামাল ভাঙ্গা কপাল গো মুর্শিদ, কোন দিন জানি মরে যাই।

১০. ভাটিয়ালী (পারঘাটা)

মুর্শিদ অসময় কি করিগো তোমার নামে ধরেছি পাড়ি

তোমার দয়া তোমার মায়া ভরসা তোমার করি।

চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার আবহাওয়ার জোর

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ খানি ডাকছে ঘোর ঘোর গো

আমি কেমনে যাই অকুল সমুদ্র লইয়া ভাঙ্গা তরী গো।

হুঁ হুঁ শব্দে ছুটছে বান আসিতেছে ঢেউ

ভাঙ্গা তরী কেমনে বাঁচাই সঙ্গে নাই মোর কেউ গো

কুমির আসে পালে পাল প্রাণ উঠে শিহরি গো।

দূরদেশ কঠিন পণ্ড নাহি মাঝি মাল্লা

ভাঙ্গা তরী কেমনে বাঁচাই বলি আল্লাগো আল্লা

কূল দিবে ভরসা মুর্শিদ তোমার নামটি ছাড়ি গো।

কি করিব ঘোর তুফানে আর কুমিরেরই পালে

মুর্শিদ নামের সারি বাইয়া বৈঠা মারবো তালে গো

কামালে কয় মুর্শিদ বাড়ি যাব ডংকা মারি গো।

১১. ভাটিয়ালী (মুর্শিদি)

জলে ভাসা ধামের মতো ঘুরি আমি ভাসিয়া

মুর্শিদ বিনে ঘোর নিদানে কে নিবে ত্বরাইয়া।

অতি দূরের পাড়ি আর অন্ধকার তাতে সঙ্গী নাই আমার

হায়রে একেলা ধরেছি পাড়ি অকূল অন্ধকারে।

সুবাতাসের জোর দেখিয়া মন হইল আকুল, নায়ে তুলিলাম মস্তুল

হায়রে খুনি বাউয়ের চাপে পড়ে মস্তুল গেল ভাঙ্গিয়া।

ছিড়িল জাঙ্গার দড়ি নাইরে নায়ে পাল, আমার কঠিন জঞ্জাল

হায়রে সেই নৌকাটা সালাম সালাম কে কইতাছে ডাকিয়া।।

হঠাৎ শুনতে পাইলাম উড়ে আইল বাজ, শুনলাম মুর্শিদের আওয়াজ

হায়রে কামালে কয় সারিবো কাজ মুর্শিদের দয়া নিয়া।।

১২. ভাটিয়ালী (বিচ্ছেদী)

আষাঢ় মাসের ভাসা পানিরে ও পানি পূবালী বাতাসে

বাদাম দেইখা চাইয়া থাকি আমার নি কেউ আসে রে।।

কল কলাইয়া শব্দ শুনি নতুন পানির ধ্বনি

শব্দ শুনে অভাগিনির কাঁদিছে পরানিরে।।

একা ঘরে বসত করি কে করবে আদর

ভাইও নাই বান্ধবও নাই মোর, কে লইবে খবর রে।।

বৈশাখ গেল জৈষ্ঠ্য আইল গাছে পাঁকা আম

আইলায় না মোর প্রাণের বন্ধু কারে খাওয়াইতাম রে।।

এক বৎসর হইল গত আমার কে নিবে খবর

বাউল কামাল উদ্দিন আশায় থাকি না নিল নাইওর রে ।। সংগ্রহ- 'বাউল ভোলানাথ' সুনামগঞ্জ, সিলেট।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ভাটিয়ালী (বিচ্ছেদী)

মাগো নিতে আইলাম প্রাণ কানাই

সাজাইয়া দেও গোচারণে যাই

যখন উঠে রবির কিরণ শিরে ছত্র ধরি তখন

বৃক্ষমূলে শুইয়া নিদ্রায় যাই

ও এগো ভাইয়ের যদি আলস্য হয় গায়

মাগো কান্ধেতে লইয়া বেড়ায়।।

শতে শতে রাখালগণে ধেণু চরাই বনে বনে

গেল বনে কোন সন্দয় নাই

এগো বনে ক্ষুধা হইলে পরে গো রানি, বনফল আনি খাওয়াই।। কথা ও সুর ঃ প্রচলিত, সিলেট অঞ্চল

১৪. ভাটিয়ালী (বিচ্ছেদী)

অতি সাধের জনম গেল রে

মনা ভাই অবুঝরে বোঝাইতে

জনম গেল গেল সাধের জনম গেল রে।।

তুমি সারা দিনমান করিও কাম

সন্ধ্যা হইলে লইও শ্রীগুরুর নাম

ও নাম লইও লইও তুমি পরম যতনে রে।।

আমি লাভ করিতে বাণিজ্যে আইলাম

গোপ দেইখা নৌকা রাখিয়া দিলাম

নৌকা মাইলো মাইলো ওরে নিলুয়া বাতাসে রে।।

কথা ও সুর ঃ প্রচলিত, সুনামগঞ্জ অঞ্চল

১৫. ভাটিয়ালী (বিচ্ছেদী)

এ ভব সংসারেরে কে আছে আপনারে

ওরে চলো আপন দেশে যাই ওরে।

ও মনরে একটি কদম্ব গাছ তার উপরে শতেক ডাল

তার উপরে বগলার বাসা আঁধারের লাগিয়া রে

জমিনে নামিলো রে, ওরে গলে লাগিলো মায়া ফাঁসিরে।

ও মনরে ইঙ্গলা পিঙ্গলা ঘর, ঘুনে করলো জরজর

খইসা পড়ে বত্রিশ বান্দের জোড়া

জোড়ার উপর জোড়া রে মাড়ইল খাইল ঘুনে রে

বাজার লুটিয়া নিলো চোরে রে।

মনরে উত্তরাইলা দইখনাইলা বাও, পুরান বৈঠা ভাঙ্গা নাও

ঝলকে ঝলকে উঠে পানি

কইও শ্রীগুরুর ঠাই এ নায়ের ভরসা নাই

কখন জানি জলে ডুইবা মরি রে।

কথা ও সুর ঃ রসিকলাল দাস

১৬. ভাটিয়ালী (দেহতত্ত্ব)

নাও চলেরে ও নাও দোলেরে

লিলুয়া বাতাসে রে, সাধের নাও হেলে দোলে।

তিন তক্তার নৌকাখানি মাঝে মাঝে গাব-গাঁথুনি

তার বাইনে ছুবাইয়া উঠে পানিরে।

আগে করেছি ভুল ভাঙ্গা নায়ে দিয়া মস্তুল

পানি ধরেনা নায়ের হাইলে রে।

সঙ্গে সাথী যতই ছিল সকলি পালাইয়া গেল

ঠেকিলাম সন্ধ্যা বেলা রে।

মারো বৈঠা তাড়াতাড়ি, ঐ পারে মুর্শিদের বাড়ি

বেশি নাই আর বেলা রে।

অতি দুরের পাড়ি বেলা মাত্র দণ্ড ছাড়ি

তাড়াতাড়ি সাজাও তোমার ভেলা রে।

বলে বাউল পাগল কামাল পাশা, দয়াল নাম মন ভরসা

আশা মনে যাইবো কূলে।

১৭. ভাটিয়ালী (দেহতত্ত্ব)

মন মাঝি তোর জীর্ণ তরী কিনারা ভিড়াইয়া ধর

একে জীর্ণ তরী তুফান ভারী ঢেউ দেখিয়া লাগে ডর।

নায়ের মাঝি ষোল জন তারা নয়তো কেউ আপন

ছয় জনা মারিছে বৈঠা গুণ টানে নয় জন

জ্ঞানব্যাপারী ডাইকা বলে রে মাঝি হাইলটাকে ঘুরাইয়া ধর।

নায়ের বাঁচার আশা নাই আমি কারে বা শুধাই

সুযোগ পাইয়া ভাগিরা সব গিয়াছে পলাই

কত মহাজনের তরীরে ডুবলো অকালে ভব সাগরে।

নায়ের গালা ছুটলো ও নায়ের জাকন মারিলো

ক্ষয় পাইয়া মন মাঝি ভাই ছাপাইয়া রইলো

রসিক বলে নামের কলে রে পাল তুলিয়া যাত্রা কর।

কথা ও সুর ঃ রসিকলাল দাস, সিলেট

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ভাটিয়ালী (শ্যামের ক্ষেদ)

রাধে গো তোর প্রেমের ঘাটে নৌকা বান্ধিলাম

তুমি রাধে সাজ পারে আমি নাইয়া সাজিলাম।

রাধে গো তর প্রেমের লাগিয়া

কংস নদী পাড়ি দিতে সাজিলাম নাইয়া

উঠো রাধে ভয় কইরো না, আমি তোমার রসিক শ্যাম।

যার কারণে কংস নদীতে আমি বাইগো তরী

আমার নৌকা পার হইতে লাগে না তো কড়ি

উঠ নৌকায় তাড়াতাড়ি তোমারে কইলাম।

অষ্ট সখী লইয়া সঙ্গে বাদাম দিলাম মন রঙ্গে

কামাল বলেন তোমার সঙ্গে, যুগল মিলন হেরিলাম গো। (বাউল সোনাফর উল্যা, দাউদপুর, দিরাই, সিলেট।)

১৯. ভাটিয়ালী (শ্যামের ক্ষেদ)

সুবল ডাকে বাঁশি রাধা রাধা কইয়া

ব্রজে দোষী হইলাম বাঁশরি বাজাইয়া।

রাই, রাই করে বাজাই বাঁশি কদম ডালে বইয়া

রব শুনিয়া যায় দেখিয়া জলের ছল করিয়া।

আজ কেন আসলো না রাধে কি দোষ পাইয়া

লইয়া যাও মোর ছেঁদা বাঁশি জিজ্ঞাসা কর গিয়া।

যার নাম ধরে ডাকে বাঁশি তারে আস দিয়া

কইও আর বাঁশি বাজাইবো না শ্যাম-রাধা নাম ধরিয়া।

কানাই লইয়া সুখে থাকো কয় কামাল মিয়া

মথুরাতে যাবো বলে ব্রজপুর ছাড়িয়া।

২০. ভাটিয়ালী (রাধার বিরহ)

প্রাণ সখী গো প্রেমানল জলিল বুকেতে

ধৈর্য্য ধরে থাকবো কত চেষ্টা কর নিভাইতে।

দিন রজনি আগুন জ্বলে বারণ হয়না জল ঢালিলে গো

তোমরা সই সকলে মিলে চিতা নেও শ্মশানেতে।

কত জনে করলো পিরিত কার পিরিতে এ দূর্গতি গো

কার বা গেল কূল জাতি এ ব্রজ নগরেতে গো।

আমার বলতে যত ছিল সব কালিয়ার সাথে গেলো গো

শুধু কায়া পড়ে রইলো, প্রাণ গেল তার সঙ্গেতে।

মুখ দেখাইনা লোক লাজে ঠাই পাইনা গিয়া সমাজে গো

চলিলাম বন্ধুয়ার খোঁজে দেখবো সে কোন দেশেতে।

যদি খুঁজে না পাই শ্যাম কালিয়া বলে কবি কামাল মিয়া গো

কলসি বাঁধিয়া গলে ডুব দিব যমুনাতে।

২১. ভাটিয়ালী (মনঃশিক্ষা)

মন পাখি থাকতে চায়না আমার মাটির পিঞ্জিরায়

কোনদিন পাখি দিবে লুকি গিয়া নিবিড় জঙ্গলায়।

পাখির মন ভুলাইবার তরে কতই করলাম জনম ভরে

জন্মের মতো যাবে ছেড়ে একদিন না কইয়া আমায়।

ছয় পাখি দেয় যন্ত্রণা সুবুলি বলিতে চায়না

কত দুগ্ধ কলা মাখন ছানা রাখলাম মন যোগাইবার দায়।

জানতাম যদি যাবে ছাড়ি তারে কি পিঞ্জিরায় ভরি

আজীবন করলাম চাকুরি করছে কামাল কার আশায়।

২২. ভাটিয়ালী (মনঃশিক্ষা)

ওরে আমার পাগলা মাঝি বৈঠা নেরে বৈঠা নে

বায়ু কোনে সাজ কইরাছে মাঝি ভাই মেঘ ডাইকাছে ঈশান কোণে।

শোন রে মাঝি কথা শোন নাও ভিড়াইয়া ধর গুণরে

আমি ঠেকলাম পাগলা মাঝি লইয়ারে

সে যে নাউ ভিড়াইতে উল্টা টানে।

শুনছিরে ভাই পাছের নায়ে আগে তরী গেল বেয়ে

ও আমি শুনছি দয়াল বৈদ্যরে সে যে ভবপারের ঔষধ জানে।

অধর চাঁন্দের ভাঙ্গা তরী নাই সে নায়ের নাই কাণ্ডারি

আমি মধ্য গাঙ্গে ভাইসা রইলাম রে

মাঝিভাই কার কাছে কই কেবা শোনে।

কথা ও সুর ঃ অধরচাঁন, সুনামগঞ্জ, সিলেট

২৩. ভাটিয়ালী (মনঃশিক্ষা)

সমূলে বিনাশ হইলাম রে দোষ করি মনা ভাই

পুঁজি আনলাম ষোল আনা ব্যাপার করিতে দোনা

পড়িয়া ঠগেরই হাতে ও মনরে বেচাকিনি নাই

আমি লাভে মূলে সব হারালাম কি দিয়া মহাজনরে বুঝাই।।

আসল গেল দেনা হইলো বিদেশে মোর থাকা হইলো

সঙ্গের ছয় জন ভাগি ছিল ও মনরে তারাও পাছে নাই

আমি চাইয়া দেখি সব বিদেশি আপন দেশের একজনও নাই।।

কথা ও সুর ঃ প্রচলিত, নেত্রকোণা ও সিলেট অঞ্চল।

২৪. ভাটিয়ালী (লোকপ্রেমমূলক)

আমার বন্ধু বিনে গো ও প্রাণ সই

বন্ধু বিনে এ সংসারে আমার কে আছে আর আপনা

সময় থাকতে তারে চিনলাম না

সকলের সকলই আছে গো আমার বন্ধু বিনে নাই আপনা।

আসবে বলে প্রাণ বন্ধু বড় আশা ছিল

আশা বিফলে গেল সখি গো

কোন রমণী পন্থে পাইয়া গো আমার বন্ধুরে নিলো দিল না।

অতি সাধের বাসর আমার ফুলেরই সাজন

বুঝি গেলো অকারণ সখি গো

এগো জীয়ন হইতে মরণ ভাল গো আমার জ্বলছে আগুন আর নিভে না।

কথা ও সুর ঃ রসিকলাল দাস, সিলেট

২৫. ভাটিয়ালী (রাধা-কৃষ্ণ)

দেখা হবে শ্রীরাধার সনে ভাইরে সুবল এ জীবনে

আমার কেন জানি দিন যামিনী ঐ মুখখানি পড়ে মনে।

সুবলরে তরুলতা পশুপাখি প্রেম সোহাগে মাখামাখি

এ পোড়া প্রাণ কিসে রাখি এ সুখের দিনে

আমার মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ আমার মনের মানুষ বিনে।

ও সুবল রে নাম ধরে বাজাইলে বাঁশি

হাসি মুখে রাই রূপসী তরীতে মিলিত আসি নিকুঞ্জ বনে

কত সুখের নিশি কাটাইতাম তার সনে প্রেম আলাপনে।

কথা ও সুর ঃ প্রচলিত, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা অঞ্চল।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. ভাটিয়ালী (রাধা-কৃষ্ণ)

প্রাণ বন্ধুরে পাশা খেলিব আজ নিশি

পাশা খেলিব আজ নিশি

বন্ধুরে, খেলার বিধান বলি শোন ওরে বনমালি

আরো লাগে সুবর্ণের হাড়ি ও বন্ধুরে

তার ভিতর ধান্য দিয়া উপরে ঢাকনি দিয়া

আরো লাগে অষ্ট গণ্ডা কড়ি প্রাণ সখিরে।।

বন্ধুরে, প্রতিজ্ঞা করিয়া খেলা আমি হারি যদি চিকন কালা

শ্রীচরণে হয়ে রবো দাসি

তুমি হার যদি চিকন কালা দিবায় গলার বনমালা

তুমি আরো দিবায় চোরা মোহনবাঁশি।।

বন্ধুরে, খেলা আরম্ভ হইলে সখীগণ হাসতে ছিল

জিনিলো জিনিলো রাইরূপসী

ভাইবে হরিচরণ কয় শোন কৃষ্ণ দয়াময়

তুমি নারীর সনে হারলাই কালো শশী।।

কথা ও সুর ঃ হরিচরণ, সিলেট অঞ্চল

২৩। ভাটিয়ালী গান, তাল- দাদরা।

কে যাবি চল বৃন্দাবনে যারে নাগাল পাই

প্রাণনাথ বন্ধুরে পাইলে অঙ্গেতে মিশাই।

ও তার অঙ্গের সুবাস আমি অন্তরে মিশাই

রাধার অন্তরনিধি অন্তরে মিশাই ॥

ওপারে উঠেরে চাঁদ অঙ্গ শীতল করে

আমার লাগি সে চাঁদ সখি অনল হইয়া ঝরে গো,

কপাল দোষে কালো শশী অনল হইয়া ঝরে গো

সুধার খনি কালো শশী অনল রূপ ধরে ॥

অপারে বন্ধুয়ার বাড়ি মধ্যে সুর-নদী

এনে লয় উড়িয়া যাইতাম পঙ্খ না দেয় বিধি।

শুনি নাকি শ্যামের প্রেমে মরলে জীবন পায়

জীবন থাকতে মরলাম আমি কে করে উপায় গো ॥

(কথাঃ অজয় ভট্টাচার্য, সুর ঃ শচীন দেববর্মন, শচীন কর্তার গানের ভুবন, খগেশ দেববর্মন,কলকাতা, জুন-২০০৭, পৃ. ২৯৬)

২৪। ভাটিয়ালী গান, তাল- কাহারবা।

ওরে সুজন নাইয়া

কোন বা কন্যার দেশে যাওরে চান্দের ডিঙ্গি বাইয়া

লক্ষ তারার নয়ন কোলে কার চাহনির মানিক জ্বলে

আবছা মেঘের পত্রখানি কে দিল পাঠাইয়া ॥

কোন সে কন্যার দীর্ঘ নিঃশ্বাস আইল বাউরী বায়ে

চোখের জলে তোমার নাম কে লেখে আপন গায়ে ॥

নদীর জলের আরসিতে হায় কোন সে প্রিয়া দেখে তোমায়

সাঁঝের পিদিম ভাসায় জলে কে তোমারে চাইয়া ॥

(কথাঃ অজয় ভট্টাচার্য, সুর ঃ শচীন দেববর্মন, শচীন কর্তার গানের ভুবন, খগেশ দেববর্মন,কলকাতা, জুন-২০০৭, পৃ. ২৯২)

Z_¨wb‡‘k

১। আল-হেলাল, গানের সম্রাট কামাল উদ্দিন, আম্বরখানা- সিলেট, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ইং, পৃ. ৩

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mv‡bi ¯iwjwc

ওরে ও ভ্রমরা নিশিথে যাই ও ফুলবনে রে ভ্রমরা

নিশিথে যাইও ফুলবনে

জ্বালায়ে চান্দের বাতি জেগে রব সারা রাতি গো

আমি কব কথা শিশিরের সনে রে ভ্রমরা, নিশিথে যাইও ফুলবনে।

যদি বা ঘুমায়ে পড়ি, স্বপনের পথ ধরি গো

তুমি নীরব চরণে যাইও যে ভ্রমরা, নিশিথে যাইও ফুলবনে।

ডাল যেন ভাঙ্গে না, আমার ফুল যেন ভাঙ্গে না

ফুলের ঘুম যেন ভাঙ্গে না, নীরব চরণে যাইও রে ভ্রমরা, নিশিথে যাইও ফুলবনে।

শিল্পী: শচীনদেব বর্মণ, রেকর্ড সংখ্যা এইচ ঃ ২৬৬

পা ধা । সা -া -া । রর্সা ণধপা -া । ধা র্সণা ধা । পণধা পমা গরাসা ।

ও রে ও ০ ০ ০০ ০০০ ০ ভ্র ম০ রা ০০০ ০০ ০০০ ।

। সা -া গা । গা গা -া । গা -া মা। ধা ধা ণা ।

নি ০ শি থে যা ই ও ০ ০ ফু ল ০

ধা -া পা । -া ণা -া । ধা পা মা । পমা গা -া ।

ব ০ নে ০ রে ০ ভ্র ম ০ রা০ ০ ০

গা -া মা । পা ধপা -া । গা মা গা । রা সা -া ।

নি ০ শি থে যাই ০ ও ০ ০ ফু ল ০

রা -া -া । সা া া । ।

ব ০ ০ নে ০ ০

।। না-া না । না না -া ।র্সা র্সা -া । র্রা র্সা না ।

জ্বা ০ লা য়ে চা ০ ন্দে র ০ বা ০ ০

র্সা -া -া । -া র্রর্সা না । না না -া । র্সা র্সা -া ।

তি ০ ০ ০ ০০ ০ জে গে ০ র ব ০

। না র্সা না । যা পা মা । পমা গা -া । -া সা সা ।

সা রা ০ রা তি ০ গো০ ০ ০ ০ আ মি

। সা সা গা । গা রা সা ।-া -া-া । -া সা সা ।

ক ব ০ ক থা ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

। সা সা গা । গা গা -া । গা গা মা । পা পণধা -া ।

ক ব ০ ক থা ০ শি শি ০ রে র০০ ০

। ধা -া পা । -া পা ণা । ধা পা মা । পমা গা -া ।

স ০ নে ০ রে ০ ভ্র ম ০ রা০ ০ ০

। গা -া মা । পা ধপা -া । গা মা গা । রা সা -া ।

নি ০ শি থে যাই ০ ও ০ ০ ফু ল ০

। রা -া -া । সা -া -া । ।

ব ০ ০ নে ০ ০

। না -া না । না না -া । র্সা র্সা -া । র্রা র্সা না ।

য ০ দি বা ঘু ০ মা য়ে ০ প ০ ০

। র্সা -া -া । -া র্রর্সা না । না না -া ।র্সা র্সা -া ।

ড়ি ০ ০ ০ ০০ ০ স্ব প ০ নে র ০

। না র্সা না । ধা পা মা । পমা গা -া । -া সা সা ।

প থ ০ ধ রি ০ গো০ ০ ০ ০ তু মি

। সা -া গা । গা গা -া। গা গা মা । পধা ণা -া।

নী ০ র ব চ ০ র ণে ০ যা০ ই ০

। পা -া -া । পা -া ণা । ধা পা মা । পমা ণা -া । ।

ও ০ ০ রে ০ ০ ভ্র ম ০ রা০ ০ ০ । নিশিথে যাইও ফুল বনে।

।। পা -া ধা । ণা ধা -া । -া -া পা । পা মা পা ।

ডা ০ ল যে ন ০ ০ ০ ভা ঙ্গে না ০

। মা গা -া । -া -া -া । -া -া -া । পা পা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র

। পা -া ধা । ণা ধা -া । -া -া পা । পা মা পা।

ফু ০ ল যে ন ০ ০ ০ ভা ঙ্গে না ০

মা গা -া । -া -া -া । -া -া া । পা পা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ফু লে র

। পা -া ধা । ণা ধা -া । -া -া পা। পা মা পা ।

ঘু ০ ম যে ন ০ ০ ০ ভা ঙ্গে না ০

।গা গা মা। -া -া -া । সা -া গা । গা গা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ র ব চ ০

।গা গা মা । পধা ণা -া । ধা পা -া । -া -া ণা ।

র ণে ০ যা০ ই ০ ও ০ ০ ০ ০ রে

। ধা পা মা । পমা গা -া । গা -া মা । পা মা পা ।

ভ্র ম ০ রা০ ০ ০ নি ০ শি থে যা ০

। গা মা গা। রা সা -া । রা -া -া । সা -া -া । ।

ই ও ০ ফু ল ০ ব ০ ০ নে ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mvb

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

আমি আর বাইতে পারলাম না

আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠারে

তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না।

ওরে জঙ্গি রশি যতই কসি

ওরে হাইলেতে জল মানে না।

নাওয়ের তলী খসা, গোড়া ভাঙ্গারে,

নায়ত গাব গয়ানি মানে না।

সা রা।। ধ্া -া সা সা । সা -া সা রা । গা -া পা -া । ধা -া র্সা -া ।

আ রে ম ০ ন মা ঝি ০ তু ই বৈ ০ ঠা ০ নে ০ রে ০

।-া -া -া -া । -া -া র্সনা ধাপা । পা ণা ধা পা । মা গা রা সা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ আ মি আ র বা ই তে ০

। রা গা মা গা ।রসা -া পা পা ।-া -া পা ধা। র্সা র্সা র্সা র্রা।

পা র লা ম্ না০ ০আ মি ০ ০ জ ন ম্ ভই রা ০

।র্রা র্গা র্গা-া । র্রা -া র্রা র্গা। র্র র্সা -া -া -া । -া -া র্সা র্সা ।

বা ই লা ম বৈ ০ ঠা ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ত রী

। না র্রা র্সা র্রা। র্সা না ধা পা। ধা -া ধা র্সা । র্সা -া -া -া ।।

ভা ই টা য় স য় আ র উ ০ জা য় না ০ ০ ০

আমি আর বাইতে পারলাম না ।

ধা ধা ।। -া -া যা ধা ।ণা ধা পা -া । -া -া ধা র্সা । -া র্সা র্রা -া ।

ও রে ০ ০ জ ঙ্গী ০ র শি ০ ০ ০ য ত ই ক সি ০

। র্সা -া -া -া। -া -া না না। না র্সা র্সা র্রা। র্সা না ধা পা ।

ও ও ও ও ও ও ও রে হা ই লে ও তে ও জ ল

। ধা -া ধা র্সা। র্সা -া -া -া ।।

মা ও নে ও না ও ও ও

আমি আর বাইতে পারলাম না।

ধা ধা ।। ধা -া ধা ণা। ধা -া পা -া । -া -া ধা র্সা। -া র্সা র্র া।

নাওয়ের ত ও লী ও খ ও সা ও ও ও গো ড়া ও ভা ঙ্গা ও

। র্সা -া -া -া। -া -া না না। না -া -া র্রা। র্সা -া র্সা র্রা ।

য়ে ও ও ও ও ও নায় ত গা ও ব গা য় ও নি ও

। না ধপা ধা র্সা। র্সা -া -া -া ।।

মা ও ও নে ও না ও ও ও

আমি আর বাইতে পারলাম না।

fvwUqvjx Mvb

আমার গলার হার খুলেনে ওগো ললিতে

আমার হার পরে আর কি ফল আছে গো

প্রাণ বন্ধু নাই ব্রজেতে।

গলার হারে কি আর শোভা আছে,

যার শোভা তার সঙ্গে গেছে গো,

এখন কৃষ্ণনামের মালা গেঁথে, দেনা আমার গলেতে।

আর বিশখা নে হাতের বালা

চম্‌পকা নে গলার মালা গো

সূচীত্রা নে কানের পাশা, আশা নাই আর বাঁচিতে।

প্রাণের বন্ধু যদি আসে দ্যাশে

বলিস তোরা বন্ধুর কাছে গো

রাই কৃষ্ণ শোকে প্রাণ ত্যাজিছে, যমুনার জলেতে।

শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ, রেকর্ড সংখ্যা এন ১৭১৮৪

।। সা সা সা

আ মার

। সা রা রা -া । -া গা মগা রা । সা সা সা গো । গা মগা গা রা ।

গ ০ লা ০ ০ র হা০ ০ ০ র খু লে নে ০০ ০ ০

। সা রা সা ণ্া । ধ্া সা স্ রা । গরা গা -া -া । -া -া পা পা ।

০ র গো ০ ০ ০ ল লি তে০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা

। -া পা পপা ধা । -া পা ধা ণা । পা ধা -া -া । -া -া র্সার্ণা ধা ।

০ র হার পা ০ রে আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০

Dhaka University Institutional Repository

। পা পা পা ণাণা । ধা পা ধপা মা । পা পা পমা গা । গা মগা রা সা ।

ও র কি ফল্ আ ছে গো০ প্রা ণ ব০ ন্ ধু ০০ না ই

। -া -া সা গা । গা পমা গা রা । সা রা সা ণা ধ্া সা সা রা ।

ও ও ত্র জে তে ০০ ও ও ও ও গো ও ও ও ল লি

। গরা সা -া -া । -া -া সা সা ।।

তে০ ও ও ও ও ও আ মা র

।।-া গা গমা পা। -া প মা গা ।মগা রা সা -া । রসা ন্া সা রা ।

ও গ লা০ ও ও র হা রে ০০ কি আ ও ০০ র শো ভা

।মা মা মা পা । গমা গা -া -া । গা মা গা রগা। সরা সা গগা গা ।

-া আ ছে ও ০০ ও ও ও ও ও ও ০০ ০০ ও যার শো

।মা গা রা সা । সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা গরা ।গরা সা -া -া ।

-া ভা তা র স ঙ্ গে ও ও ও গে ছে০ গো০ ও ও ও

।-া -া পা পা । া পা পা ধা । -া পা ধা ণা- । পা ধা -া -া ।

ও ও এ খ ও ন্ কৃ ষ্ণ ও না মে ও ও ও ও ও

-া -া র্সণা ধা। পা পা পা পা । ণা ধা পা মা । পা মা পমা গা ।

ও ও ০০ ও ও র মা লা ও গেঁ থে ও দে ও না০ ও

। গা মগা রা সা । -া সা গা সা । গা পমা গা রা । সা রা সা ণ্া ।

আ ০০ মা ও ও র গ লে তে ০০ ও ও ও ও গো ও

।ধ্া সা সা রা । গরা সা -া -া । -া -া সা সসা ।।

ও ও ল লি তে০ ও ও ও ও ও আ মার

।।-া -া গমা পা । -া পা মা গা । মগা রা সা -া । রসা ন্া সা রা ।

ও ও আ০ ও ও র বি শ ০০ খা নে ও ০০ ও হা তে

Dhaka University Institutional Repository

। মা মা পা পা । গমা গা -া -া । গা মা গা রগা। সরা সা গা গা ।

র বা লা ০ ০০ ০ ০০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ চ ম্প

। মা গা রা সা । সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা গরা । গরা সা -া -া ।

০ কা নে ০ গ ০ লা ০ ০ র মা লা ০ গো ০ ০ ০

। -া -া -া -া । -া -া পা ধা । -া পা ধা ণা। পা ধা -া -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ সু চি ০ ত্রা নে ০ ০ ০ ০ ০

। -া -া র্সণা ধা । পা -া পা পা । ণা ধা পা মা । পা মা পমা গা ।

০ ০ ০০ ০ ০ ০ কা নে র পা শা ০ আ ০ শা ০ ০

।গা মগা রা সা । -া সা সা গা । গা পমা গা রা । সা রা সা ণ্া ।

না ০ই আ ০ ০ র বাঁ চি তে ০০ ০ ০ ও ০ গো ০

।ধ্া সা সা রা । গরা গা -া -া । -া -া সা সসা ।।

০ ০ ল লি তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মার্

।।-া গা গমা পা। -া পা মা গা । মৃগা রা সা -া । রসা না সা রা ।

০ প্রা ণে ০ ০ ০ র ব ন্ধু ০০ য দি ০ ০০ ০ আ সে

।মা মা মা পা । গমা গা -া -া । গা মা গা রগা । সরা সা গা গা ।

০ দ্যা শে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ আ সে

।মা মা মা পা । গমা গা -া -া । গা মা গা রগা ।সরা সা গা গা ।

র দে শে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ব লি

। মা গা রা সা । সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা সরা । গরা সা -া -া ।

স্ তো রা ০ ব ন ধূ ০ ০ র কা ছে ০ গো ০ ০ ০ ০

।-া -া পা পা । -া পা পা ধা । -া পা ধা ণা । পা ধা -া -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ই কৃ ষ্ণ ০ শো কে ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

। -া -া র্সণা ধা । পা পা পা ণা । ধা পা পা মা । পা মা পমা গা ।

ও ও ওও ও ও প্রা ণ ত্যা জি ও ছে ও য ও মু ও ও

। গা মগা রা সা । -া -া সা গা । গা পমা গা রা । সা রা সা ণ্া ।

না ওও র ও ও ও জ লে তে ওও ও ও ও ও গো ও

। ধ্া সা সা রা । গরা সা -া -া । -া -া সা সসা । ।

ও ও ল লি তে ও ও ও ও ও আ মার্

fvwUqvjx Mvb

ওরে বন্ধুরে, মনের কথা কইবার আগে

আঁখি ঝইরা যায় আমার মত ব্যথা লইয়া

পাষাণ ভাঙ্গি যে হায়।

আশা দিয়া ঘর বান্ধিনু সোনার বালুর চরে

তুমি না আইলারে বন্ধু, ঘর যে নিল ঝড়ে রে বন্ধু

ঘসিয়া ঘসিয়া জ্বলে দুঃখেরি অনল

মোর পরাণ জ্বালায়।

শিল্পী: শচীনদেব বর্মন, রেকর্ড সংখ্যা-এল পি ১৪২৩-০০০২

। । -া -া র্সা র্সা । -া -া -া -া । -া -া না র্সনা। র্সনা ধা পা পা ।

ও ও ও রে ও ও ও ও ও ও ও রেও ওও ব ন্ ধু

। পা ধা -া -া । -া -া -া -া । -া -া পধা নর্সা । ণধা ণা পধা পা ।

রে ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ওও ওও ওও ওও ওও ও

।-া মা গা -া । -া -া -া -া । -া -া গা গা। মা পা পণা ধাপা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম নে র ক থা০ ০০

।-া গা মগা রা। সা -া ণ্া ধ্া । -া -া ধ্াসা । -া রা মা গা ।

০ ক ই০ বার আ ০ গে ০ ০ ০ আঁ ্া খি ০ ঝই র‍্যা ০

। -া গরা সরসা -া ।-া -া -া -া । -া -া সা রা । ণ্া সা সা -া ।

০ যা০ ০০০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র ম ত ০

। -া :রা মা মা। :মা পা পধা ণধা । পধাণা র্সা -া -া । -া -াসা পা ।

০ বা ০ থা ল০ ই য়া ০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

।-া -া র্সা র্সরর্সা।-া ণধা পধা মা । পা -া -া ণা। ধাপা মাগা রসা ধ্সা ।

০ ০ পা য়া০০ ০ ণ০ ভা০ ০ ঙি ০ ০ নে হা০ ০০ ০০ য়০

।। -া -া গা গপমা । -া গরা রগা সা । -া গা পা পা । পা ধা ধর্সা নর্সা ।

০ ০ আ শা০০ ০ দি০ য়া০ ০ ০ ঘ র বান্ ধি ০ নু০ ০০

। -া -া পা পা । ধা মা মা পা । পা -া পধা মা। পা -া -া গা ।

০ ০ সো নার্ র বা লু ০ চ ০ রে০ ০ ০ ০০ ০

।-া -া পা ধা। -া ধা র্সণা ধণা । পা পা -া ণধা। -া -া -া -া ।

০ ০ তু মি ০ না আ০ ০০ ই লা ০ রে০ ০ ০ ০ ০

।পা মা মা -া । -া পা -া ণধা। ধা পা ধপা মা । মা গা গা রা ।

ব ন্ ধূ ০ ০ ঘ ০ যে০ নি ০ ল০ ০ ঝ ০ ড়ে ০

।সা -া ণ্া ধ্া । -া ধ্া সা সা । রা গা সা রা । গা রা রা সা ।।

ব ন্ ধূ ০ ০ ঘ র য়ে নি ০ ল ০ ঝ ০ ড়ে ০

।। -া -া র্সা র্সা । র্রা র্রা র্রা র্সা । র্সা -া র্সা র্না । র্গা র্রা র্রর্মা র্গর্মা ।

০ ০ ঘ সি ০ য়া ঘ ০ সি ০ য়া ০ জ্ব ০ লে০ ০০

। র্রা র্সা : র্সা র্সর্রা । র্সা ণা ণধপধা পা। পা মা -া -া । -া -া মা -া ।

০ ০ দু: খে০ ০ রি অ০০০ ০ ন ০ ০ ল ০ ০ মো র

। -া -া পা পা । ণা ধপা পধপা পা । মপা গম, -া -া । -া -া -া -া ।।

০ ০ প রা ০ ণ০ জ্ব০০ ০ লা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

fwUqv j x Mvb

এমন প্রেমের নদীতে সই গো ডুব দিলাম না।

নদীর কূলে কূলে বেড়াই পাইনা ঘাটের ঠিকানা

নিত্য ঘাটে আসি বসি জলের ছায়ায় ঐরূপ দেখি গো

জলে নামি নামি নামি করি মরণ ভয়ে নামি না।

জলে পদ্ম স্থলে পদ্মা, পদ্মে কত মধু আছে গো,

কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম, গোবরা পোকা জানে না।

চন্ডীদাস আর রজকিনী তারা প্রেমের শিরোমণি গো

তারা এক মরণে দুইজন মরে এমন মরে কয়জনা।

সা সসা।। সা -া রা -া। -া রা গা রসা। সা -া -া গা। গা মা মগা রসা ।

এ মন প্রে ০ মে ০ ০ র ন ০০ দী ০ ০ তে স ই গো ০ ০০

। সা রসা ণ্ ধ্ া সা । সা -া গা রগা । সরা সা -া -া । -া -া পা পপা।

ডু ০০ ০০ ব দি ০ লা ০ম না০ ০ ০ ০ ০ ০ ন দীর

। পা ধা -া -া । -া ধা ণধা পা । পা -া -া ণা । ধা পা ধপা মা ।

কূ লে ০ ০ ০ কূ লে০ ০ ঘু ০ ০ রে বে ০ ড়া০ ই

। পা মা পমা গা । গা মগা রা সা । সগা -া গা গা । মা গা মগা রসা ।

পা ই না০ ০ ০ ০০ ঘা ০ টে০ ০ র ঠি কা ০ না০ ০০

। সা রসা ণ্ধ্া সা। সা -া গা রগা । সরা সা -া -া । -া -া সা সসা ।।

ডু ০০ ০০ ব দি ০ লা ০ম না০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মন

।। -া -া ধ্া ধ্া । -া সা সা -া । সা -া রা -া । রা -া গা মা ।

০ ০ নি ত্য ০ ঘা টে ০ আ ০ সি ০ ব ০ সি ০

। সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা গরা । গরা সা -া -া । -া -া পা পা ।

ঐ ০ রূ ০ ০ প দে খি০ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ জ লে

। পা ধা -া -া । -া ধা ণধা পা । পা -া -া ণা । ধা পা ধপা মা ।

না মি ০ ০ ০ না মি০ ০ না ০ ০ মি ক ০ রি০ ০

। পা মা পমা গা । গা মগা রা সা । -া -া সা গা । গা মা মগা রসা ।

ম ০ র০ ণ ভ ০০ য়ে ০ ০ ০ না মি না ০ ০০ ০০

। সা রসা ণ্ধ্া সা । সা -া গা রগা সরা সা -া -া । -া -া সা সা ।।

ডু ০০ ০০ ব দি ০ লা ০ম্ না০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মন্

।। -া -া ধ্া ধ্া । -া সা সা -া । সা -া রা -া । রা -া গা মা ।

০ ০ জ লে ০ প দ্ম ০ স্থ ০ লে ০ প ০ দ্ম ০

। রগা -া -া -া। গা মা গা রগা । সরা সা গা গা । মা গা রা সা ।

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ প দ্মে ০ ক ত ০

। সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা গরা । গরা সা -া -া । -া -া পা পা ।

ম ০ ধু ০ ০ ০ আ ছে০ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ কা লো

। পা ধা -া -া । ধা ধা ণ্ ধা পা । পা -া পা ণ্া । ধা পা ধপা মা।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্র ম ০ ০ র জা নে০ ০ ম ০ ধু র ম ০ র্ম০ ০

। পা মা পমা গো। গা মগা রা সা। -া -া সা গা। গা মা মগা রসা ।

গো ব্ রা০ ০ পো ০০ কা ০ ০ ০ জা নে না ০ ০০ ০০

। সা রসা ণ্া ধ্া সা। সা -া গা রগা । সরা সা -া -া । -া -া সা সসা ।।

ডু ০০ ০০ ব দি ০ লা ০মস্ না০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মন্

।। -া -া ধা ধা । -া সাসা সা সা । সা -া রা -া । রা -া গা মা ।

০ ০ চ ণ্ডী ০ দাস আ র র ০ জ ০ কি ০ নী ০

। রগা -া -া -া । গা না গা রগা । সরা সা গা গা । মা গা রা সা ।

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ তা রা ০ প্রে মে র

। সা রা সা ণ্া । ধ্া সা সা গরা । গরা সা -া -া । -া -া পা পা ।

শি ০ রো ০ ০ ০ ম ণি০ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ তা রা

। পা ধা ধা ধা । ধা -া ণাধা পা। পা পা পা ণা । ধা পা ধপা মা ।

এ ০ ক ম র ০ ণে০ ০ দু ই জ ন ম ০ রে০ ০

পা মা পমা গা । গা মগা রা সা । -া -া সা গা । গা মা মগা রসা ।

এ ০ ম ০ ন্ ম ০০ রে ০ ০ ০ কয় জ না ০ ০০ ০০

। সা রসা ণ্া ধ্া সা । সা -া গা রগা । সরা সা -া -া । -া -া সা সসা ।।

ডু ০০ ০০ ব দি ০ লা ০ ম্ না০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মন

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mvb

আমি যে গহীন গাঙ্গের নাইয়া

সাঁঝের বেলায় নাও বাইয়া যাই আপন মনে চাইয়া

ভাটির টানে বাইয়া চলি ভাইটালি সুরে গাইয়া।

দূর দ্যাশে ভাই পাড়ি দিছি আমার বধূর লাইগ্যা

পূবালী বাতাসে আমার নাওয়ের বাদাম ওড়ে

চান্দের আলোয় গাঙের পানি, চান্দের আলোয় গাঙের পানি

ঠিক্‌রাইয়া পড়ে ভাটির টানে বাইয়া চলি বৈঠা ফেলিয়া।

পা ধা ।। র্সা -া -া -া । -া -া র্রসা না। -া -া না র্সা । না ধা পা মা ।

আ মি যে ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ গ হী ন গা ঙে র

। পা মা গা -া । -া -া -া -া । -া -া সা সা । গা গা গা গা ।

না ই য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সাঁ ঝে র বে লা য়

। গা গা গা মা । পা ধা ণা ধপা । পা ধা পা ধপা । মা গা রা সা ।

না ও বা ই য়া ০ যা ই০ আ ০ প ০ ন ম ০ নে ০

। রা রা সা -া । -া -া -া -া । ।

চা ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

। -া -া মা পা । পা না না -া । না র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্রর্সা না ।

০ ০ ভা টি র টা নে ০ বা ই য়া ০ চ ০ লি০ ০

। -া -া না না। -া র্সা র্রা র্সনা। না র্সা র্সা -া । -া -া -া -া ।

০ ০ ভাই টা ল্ সু রে ০০ গা ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

। না না র্সা স্া । র্সা র্সা র্রর্সা না । না না র্সা না । ধা -া পা -া ।

দূ ও র দ্যা শে ০ ভা০ ই পা ০ ড়ি ০ দি ০ ছি ০

Dhaka University Institutional Repository

। -া -া পা ধা। ধা পা মা পা। গমা মা গা -া। -া -া -া -া।।

০ ০ আ মা র ব ধূ র লা০ ই গ্যা ০ ০ ০ ০ ০

।।-া -া মা পা। -া না না না। না র্সা র্সা -া ।র্সা র্সা র্রসা না ।

০ ০ পূ বা ০ লী বা ০ তা ০ সে ০ আ ০ মা০ র

।-া -া না না। না র্সা র্রা র্সা। না র্সা র্সা -া । -া -া -া -া ।

০ ০ চা ন্দে র আ লো য় গা ০ ঙে র পা ০ নি ০

। -া -া র্সা র্সা। না ধা পা মা। পা মা গা -া । -া -া -া -া ।

০ ০ ঠিক রা ০ ই য়া ০ প ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০

।-া -া সা সা । গা গা গা -া । গা গা গা মা। পা ধা ণা ধপা ।

০ ০ ভা টি র টা নে ০ বা ই য়া ০ চ ০ লি ০০

। পা ধা পা ধপা। মা গা রা সা। সা -া -া -া। -া -া -া -া ।।

বৈ ০ ঠা ০০ ফে ০ লি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

fwUqv j x Mvb

চাইয়া দ্যাখ্‌রে দেখরে সুবল কে যায় কদমতলায়

নীলাম্বরী শাড়ি পইর‍্যা কলসি কাঁখে যায় যমুনায়।

তারে কে পাঠাইল হেথায় দয়া কি নাই ও তার হিয়ার

যৈবনের আগুন জ্বাইল্যা রূপের উজান বইয়া যায়।

প্রেমের ফাঁদে পা বাড়াইলাম রূপ সায়রে ডুইবা মরলাম

রূপ সায়রে ডুইবা মরলাম, কইয়া যাবে ও ভাই সুবল

এখন করি কী উপায়।

একা বইস্যা কদমতলে চাইয়া থাকি যমুনার জলে

বাঁশি বাজাই একলা বইস্যা, প্রেমে উদাস করে আমায়।

।।-া -া গা গা। -া মা পা -া। পা ধা পা -া। মা গা রা সা।

০ ০ চাই য়া ০ দ্যাখ্ রে ০ দে খ রে ০ সু ০ ব ল

। -া -া গা গা। -া মা পা -া। মা -া গা -া। -া -া -া -া।

০ ০ কে যা য় ক দ ম্ ত ০ লা ০ ০ ০ ০ য়

।-া -া সা সা। -া গা গা মা। পা পা ধা ধা। না না র্সা -া।

০ ০ নী লা ম ব রী ০ শা ০ ড়ি ০ প ই র্যা ০

।র্সা র্রা র্সা -া। ণা ধা পা -া। পা মা পা মা। গা -া গা -া।।

ক ল সি ০ কাঁ ০ খে ০ যা য় য ০ মু ০ না য়

।।-া -া ধা -া। ণা ধা পা -া। ধা -া র্সা -া। র্সা -া র্রা র্সা।

০ ০ তা রে ০ কে পা ০ ঠা ই ল ০ হে ০ থা য়

০ ০ প্রে মে র ফাঁ দে ০ পা ০ বা ০ ড়া ০ লা ম

০ ০ এ কা ০ বই স্যা ০ ক ০ দ ম্ ত ০ লে ০

। -া -া পা ধা। -া র্সা র্সা -া। না -া র্সণা ধা। ণা ধা পা -া।

০ ০ যৈ ব ০ নে র ০ আ ০ গু০ না জ্বা ই ল্যা ০

০ ০ কই য়া ০ যা রে ০ ও ০ ভা ই সু ০ ব ল্

০ ০ বাঁ শি বা ০ জা ই এ ক্ লা ০ ব ই স্যা ০

। -া -া পা পা। ণা ধা পা -া। পা সা পা সা। গা -া -া -া।।

০ ০ রূ পে র উ জা ন ব ই য়া ০ যা ০ ০ য়

০ ০ এ খ ন ক রি ০ কি ০ উ ০ পা ০ ০ য়

০ ০ প্রে মে ০ উ দা স্ ক ০ রে ০ আ ০ মা য়

f wiUqv j x Mvb

ওরে সুজন নাইয়া

কোন বা কন্যার দেশে যাওরে, চান্দের ডিঙ্গি বাইয়া।

লক্ষ তারার মানিক জ্বলে

কার চাহনির মানিক জ্বলে

আবছা মেঘের পত্রখানি, কে দিল পাঠাইয়া।

কোন সে কন্যার দীর্ঘ নিঃশ্বাস

আইল বাউরি নায়ে

চোখের জ্বলে তোমার নামটি, লেখে এ মোর গায়ে।

নদীর জলে আর সে কি হায়

কোন সে প্রিয়া দেখে তোমায়।

সাঁঝের পিদিম ভাটায় জ্বালে, কে তোমারে চাইয়া।

রেকর্ড শিল্পী: শচীনদেব বর্মন

।। -া -া সা সা । গা গা গা মা । মা -া পা -া । -া -া -া -া ।

০ ০ ও রে ০ সু জ ল না ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

। পা ধা -া ধা । ধা -া ণধা পা । ধা র্সা র্সা না । ধা না ধা পা ।

কো ন ০ বা ক ০ ন্যা০ র দে ০ শে ০ যা ও রে ০

। -া -া ধা ধা । ণা ধা পা -া । মা পা মা গা । রা মা গা রসা ।।

০ ০ চাঁ দে র্ ডি ঙ্গি ০ বা ই য়া ০ ০ ০ ০ ০০

।। -া সা -া রা । রা -া রা গা । গা মা পা -া । পা -া মা পা ।

০ ল ০ ক্ষ তা ০ রা র্ ন ০ য় ন কো ০ ০ ০

। মা -া গা -া । -া -া -া -া। -া মা -া পা । পা -া পা ধা ।

লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা র চা হ ০ নি র

। ধা র্সা র্সা -া । পা -া মা পা । মা -া গা -া । -া -া -া -া ।

মা ০ নি ক্ জ্ব ০ ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। -া পা -া ধা । র্সা -া র্সা -া । -া র্সা -া র্সা । র্রা র্সা না -া ।

০ আ ব ছা মে ০ ঘে র্ ০ প ০ ত্র খা ০ ০ ০

। র্সা -া -া -া । -া -া -া পা । -া পা -া ধা । র্সা -া র্সা -া ।

নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ব্ ছা মে ০ ঘে র্

। -া র্সা -া র্সা । র্রা র্সা না -া । র্সা -া -া -া । -া -া -া -া ।

০ প ০ ত্র খা ০ ০ ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। -া -া পা পা । ণা ধা ধা -া । মা পা মা গা । রা মা গা রা ।

০ ০ কে দি ০ ল পা ০ ঠা ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

। সা -া সা সা। গা গা গা মা । মা -া পা -া । -া -া -া -া ।।

০ ০ ও রে ০ সু জ ন না ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

।। -া প্াসা সা সা । সা -া সা -া । -া প্সা সা সা । রা সা ন্া -া ।

০ কো০ ন্ সে ক ০ ন্যা র দী ০ র ঘ নি ০ ০ ০

। সা -া -া -া । -া -া -া -া । -া প্সা সা সা । সা রা সা ন্া ।

শ্বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ ০ আ০ ই ল বা উ রি ০

। মা গা গা -া । -া -া -া -া । -া গা গা পা । পা -া পা -া ।

মা ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ চো খে র্ জ ০ লে ০

। -া ধা ধা ণধা। পা পা পা মা। -া রা -া গরা । রা -া সা -া ।

০ তো মা র০ না ম টি ০ ০ লে ০ খে০ এ ০ মো র

।সা -া সা সা । -া -া -া -া ।।

গা ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

।।-া -া সা সা । রা রা রা গা। গা -া -া মা । পা ধা পা মা।

০ ০ ন দী র্ জ লে ০ আ ০ র্ সে কি ০ ০ ০

।পা মা গা -া । -া -া -া -া । -া মা -া পা ।পা -া পা ধা ।

হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ কো ন্ সে প্রি ০ য়া ০

।ধা র্সা র্সা -া । পা -া মা -া । পা মা গা -া । -া -া -া -া ।

দে ০ ০ ০ খে ০ তো ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

।-া -া পা ধা ।র্সা র্সা -া র্সা । -া -া র্সা র্সা । -া র্রা র্সা না ।

০ ০ সাঁ ঝে র পি দি ম ০ ০ ভা টা য় জ্বা ০ ০

।র্সা -া -া -া । -া -া -া -া । -া -া পা পা ।ণা ধা পা মা।

লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কে তো ০ মা রে ০

।মা পা মা গা। রা মা গা রা। -া -া সা সা । গা গা গা মা ।

চা ই য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে ০ সু জ ন্

। মা -া পা -া । -া -া -া -া ।।

না ই য়া ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mvb

সুজন মাঝি রে

কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।

আমি পারের আশায় বইস্যা আছি, আমার লইয়া যাও।

এই পারেতে দরদী নাই ঐ পারেতে যাইবার চাই

হয়না আমার পারে যাওয়া, চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও

দেহের অঞ্চল আমার উড়ায় না বাতাসে

উড়ায় আমার বুকের পাষাণ কাঁপায় না হুঁতাশে।

তোমার দেখা পাই না বলে, নিত্য ভাসি নয়ন জ্বলে

হয়না আমার তোমায় পাওয়া চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও।

শিল্পী : রুনা লায়লা, রেকর্ড সংখ্যা: ৭ই পিই ঃ ৩১৬৯

।। না সা -া । রা জ্ঞা -া । রা -া -া । -া -া -া । রমা -া মা । মা -া মা।

সু জ ন মা ঝি ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কো ন্ ঘা টে লা ০

। গা -া রা । গা রা সা । সা -া -া । -া -া -া । -া -া -া । -া সা সা ।

গা ই বা তো মা র্ না ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

। রা রা মা । রা মা -া । মা মা -া । পা -া পা । ধা ণা ধা । পধা পা -া ।

আ মি ০ পা রে র আ শা য় ব ই স্যা আ ছি ০ ০০ ০ ০

। -া -া -া । -া -া র্সা । -া -া -া । পা পা -া । পা -া পা । ধা পা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ আ মা য় ল ০ ই য়া ০ ০

। মা -া া । -া গা -া । রা গা রা । -া -া -া । -া -া -া । -া -া -া ।।

যা ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ও ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

।।পা -া রা। মা পা -া । ধা র্সা -া । র্সা র্রা -া । র্সা -া -া । -া -া -া ।

এ ই পা রে তে ০ দ র ০ দী না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

।-া -া -া ।-া -া -া । র্সা -া র্রা । র্রা র্রা -া । র্রা র্সা র্সর্রা । র্গা র্রা র্সা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ই পা রে তে ০ যা ই বা০ ০ র ০

।র্সা -া -া । -া -া -া । -া -া -া । না র্সা না । ধা ণা ধা । পধা ণপা -া ।

চা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ই ০

।পা র্সা র্সা। -া র্সা র্রা । র্সা ণা -া । ধা পমা -া । পা ণা ণা । ধা পা মা ।

হ য় না ০ আ মার্ পা ড়ে ০ যাও য়া০ ০ চ ন্ চ লি য়া ০

।পা -া ণা । ধা পা মা । মা -া -া । -া -া গা । রগা রা -া । -া -া -া ।।

চ ০ ০ লি য়া ০ যা ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০

কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও

।।গা গা -া । মা গা -া । মা জ্ঞা -া । র সণ্ া । সা স্া মা । জ্ঞা রা জ্ঞা ।

দে হে ০ র্ অ ন্ চ ল ০ আ মা০ ০ উ ড়া য় না বা ০

।সরা স-া । -া -া -া ।মা মা পা। পা পণা ধণা ।পধা পা -া । -া -া -া ।

তা০ সে ০ ০ ০ ০ উ ড়া য় আ মা০ ০০ ০০ ০ র ০ ০ ০

।ধপা মা-া । মা পা -া । পণা ধা -া ।পা মা -া । গ রসা -া । গা গা -া ।

০০ ০ ০ উ ড়া য় আ মা র বু কে র পা ষা০ ণ্ কাঁ পা য়

।রা গা রা। সা -া সা । -া -া -া । -া -া ।।

না ০ হুঁ তা ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

।।পা -া রা। মা পা -া । ধা র্সা -া ।র্সা র্রা -া । র্সা -া -া । -া -া -া ।

তো মা র দে খা ও পা ই না ব লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

। -া -া -া । -া -া -া । র্সা -া র্রা। র্রা র্রা -া । র্রা র্সা সর্রা । র্গা র্রা র্সা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ত্য ভা সি ০ ন য় ন০ জ লে ০

। র্সা -া -া । -া -া । -া -া । না র্সা না । ধা ণা ধা । পধা ণপা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০

। পা র্সা র্সা । -া র্সা র্রা । র্সা ণা -া । ধা পমা -া পা ণ্য ণা । ধা পা মা।

হ য় না ০ আ মা তো মা য় পা ও য়া চ ন্ চ লি য়া ০

। পা -া ণা । ধা পা মা । মা -া -া । -া -া গা । রগা রা -া । -া -া -া ।।

চ ০ ০ লি য়া ০ য়া ০ ০ ০ ০ ও ০০ ০ ০ ০ ০ ০

কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।

fvwUqvjx Mvb

নিদাগেতে দাগ লাগালি প্রাণের বন্ধু কালিয়া,

আমার প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়।

সর্পের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিয়ে উজান ধায়,

ওঝা বৈদ্যের নাই গো সাধ্য ঝাইড়া প্রেমের বিষ নামায়।

হাইট্যা যাইতে পাড়ার লোকে কতই মন্দ কইয়া যায়,

লোকের মন্দ পুষ্পচন্দন অলঙ্কার পইর‍্যাছি গায়।

।। -া -া সা সা । -া গা গা মা ।

০ ০ নি দা ০ গে তে ০

। মা পা পা পা। পা ধা র্সণা ধপা । পা ধা পা মা । গা মগা রসা -া ।

দা ০ গ লা গা ০ লি০ ০০ প্রা ০ ণে র ব ০ন্ ধু০ ০

Dhaka University Institutional Repository

।সা গা গা পা । পা মা মা পা । গমা গা -া -া । -া -া পা মমা ।

ও ও কা লি য়া ও ও ও ০০ ও ও ও ও ও আ মার্

।গা মা মগা রা। সা রসা ণ্া ধ্া । ধ্া সা সা সা । গা রা রা গা ।

প্রে ও ০০ ম জ্বা ০০ লা ও ও য় প্রা ণ যা ও ও ও

।সরা সা -া -া । -া -া -া সা । -া -া সা সা । -া গা গা মা ।

০০ ও ও ও ও ও ও য় ও ও নি দা ও গে তে ও

।র্সা না র্সা র্সা ।র্গা র্রা র্সা র্রা । নর্সা না না র্সা । র্সা -া র্গা র্র র্গা ।

ও ন্ প্রে মে র বি যে ও উ০ ও জা ন্ ধা ও ও ও ০০

।র্সর্রা র্সা -া -া । -া -া -া র্সা । -া -া না না । র্সা র্সা র্র র্সা না।

ও ও ও ও ও ও ও ও য় ও ও ও বৈ দৌ০ র

।না র্সা না ধা । পা ধা ণা ধা । পা ধা ধাপা মা । গা মগা রা সা ।

না ই গো ও ও ও সা ধ্য ঝা ও ই০ ড়া প্রে ০০ মে ও

।-া সা গগা মা । পা ধা পা মমা । গা মা মগা রা । সা রসা ণ্া ধ্া ।

ও র বিষ না মা য় আ মার প্রে ০০ ও ম্ জ্বা ০০ লা ও

।ধ্া সা সা সা । গা রা রা গা । সরা সা -া -া । -া -া । -া -া সা ।

ও য় প্রা ণ যা ও ও ও ০০ ও ও ও ও ও ও য়

।-া -া সা সা। -া গা গা মা ।।

ও ও নি দা ও গে তে ও

।।-া -া মামা পা । -া নানা না -া । না র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সর্গা।র্রা ।

ও ও হাই টা ও যাই তে ও পা ও ড়া র লো ও কে০ ও

।র্সা না র্সা র্সা । র্গা র্রা র্সা র্রা । নর্সা না না র্সা। র্সা -া র্গা র্র র্গা ।

ও ও ক ত ই ম ন্দ ও ক০ ই য়া ও যা ও ও ০০

Dhaka University Institutional Repository

। সার্রা। র্সা -া -া । -া -া -া র্সা । -া -া না না। র্সা র্সা র্র র্সা না।

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ লো কে র ম ন্দ০ ০

। না র্সা না ধা । পা ধা না ধধা । পা ধা ধপা মা । গা মগা রা সা ।

পু ০ ষ্প ০ ০ ০ চ ন্দন্ অ ০ ০০ ল ঙ্কা ০র্ প ই

। -া গা গা মা। পা ধা পা মামা । গা মা মগা রা । রা রসা র্ণা ধ্া ।

০ ০ রা ছি গা য় আ মার প্রে ০ ০০ ম জ্জা ০০ লা ০

। ধ্া সা সা সা। গা রা -া গা । সরা সা -া -া । -া -া -া সা ।

০ য় প্রা ন যা ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

। -া -া সা সা । -া গা গা মা । ।

০ ০ নি দা ০ গে তে ০

fwUqv j x Mvb

চিকণ গোয়ালিনি রসের বিনোদিনী

এই রূপ যৌবন তোমার জোয়ারের পানি।

নিতি নিতি যাও গো রাধে আমারে ভাড়াইয়া

আজি খেয়ার কড়ি লইব নৌকাতে বসাইয়া।

সকলেরে পার করিতে লইব আনা আনা

তোমার পার করতে গেলে লইবো কানের সোনা।

তুমি যে গোয়ালের কন্যা তোমায় আমি জানি

মথুরাতে বেচো দধি মিশাইয়া পানি।

। -া -া -া সা ।

০ ০ ০ চি

। । রমা মা মপা। পা পা -া পা । ধর্সা র্সা ণা ধপা। পধা পমা -া -া ।

Dhaka University Institutional Repository

ক০ ণ গো লি নি ০ র সে ০ র বি নো০ দি০ নী০ ০ ০

। পধা বধা ধপা পা। পমা মধা ধপা পধা । -া পধা : পা মা । পা গরা সরা গা।

এই রূপ যৌ০ ব ন০ তো০ মা০ ০র ০ জোয়া রে র পা নি০ রে০ চি

। গা : রা গা রসা । সা সা -া -া । ।

ক : ণ গো য়া০ লি নি ০ ০

।। -া পপা : ধা র্সা। র্সা : র্সা র্সা ণধপা। -া পপা: ধা র্সা। র্সারর্সা -া -া -া ।

০ নিতি: নি তি যাও : গো রা ধে০০ ০ আমা রে ভা ড়াইয়া ০ ০ ০

। -া ধধা : ধা ধা । পা পমা মধা ধপা। -া পা ধপা মা । গা গরা সরা গা ।

০ আজি : খে যার ক ড়ি০ লই ব০ ০ নৌ কাতে ০ সাই য়া: রে০ চি

। গা : রা গা রসা। সা সা -া -া ।।

ক : ণ গো য়া০ লি নি ০ ০

।। -া পাপা : ধা র্সা । র্সা : র্সা র্সা ণধপা। -া পপা : ধা র্সা। সর্রা র্সা -া -া ।

০ সক : লে রে পার : ক রি তে০০ ০ লইব আ না আনা ০ ০ ০

। -া প্রধা :ধা ধা। পা পমা মধা ধপা। -া পা : ধা পমা । গা গরা সরা গা ।

০ তোমা: রে পার কর তে০ গে০ লে০ ০ লই বো কানের সো নাও রে০ চি

। গা রা গা রসা । সা সা -া -া ।।

ক ণ গোঁ য়া০ লি নি ০ ০

।। -া পপা : ধা র্সা। র্সা র্সা র্সা ণধপা। -া পপা : ধা র্সা। সর্রা র্সা -া -া ।

০ তুমি : যে গো য়া লের ক ন্যা০০ ০ তোমায় আ মি জানি ০ ০ ০

। -া ধধা ধা ধা। পা পমা মধা ধপা । -া পধা : পা মা। গা গরা সরা গা।

০ মথু রা তে বে চো০ দ০ ধি০ ০ মিশা : ই য়া পা নি০ রে০ চি

। গা রা গা রসা। সা সা -া -া ।। ক ০ণ গো য়া লি নি ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

Ió Aa¨vq

fwUqvjx Mv‡b e¨eüZ ev‘¨hš

†‘vZviv

কোরডোং মোরডোং কোরডোং মোরডোং

করে মোর দোতারারে

ও মোর শিমলা কাঠের দোতারা।

বাংলার নিজস্ব উপাদানের সমন্বয় ও উদ্ভাবন পদ্ধতিতে যতগুলো বাদ্যযন্ত্রের বিকাশ ও চর্চা এখানে হয়ে থাকে তার মধ্যে দোতারা অন্যতম। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার জনগণ এ বাদ্যযন্ত্রের সুর উপভোগ করে আসছে। রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলা সঙ্গীত' নামক গ্রন্থে বলেন- পদ্মপুরাণেও দোতারার উল্লেখ আছে। ড. আহমদ শরীফ এর মতে- প্রাচীন বাংলায় এবং মধ্যযুগে বসন্ত রাগের সাথে তারসঙ্গত হিসেবে যে সব বাদ্যযন্ত্র বাঁজানো হয় তার মধ্যে দোতারা অন্যতম। দোতারা সহযোগের গানে বলা হয়েছে- ও মোর গুই সাপের দোতারা পোন্নাম করি তোরে। এর মূল কাঠামোটি ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত। ইউ আকৃতির কাঠের কাঠামোর সাথে চামড়া ও তার যুক্ত হয়ে তৈরি হয় দোতারা। এটি তত শ্রেণির লোকবাদ্যযন্ত্র ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মারফতি, মাইজভাণ্ডারি প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে দোতারা বাজানো হয়। ভাওয়াইয়া গানে এটি একক সুরানুসরণকারী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লোকসঙ্গীতে দোতারার এত জনপ্রিয়তার কারণ হলো এ যন্ত্রের বাদনে একই সাথে সুর ও তাল দুটিই পাওয়া যায়। ফলে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শিল্পীকে অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয় না। তাছাড়া এটি তৈরির উপাদান মানুষের কাছে সহজলভ্য হওয়ার ফলে যে কেউ এটি নির্মাণ করতে পারে। লোকসঙ্গীতের প্রধানতম দিক হলো গ্রাম্য জীবনের সাথে সংশ্লিষ্টতা। গ্রামীণ জীবনে লোককবিগণ যে কোন স্থানে বসেই গানের চর্চা ও রচনা করে থাকেন। দোতারার গঠনগত কারণে যে কোন স্থানে বহনযোগ্য হওয়ার ফলে প্রায় সব ধরনের লোকসঙ্গীতেই এটি বাদ্য হয়েছে।

দোতারার মূল কাঠামোটি তৈরি হয় সাধারণত কাঁঠাল অথবা নিম কাঠ দিয়ে। মূল কাঠামো বা ছাউনি থেকে শুরু করে সুর নিয়ন্ত্রণকারী কান পর্যন্ত প্রায় দুই হাতের মতো লম্বা এটি হয়ে থাকে। দোতারায় সর্বমোট চারটি তার থাকলেও দুটি তার সব সময়ের জন্য একই সাথে বাদ্য হয়। এ সময় একটিতে সুর বাজানো

হয়ে থাকে এবং অন্যটির মাধ্যমে তাল রক্ষা করা হয়। গীটার কিংবা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মতো দোতারায় কোন ধরনের স্বর বা সুরস্থান নির্ধারণ করা থাকে না। শিল্পীকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আঙ্গুল চালনা করে সুর নির্ধারণ করতে হয়। যা নির্ভর করে শিল্পীর সুরস্থান নির্ধারণের দক্ষতার উপর। এ কারণে শিল্পীকে এর প্রতি গভীর মনোযোগী হতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন দোতারার সুর ও মনের সুরকে এক করে তারের মাধ্যমে এটি বাঁজাতে হয় বলে এর নাম দোতারা। দোতারার সুর উৎপাদনে মোট চারটি তার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যের দুটি তার একটি সুরে বাঁধা থাকে সাধারণত সে স্বরটি হয় 'সা'। সবচেয়ে উপরের মোটা তারটি বাঁধা হয় উদারার পঞ্চম বা 'পা' স্বরে এবং নিচের ধাতু নির্মিত তারটি বাঁধা হয় শুদ্ধ 'মা' স্বরে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের সময় কখনো কখনো 'মা' স্বরকে 'সা' ধরে এটি বাদ্য হয়ে থাকে। দোতরাকে বাদনশৈলীর দিক থেকে অনুগামী বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। এটির মাধ্যমে শিল্পী পরিবেশিত গানের সুরকে হুবহু অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে একই সাথে গানের সুরকে অনুসরণ ও তালের রূপ ধরে রাখার কারণে দোতারা এদেশের লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দোতারাকে লোকবাদ্যযন্ত্র বলা হলেও এদেশের নাগরিক ধাঁচের গানেও এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সহ বাংলার পঞ্চ-গীতিকবির গানেও এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে লোক আঙ্গিক বা পর্যায়ের গানকে সুর ও কথার ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রাধান্য দিয়ে এর বিষয়াবলীকে উপভোগ্য করার জন্য দোতারার ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দোতারা

GKZviv

আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসের সাথে একতারা নামক বাদ্যযন্ত্রের যোগসূত্রটা অনেক দিনের। চর্যায় ১৭ নং উল্লিখিতপদে একতারা নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রস্তুতরীতির বর্ণনা দেখতে পাই। বাংলাদেশে প্রচলিত একতারার সাথে অন্যান্য সঙ্গীতাঞ্চলে প্রচলিত একতারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অন্যান্য সঙ্গীতরীতির বর্ণনায় যে সকল একতারার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই, সে একতারা তৈরির জন্য একটি লাউয়ের এক চতুর্থাংশ খোলের প্রয়োজন পড়ে। খোলের মুখে চামড়ার ছাউনি দিয়ে তার উপর একটি সওয়ারী বসানো হয়। লাউয়ের খোলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বাঁশের অংশ। বাঁশের এক মাথায় ছোট কান বা কাঠি লাগানো থাকে যেটার সাথে লাউয়ের সওয়ারী হয়ে বয়ে আসা তারের সংযোগ স্থাপন করা হয়। বাঁশের সাথে হাত রেখে তর্জনীর স্পর্ষে এ বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয়ে থাকে। বাঁশের অন্য মাথায় রক্ষিত কানের মাধ্যমে এর স্কেল বা সুর উঠানামার কাজটি করা হয়ে থাকে। এর সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত একতারা নামক বাদ্যযন্ত্রের যথেষ্ট গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। তবে সুর সৃষ্টি বা উৎপাদনের বিষয়টি দুটি বাদ্যযন্ত্রেরই প্রায় একই রকম।

এটি ততশ্রেণির বাদ্যযন্ত্র। বাউল গানের জন্য একতারাকে অপরিহার্য বলা হয়ে থাকে। তবে যে কোন ধরনের প্রার্থনামূলক লোকগানে এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চোখে পড়ার মত। বলা হয়ে থাকে মন এবং সুর বা গানকে একই স্থানে এনে সঙ্গীত আকারে পরিবেশনের উপযোগী করতে একতারা বেশ কার্যকর। প্রাচীন কালে যে সাম গান প্রচলিত ছিল তার পরিবেশনায় একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার দেখা যেতো। সাধারণত আমাদের ভাটিয়ালী, বাউল গানে যে ধরনের একতারা ব্যবহার করা হয় তা প্রস্তুত করা হয় লাউয়ের খোল থেকে। লাউয়ের খোলের গা বেয়ে একটি বাঁশের দুটি ভাগ করা অংশ নেমে আসে। বাঁশের মাথার অংশটি অচ্ছেদ্য থাকে। সেই মাথার সাথে একটি কান বা চাবি লাগানো হয় যেখানে ধাতুর তার বাঁধা থাকে। তারের অন্য মাথা বাঁধা থাকে লাউয়ের নিচের অংশে, যেখানে চামড়ার ছাউনি থাকে। বাঁশের ছড়ির মাঝদিয়ে বয়ে যায় তার। বাঁশের ছড়ির উপর হাত রেখে তর্জনীর আঘাতের মাধ্যমে বাজানো হয় একতারা।

একতারা বাজানোর সময় কেউ কেউ মিজরাব ব্যবহার করে থাকেন। মিজরাবটি তর্জনী অথবা মধ্যমার সাথে লাগানো থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিজরাব ছাড়া এ বাদ্যযন্ত্রটি পরিবেশন করা হয়। একতারায় একই সাথে সুর, গমক এবং তাল তিনটিই পাওয়া যায়। সাধারণত ডান হাতে একতারার তার

এবং বাম হাতে থাকে একতারার দেহ বা কাঠামো। তারে আঘাতের সাথে সাথে বাম হাত দিয়ে দেহের মধ্যে চাপ-প্রয়োগ করলে গমকসহ সুর উৎপাদন হয়ে থাকে। একতারাকে অনেকে 'একতন্ত্রবীণা' নামে অভিহিত করেছেন। একতারা তৈরিকরণ, বাজানো এবং শিক্ষা এই তিনটি রীতিই অতি সহজ ও সরল। একতারায় যে তাল উৎপাদন হয় বাউলগণ সে তালের মাধ্যমে নিজেদের দেহকে আন্দোলিত করেন। বাংলার বাদ্যযন্ত্রের মতো এদেশের মানুষের দেহের নৃত্যের ভঙ্গিও একই রীতিতে বাঁধা। মুসলিম বাউল বা সুফি সাধকেরা যে একতারা ব্যবহার করে থাকে সেটির খোল কাঠের কিংবা টিনের পাতের তৈরি হতে দেখা যায়। কোন বিশেষ ধরনের কারুকার্য একতারার বাদনশৈলীতে কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার না করলেও বর্তমানে এর মধ্যে সৌখিন বাজিয়েদের প্রবেশের ফলে একতারায় কারুশিল্পেরও প্রভাব পড়েছে। একতারা বাদ্যযন্ত্রটি কোন কোন এলাকায় গোপীযন্ত্র নামেও পরিচিত। ভাটিয়ালী গানের পরিবেশনার ক্ষেত্রে একতারার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একতারার মাধ্যমে যে সুরটি ধরে রাখা হয় তা একজন ভাটিয়ালী গায়কের জন্যে তা যথেষ্ট। ভাটিয়ালী গানের সাথে আধ্যাত্মিক ভাব যুক্ত থাকার ফলে প্রার্থনার অংশ হিসেবে ভাটিয়ালী গান মানুষের কাছে জনপ্রিয়। একতারার মতো সহজ-সরল বাদ্যের সহযোগে এর পরিবেশনা হয়ে উঠেছে আরো বেশি সহজতর। এক ঈশ্বরের সাধনায় একতারের অতিসুক্ষ্ম সুর ও ভাটিয়ালী গানে টানা উদাস সুরের ব্যবহার এদেশের মানুষের সঙ্গীত হৃদয়কে সবসময় জাগ্রত করে রেখেছে।

বিভিন্ন ধরনের একতারা

Dhaka University Institutional Repository

LgK

ততশ্রেণির বাদ্যযন্ত্রে সাথে অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের কোথাও কোথাও মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি সুতা কিংবা ধাতুর তার জাতীয় কোন উপাদান এ সকল বাদ্যযন্ত্রে বৈচিত্র্য এনে দেয়। একই সাথে এটি তাল যন্ত্র এবং কোথাও কোথাও ধ্বনি উৎপাদনে এটি বাদ্য হয়ে থাকে। ছোট ঢোলের মতো এ বাদ্যযন্ত্রে এক মুখ ফাঁকা থাকে অন্য মুখে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। ছাউনির মাথা থেকে কোন ধরনের ছোট খাদের বা আংটার সাথে বিশেষ ধরনের তার বাঁধা হয়। সে তারের অন্য মাথা একটি বিশেষ ধরনের শলার সাথে বাঁধা হয়। শলাটিকে বাম হাতে ধরে, খমককে বগলের তলে চেপে রেখে, ডান হাতে রাখা কাঠির মাধ্যমে এটি বাদ্য হয়ে থাকে। বাম হাতের উপর নির্ভর করে সুরটিকে কত বেশি চড়া কিংবা খাদে বাজানো হবে সে বিষয়টি। বাউল গানে খমকের ব্যবহার অতি প্রাচীন। খমকের মাধ্যমে গানের কথায় সে আনন্দভাব লুকায়িত থাকে তা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। স্থান ও কালের পার্থক্যের কারণে এ যন্ত্রকে অনেক স্থানে গুবগুবি কিংবা আনন্দ লহরী বলা হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের অনুষঙ্গ হিসেবে গুবগুবি বা খমক বেশ পরিচিত নাম। নদীতে বসে একজন শিল্পীর পক্ষে যখন সকল ধরনের বাদ্য সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করা সম্ভব হয় না তখন সহজে বহন ও বাদনযোগ্য খমক একমাত্র বাদ্যানুসঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার ব্যবহার করা হলেও খমকের মাধ্যমে গানের কথা ও সুরকে হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। তবে শিল্পীর গানের স্কেল অনুসারে এটি বাদ্য হতে দেখা যায়। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে একইভাবে তাল রেখে আবার কোথাও সুর প্রয়োগ করে এটি বাদ্য হতে দেখা যায়। আমাদের দেশের একেবারেই নিজস্ব এ বাদ্যযন্ত্রটি একক গানে সবচেয়ে বেশি বাদ্য হতে দেখা যায়। আঘাতের বৈচিত্র্যে শিল্পী তার প্রয়োজন মতো খমককে তার গানে ব্যবহার করে থাকে। শহরে নির্মিত খমক ও গ্রাম-বাংলায় সাধারণ মানুষের হাতে নির্মিত খমকের সুর বা বাদন পদ্ধতি এক হলেও এর গঠনে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়, যা লোকগানে সঙ্গতকারী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এর গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিয়ালী গানে ব্যবহৃত খমক

KiZvj

আমাদের দেশের কিংবা বঙ্গ জনপদের অনেক স্থানেই করতাল বা করতাল সাদৃশ্য লোকবাদ্যযন্ত্র প্রাচীন কাল থেকেই এখানকার সঙ্গীতের সাথে যুক্ত হয়ে বাদ্য হতো। প্রাচীন যে সকল নগর কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে সকল সভ্যতার নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে, সেগুলোর প্রায় সবকটিতেই প্রার্থনামূলক সঙ্গীত অথবা জনমানুষের সঙ্গীতে করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ পাওয়া গেছে। করতাল এক ধরনের ঘনবাদ্যযন্ত্র। এটি সাধারণত পিতলের তৈরি হয়ে থাকে। এটির আকার তেমন বড় নয়। তবে আকারে একটু বড় হলেই সেটিকে ঝাঁঝর প্রকৃতির বাদ্যযন্ত্র বলা হয়ে থাকে। করতাল দুটি অংশে বিভক্ত বা এর দুটি অংশ মিলে বাদ্য হয়। মন্দিরার সাথে এর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। তবে যে অংশে দুটি পিতলের উপাদানে আঘাত করা হয় করতালে সেখানকার অংশটি একটু বেঁকে এসে বাইরের দিকে সমান্তরাল হয়ে থাকে। করতালের শব্দ সুমধুর ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র থেকে এর আওয়াজ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকার কারণে কোন আসর কিংবা আনুষ্ঠানিক গীতে এ বাদ্যযন্ত্রের বেশ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

করতাল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর মধ্যে ষটতাল, ষটতালি, ঘটতাল, ঘটতালি, করতালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আঘাত কিংবা বাদ্য হওয়ার সময় এর সৃষ্ট সুরে কিছুটা ঝনঝন শব্দের উৎপত্তি বা সহযোগ হলেও এর সমষ্টিগত উপস্থাপনা বেশ উপভোগ করার মতো।

পিতলের করতাল

ঝাঁঝর কিংবা এ ধরনের বড় বাদ্য নিয়ে নৃত্যের পরিবেশনা কিংবা উপস্থাপনায় একজন শিল্পীকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়, সেক্ষেত্রে করতাল ব্যবহার করলে শব্দের প্রয়োজন পূরণসহ শিল্পী সব ধরনের সুবিধা ভোগ করে থাকেন। গ্রাম-বাংলায় যাত্রা, পালা, পুতুল নাচ, কীর্তন ইত্যাদি গানে করতাল ব্যবহার করতে দেখা যায়। আদিবাসী নৃত্য ও গানে করতালের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। কিছু বাদ্যযন্ত্র গ্রাম-বাংলায় কেবলমাত্র পুরুষেরা পরিবেশন করে থাকে আবার কিছু কেবলমাত্র মেয়েরাই, করতালের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। কারণ এটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে বাদ্য হয়ে থাকে। ছোট পরিসরে যে কোন ধরনের অনুষ্ঠানে একটি সুর যন্ত্র ও একটি তাল যন্ত্র হলেই আয়োজনে আর কোন প্রকার ঘাটতি থাকে না। করতাল সঙ্গীতাসরের সে প্রয়োজন পূরণ করে।

ভাটিয়ালী গানে ব্যবহৃত কাঠ করতাল

আমাদের দেশে করতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু পিতলের ব্যবহার দেখা যায় না, কোথাও কোথাও কাঠের ব্যবহারও দেখা যায়। কাঠের করতাল বাঁজানোর জন্যে একজন শিল্পীর কোন ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। কাঠের দুটি খণ্ডের সাথে মাঝখানে ছিদ্র করে পিতলের চাকতি বসিয়ে দেওয়া হয়। কাঠের একেবারে মাঝখানেই থাকে আঙ্গুল রাখার স্থান। একই হাতের বুড়ো আঙ্গুলে একটি এবং মধ্যমা কিংবা তর্জনীর মধ্যে অন্যটিকে রেখে পরস্পরের সাথে আঘাত করে এ বাদ্যযন্ত্রটিকে বাঁজানো হয়। বাংলার বাউল, বৈষ্ণব ও ভাটিগায়কের গানে কাঠ করতাল ব্যবহার করা হয়।

‘d / Wd

আমাদের লোকসঙ্গীতের ধারাগুলো একটির দ্বারা অন্যটি কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাবের মূলে রয়েছে এখানকার সাধারণ মানুষ, যারা এ ধারার সঙ্গীত চর্চা করে থাকেন। কোন একটি নির্দিষ্ট ধারার গানে ব্যবহৃত কথা কিংবা সুরের প্রভাব অথবা বাদ্যের ব্যবহার অন্যরীতির গানের মধ্যেও খুব সহজে দেখা যায়। দফ বা ডফ সমগোত্রীয় ধারার একটি লোকবাদ্যযন্ত্র যা বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রায় সকল ধরনের গানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে যে ধরনের বাদ্যযন্ত্র একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় তাদের মধ্যে সব সময় একটি সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। চেষ্টা করা হয় একই বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুই ধরনের যন্ত্রের শব্দের সম্মিলন ঘটানোর। সে চেষ্টা থেকেই দফ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। দফের বাদ্যরীতি থেকে একই সঙ্গে ঢোলের শব্দ ও সাথে সাথে রুমঝুম কিংবা ঝনঝন শব্দ ভাটিয়ালী

গানের কথার আবেদনকে আরো বেশি উপভোগ্য করে তুলেছে। তাছাড়া বাংলায় মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়াবলীর মত তাদের সৃষ্টি ও কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এদেশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত উপাদান ও উপকরণসমূহ এক সময় আমাদের চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়। পারস্যে সুফি ধারার গীতে যে ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল সেগুলো এক সময় বাংলার লোকসঙ্গীতেও ব্যবহৃত হয়। সুফি সাধকেরা তাঁদের সাধন সঙ্গীত পরিবেশন করার সময় দফ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

সুফি ধারার সঙ্গীতের প্রভাব আমাদের লোক সঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়েছে। এদেশের লোকসঙ্গীতের মূল বিষয় হলো 'প্রেমের মাধ্যমে সাধনা'। আর তা সম্পাদন হতে পারে সঙ্গীতের মাধ্যমে। সুফিরা তাদের গানে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে ভজনা করে থাকেন। গ্রাম-বাংলার ভাটিয়ালী গায়কও ঠিক একইভাবে তার গানের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতা, সৃষ্টিকর্তা, খোদা, ভগবানকে সন্তুষ্টি প্রদানে সচেষ্ট থাকেন। বাঙালির নিত্যদিনের অনুষ্ঠানে সাঙ্গীতিক উপাদান যেভাবে যুক্ত রয়েছে যেখান থেকে সরে আসলে বাঙালির আত্মপরিচয় খুঁজে বের করতে খেই হারাতে হয়। সাধন, ভজনার বিষয়টি বাঙালি সমাজের কাছে অত্যন্ত পরিচিত হওয়ার ফলে 'দফ' এক সময় আমাদের সঙ্গীত চর্চার উপাদানে পরিণত হয়।

দফ জাতীয় লোকবাদ্যযন্ত্র

evsjv †Xvj

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ বাদ্যযন্ত্রের কাছাকাছি কিংবা দেখতে প্রায় একই রকম বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের নিজস্ব রীতি পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও ভিন্ন ধরনের ব্যবহারের ফলে বাংলা ঢোল এখানকার সঙ্গীতে জনপ্রিয় একটি বাদ্যযন্ত্র। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় আকৃতির হয়ে থাকে। বাংলা ঢোলের মূল আকৃতি গোলাকার, তবে ডান থেকে বাঁয়ে দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এর বাঁ দিকের মুখটি একটু বড় এবং সেখানে অপেক্ষাকৃত পুরু চামড়ার ছাউনি দেয়া হয়। ডান দিকের মুখটি বাঁ দিকের তুলনায় কিছুটা ছোট হয় এবং সেখানে অপেক্ষাকৃত পাতলা চামড়ার ছাউনি দেয়া হয়। দুই মুখে চামড়ার ছাউনি চাক দিয়ে যুক্ত করা হয়। সুর বাঁধার সুবিধার জন্যে আড়াআড়িভাবে ঢোলের গা জুড়ে টানা দেওয়া হয় এবং তার সাথে পিতলের কড়া লাগানো থাকে। এর ফলে প্রয়োজন মত সুর উঠা-নামার কাজটি সমাধান করা যায়। বাংলা ঢোল পরিবেশনার সময় কখনো হাতের আঙ্গুলে কাঠি লাগানো হয়, কেউ কেউ একে কাঠি ঢোল বলে থাকেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে পূজা-পার্বণে, গাজনে কিংবা বিবাহাদি সম্পাদন ও যে কোন ধরনের সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত বা নৃত্যে বাংলা ঢোলের ব্যবহার হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানে ঢোলের ব্যবহার সব সময় দেখা যায় না। ঢোলের উচ্চশব্দে ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তু যাতে না হারায় সে বিষয়টিকে সামনে রেখে ঢোলের সাবধানী ব্যবহার করা হয়। তবে গ্রাম-বাংলার উৎসবে পরিবেশিত ভাটিয়ালী গানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বাংলা ঢোলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। মনের অনুভূতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ও প্রকাশের জন্যে ভাটিয়ালী গানে এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের সঙ্গীতের মূলভাব হল অধ্যাত্ম চেতনা। সুরের চেয়ে কথায় তার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। তবে কথা ও সুরের যুগল মিলন এখানকার সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুরের ভাবকে তালের বাণীতে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করলে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভাটিয়ালী গানে বাংলা ঢোলের ব্যবহার বা প্রয়োগ এর বাণী ও সুরের উৎকর্ষকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ঢোল

g‘½ ev kx‡Lvj

আড়াআড়ি দুই প্রান্তে থাকে চাক। চাক দুটিকে এক থেকে দেড় ইঞ্চি দোয়ালী বা ছোট দিয়ে টেনে যুক্ত করা হয়। মাটির খোলে নির্মিত হয় বলে একে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল বলা হয়। ‘মৃৎ+অঙ্গ’ শব্দের সমষ্টিতে মৃদঙ্গ কথাটি এসেছে। দেড় থেকে পৌনে দুই ফুট মাটির খোল নির্মাণ করে তা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়। বাঁ দিকের মুখের ব্যাস আট থেকে নয় ইঞ্চি এবং ডান দিকের মুখের ব্যাস পাঁচ ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। চৈতন্য যুগকে এ বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভবের সময় হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। যে মধুর ভাবরসে বাংলার প্রতিটি প্রান্তর সে সময় প্লাবিত হয়েছিল সে রসের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে শ্রীখোল বাদ্য হয়েছিল। সাধন ও ভজন প্রভৃতি প্রার্থনামূলক সঙ্গীতের অনুসঙ্গ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। বৈষ্ণব ভাবরসের সাথে সাথে বাংলার পথে প্রান্তরে শ্রীখোলের সুমধুর আওয়াজ এদেশের লোকসঙ্গীতের ধারাগুলোকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল গান ভাটিয়ালী হয়েও বৈষ্ণব ভাবরসে সিক্ত বিশেষ করে সে শ্রেণির গানে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কীর্তন গানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে অনুরাগ ও না পাওয়ার যে বেদনা প্রকাশিত হয়েছে ভাটিয়ালীকে কখনো কখনো সে প্রভাবে প্রভাবিত বলে কল্পনা করা হয়। ভাটিয়ালীতে নির্দিষ্ট কোন দেবতা কিংবা স্রষ্টার সরাসরি নাম প্রকাশ না করলেও যে আকুতি প্রকাশ পায় তা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষেরই পাপ মুক্তির কথা বলে। ভাটিয়ালী গানের সাথে শ্রীখোলের গঠনগত মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে জীবনের বাঁধ না মানা যৌবন, অন্যদিকে ভাটি বেলায় অসহায় সম্বল ও শক্তিহীন বৃদ্ধ কাল। এর সাথে মৃদঙ্গের দুই দিকের

গঠনের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রাথমিকভাবে না থাকলেও সাধন-ভজনের সহায়ক হিসেবে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের ব্যবহার এখানে প্রধান তালযন্ত্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

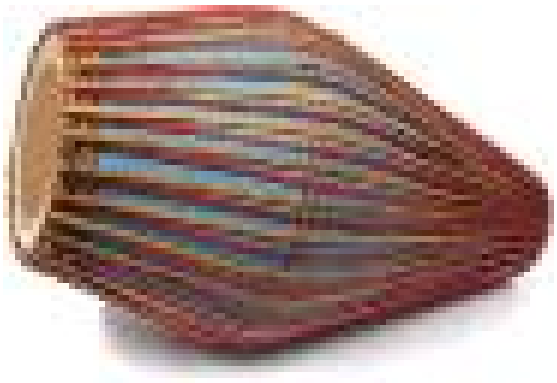

মৃদঙ্গ

mwi›‘v

সারিন্দা এদেশের গ্রাম-বাংলায় নির্মিত একটি লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি কিছুটা বেহালার মত সুর উৎপাদন করে থাকে। বলতে গেলে একে বেহালার গ্রামীণ সংস্করণ হিসেবেও ধরা যায়। এ যন্ত্রের দুটি অংশ থাকে একটি ‘তুম্বা’ অন্যটি ‘ডাণ্ড’ বা ‘ডাণ্ডা’। তুম্বা বলতে নিচের ফাঁপা বা কোদানো অংশকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ অংশকে কোন কোন এলাকায় ‘তবলী’ বলা হয়। তবলী অংশের উপর পশুর পাতলা ধরনের চামড়ার আচ্ছাদন থাকে। তুম্বা ও তবলীর সমন্বয়ে তৈরি হয় ধ্বনি কোষ। ধ্বনি-কোষ অংশে কিছুটা অংশ চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে, আবার কিছু অংশ থাকে অনাবৃত। উপর অংশের দণ্ডের উপর দিয়ে তার নিচের অংশে লাঙ্গুট বা হুকের সাথে বাঁধা হয়। তবলীর উপর হাড়ের তৈরি ‘ঘোড়ি’ বা ব্রিজের উপরদিয়ে তিনটি তার হুকে বাঁধা থাকে। তিন তার যুক্ত এই বাদ্যযন্ত্র বাঁজানোর জন্যে যন্ত্রের উপরিভাগে থাকা কানের সহায়তা নিয়ে স, প, স এ সুর বাঁধা হয়। বাঁ হাতে টিপে ধরে ডান হাতে রাখা ছড়ের ঘর্ষণে এটি বাদ্য হয়ে থাকে।

ভাটিয়ালী গানে এটি অনুগামী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ সুর বাদ্যযন্ত্রই গানের কথা ও সুরের সাথে সাথে বাদ্য হয়ে থাকে। এ সময় শিল্পী যেভাবে গান পরিবেশন করেন বাদ্যেও

তা সমানভাবে অনুসরণ করা হয়। সাধারণত বিচ্ছেদী বা করুণ সুরের প্রয়োগে সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রটি বাঙালির কাছে অতি প্রিয়। লোকসঙ্গীতের বিচ্ছেদী ও ভাটিয়ালী গানের অন্যতম বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সারিন্দা বাদ্য হয়ে আসছে। ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় গীতরীতি পালা গানেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

সারিন্দা

fwUqvjx Mv‡b ev‘¨h‡Ši e¨envi

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে বাদ্যযন্ত্রের সমষ্টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন। ধাতু কিংবা ধাতুর তার নির্মিত বাদ্যযন্ত্রকে সেখানে তত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বীণা, সুরবাহার, সেতার, সরোদ, একতারা, দোতারা ইত্যাদি যন্ত্রগুলোকে এই ভাগে যুক্ত করা হয়েছে। যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাঁশ, কাঠ বা ধাতু নির্মিত এবং মুখে ফুঁ দিয়ে বাঁজাতে হয় সেগুলোকে বলা হয় শুষির যন্ত্র, যেমন বাঁশি, বেণু, মুরলী, সানাই ইত্যাদি। যে সকল বাদ্যযন্ত্রের মুখে চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া থাকে সেগুলোকে বলা হয় আনদ্ধ বা অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, যেমন মৃদঙ্গ, ঢোল, ঢোলক, পাখোয়াজ, মাদল, খঞ্জনি ইত্যাদি। শুধুমাত্র পিতল, কাঁসা ইত্যাদি ধাতু নির্মিত যে সকল বাদ্য যন্ত্র নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে ঘন যন্ত্র বলে, যেমন ঝাঁঝর, কাঁসর, করতাল ইত্যাদি।

দৃশ্যত গ্রাম-বাংলার ভাটিয়ালী গানের মধ্যে একজন গায়ক কিংবা সাধক তেমন কোন বাদ্যের ব্যবহার করেন না। যদি একে আমরা মাঝি ও নৌকার গান হিসেবে উল্লেখ করি তাহলে দেখতে পাই যে, একজন

মাঝির পক্ষে নৌকায় বসে একই সাথে নৌকার হাল ধরে রাখা এবং বাদ্যযন্ত্র বাঁজানো সম্ভব হয় না। কিন্তু পরবর্তীতে সঙ্গীতের উপস্থাপনায় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে এ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে বলা যেতে পারে। মনে করা হয় ভাটির টানে কিংবা জীবন নদীর ভাটির বাঁকে চলার সময় একজন মানুষের হাতে এসে যায় অফুরন্ত সময়, সেটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ভাটিয়ালী গানের বিষয়কে অবতারণা করা হয়েছে। সেখানে বাদ্য বাঁজলো কি না তা একজন গায়ক বা সাধকের কাছে কোন বড় বিষয় নয়। কথা ও সুরের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের অধিশ্বর বা আরাধ্য দেবতা খুশি হলেই ভাটি গায়কের উদ্দেশ্য সফল বলে মনে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

mßg Aa¨vq

Dcmsnvi

বাংলাদেশ ও সমগ্র বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এর জনজীবন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষেরও স্বভাব চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। এখানকার চাষাবাদের জমি বৃষ্টি বিধৌত হওয়ার ফলে বছর শেষে মানুষ প্রচুর পরিমানে ফসল তাদের ঘরে তোলে। কখনো কখনো সুখে ও শান্তিতে বসবাসকারী এসব মানুষের জীবনে নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী মানুষের লড়াইয়ের তুলনায় এ এলাকার মানুষ অনেক বেশি সুখে বসবাস করে। প্রকৃতির এই উদারতা এখানকার মানুষের মনকে করে তুলেছে কমনীয়, দান করেছে ছন্দবদ্ধ সুর। নদীর ঘাট থেকে যে পথের সূচনা হয়ে গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গেছে তা এখানকার মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। আর এ পথ ধরেই এখানকার সাহিত্য, সঙ্গীতসহ সকল ধরনের সৃষ্টিশীল বিষয়ের সম্মিলন ঘটেছে সমগ্র বাংলায়। ভাটিয়ালী গানও ঠিক একই রীতি অনুসরণ করেছে। তাই এ গান এত বেশি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং গ্রামীণ। এখানে রাগসঙ্গীতের মত বিলাসপূর্ণ ও কঠোর অধ্যবসায় বা অনুশাসনের বিষয়টি যুক্ত নেই। সাদাসিধে, অনাড়ম্বর ও অলংকারবিহীন সহজ-সরল এর প্রকাশ। তবে গ্রামীণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা, বিরহ-বিচ্ছেদ, না পাওয়ার বেদনা, আধ্যাত্মিক চেতনা, লোকদর্শন, লোকসাধনা ইত্যাদি এ গানের ছন্দ ও সুরের টানের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে প্রেম সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সেটি সংকীর্ণতার আবর্তে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেণি মর্যাদা নির্বিশেষে সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমেই তাতে সফল হওয়া সম্ভব। সকল কিছুর বাইরে বেরিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আন্তরিক প্রেম-প্রদর্শনই ভাটিয়ালী গানের মূল লক্ষ্য।

ভাটিয়ালী গানের সুরে এক শান্ত ও বৈরাগ্যময় নির্লিপ্তভাব বিরাজ করে। তা শুনলে স্বভাবতঃই মন উদাস হয়ে উঠে। এ গানের সুরের মধ্যে কোন বাঁধা তাল নেই, ভাব প্রকাশই হল এ গানের বাঁধুনী। গায়ক নিজের ইচ্ছামত হৃদয়ের আবেগটুকু উজাড় করে দেয় এ গানে। সে কারণেই এ গানের মধ্যে মানব জীবনের তত্ত্বকথারও পরিচয় পাওয়া যায়। ঘাটের মাঝি সারাজীবন ধরে কত মানুষকে পারাপার করে, কত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের গল্প করে তার আনন্দে দিন কেটেছে। আজ সেই মাঝি বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত। তার মনের জোরও কমে এসেছে। তাই মাঝি তখন ভবনদীর মাঝির নিকট আকুল প্রার্থনা জানায় তাকে অমৃতলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভবনদীর মাঝিকেই সে গুরু জ্ঞানে গ্রহণ করে সেই জগৎগুরুর কৃপাতেই

উদ্ধার পেতে চেয়েছে। ভাটিয়ালীকে আমরা সঙ্গীত হিসেবে চিনলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বাঙালির একান্ত নিজস্ব দর্শন ও লোকসাধন পদ্ধতি।

স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের সময় ভাটিয়ালী গানের মাধ্যমে প্রার্থিত আপনজনের প্রতিও মনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। মাঝির গানের মাধ্যমে ঘাটে ঘাটে তার মনের মানুষকে খুঁজে পাওয়ার যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়, তা ভাটিয়ালীর রোমান্টিক দিকটিকেই তুলে ধরে। নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে গ্রাম্য নারীরা মাঝির যে গান শুনেছেন, সেগুলোকে কণ্ঠে ধারণ করে এনে ছড়িয়ে দিয়েছেন পরিবার ও সমাজে। এর ফলে গ্রামীণ সভ্যতায় একজনের মনের অনুভূতি ক্রমে সকল মানুষের বেদনা কিংবা সুখের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হাজার বছর ধরে এখানকার মানুষের যে আদর্শ 'দেহবাদী সাধন পদ্ধতি' তার প্রভাব ভাটিয়ালী গানে ব্যক্ত হয়েছে। ভাটিয়ালীর আহবানে বাংলার লোককবিসহ অসংখ্য নাগরিক কবি এর সুর ও কথার সীমানাকে আরো বিস্তৃত করেছেন। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও মূল্যবোধ যখনই ক্ষয় হতে শুরু করেছে, তখনই লোককবিগণ তাদের কথা ও সুরের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করেছেন। এরকম হাজারও সৃষ্টি সমাজের মানুষের নিত্যদিনের চর্চার বিষয় হয়ে থাকলেও প্রাথমিকভাবে দীর্ঘ দিন যাবৎ তা মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে প্রবহমান থাকে। দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে এ বাংলায় নানা জাতের মানুষের আগমন বা সম্মেলন ঘটলেও এখানকার সুসংহত ও মজবুত সাংস্কৃতিক ভিত্তির কারণে বাঙালির মানবিক চেতনা বরাবরই একই থেকেছে। সুর ও ভাবের অকৃত্রিমতায় ভাটিয়ালী বাংলার অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। এদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া প্রাচীন যুগের কৌম সমাজ, ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ও তাদের সামাজিক বিকাশ সামগ্রিক গণসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। ভাটিয়ালী গানের দর্শন, সাহিত্যরস এবং ভাবগভীরতা গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষা ও সরলীকৃত সুর অতি সহজেই মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী সংবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

mnvqK MšcwÄ

০১। ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংগীত : ভাটিয়ালী গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী- সেগুনবাগিচা, ঢাকা- জুন- ১৯৯৭।

০২। হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ১৯৮২।

০৩। স্বামী রঘুবরানন্দ, গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা- এপ্রিল- ১৯৭৩।

০৪। বিদিতলাল দাস, সুরমাপারের গান, উৎস প্রকাশন, ঢাকা- সেপ্টেম্বর- ২০০৬।

০৫। ম ন মুস্তাফা, আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা- জুন- ১৯৮১।

০৬। ড. করুণাময় গোস্বামী, প্রসঙ্গ বাংলা গান, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি- ২০০৯।

০৭। ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৩।

০৮। ড. করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৫।

০৯। আবদুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড- বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ফেব্রুয়ারি- ২০০৮।

১০। বুদ্ধদেব রায়, শ্রেষ্ঠ লোকগীতি-স্বরলিপি, ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা- জানুয়ারি- ২০০০।

১১। অশোককুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা- জানুয়ারি- ২০০২।

১২। দিনেন্দ্র চৌধুরী, ভাটিয়ালী গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, এপ্রিল- ২০০২।

১৩। বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, কলকাতা- জানুয়ারি- ২০০৩।

১৪। শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি- ২০০৬।

১৫। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীত সারি গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- জানুয়ারি- ১৯৯৮।

১৬। ডক্টর মোমেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন, ৫৭, জুন- ১৯৯৩।

১৭। মোমেন চৌধুরী, লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, জুন- ১৯৯৭।

১৮। কল্যাণী ঘোষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডমী, ঢাকা, জানুয়ারি-১৯৯৮।

১৯। আফসার আহমদ, গাজীর গান ঃ শিল্পরীতি, বাংলা একাডেমী, আগষ্ট-১৯৯৮।

২০। শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী ফোকলর সংকলন- ৬৪, জুন- ১৯৯৪।

২১। রায়হান রাইন, বাংলার ধর্ম ও দর্শন, সংবেদ প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি- ২০০৯।

২২। আহমদ শরীফ, সংস্কৃতি ভাবনা, উত্তরণ, মার্চ- ২০০৪।

২৩। সুকুমার রায়, লোকসংগীত জিজ্ঞাসা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১৯৮৩।

২৪। দীনেশচন্দ্র সেন, হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, ডিসেম্বর- ২০১০।

২৫। শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ : ৫২, এপ্রিল-জুন- ২০০৮।

২৬। সাইদুর রহমান লিপন, বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, মে- ২০১০।

২৭। অনিমেষকান্তি পাল, লোকসংস্কৃতি, বিকাশ সাধুখা, কলকাতা, ২০০৯।

২৮। মনোয়ারা খাতুন, বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে সমাজ, বাংলা একাডেমী, জুন- ২০০১।

২৯। শাহিদা খাতুন, লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ১৯৯৮।

৩০। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি- ২০০৫।

৩১। এস এম নূর-উল-আলম, চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ২০০৩।

৩২। আলীম আল রাজী, বাংলা লোকনাট্য পালাগান প্রকৃতি ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর- ২০১০।

৩৩। ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, মুকুন্দদাসের গান, গতিধারা, জুলাই- ২০০৯।

৩৪। সুকান্ত পাল, প্রসঙ্গ লোকসংগীত, গণমনপ্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি- ১৯৯৫।

৩৫। তিতাশ চৌধুরী, বৈশাখ ও আমাদের ঐতিহ্যচেতনা, বাংলা একাডেমী, মার্চ-২০০০।

৩৬। যূথিকা বসু, বাংলা গানের আঙিনায়, পুস্তক বিপনি, নভেম্বর- ২০০৪।

৩৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।

৩৮। শামসুজ্জামান খান ও ডঃ মোমেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলনঃ ৫৩, জুন-১৯৯২।

৩৯। দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, পলাশ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি- ২০০২।

৪০। আবদুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, বাংলা একাডেমী, প্রথম খণ্ড, জুন- ২০০৭।

৪১। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীত, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৯।

৪২। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা, ঢাকা- ১৯৯৩।

৪৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং- ১৯৯৩।

৪৪। বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৩।

৪৫। স্যার রাজারাধাকান্তদেববাহাদুরেণ, শব্দকল্প দ্রুম, কলিকাতারাজধান্যম্, ১৮৩৬।

৪৬। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান- দি ইন্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস- 'দ্বিতীয় ভাগ'।

৪৭। সম্পাদক-শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, প্রকাশক- শামসুজ্জামান খান, 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৪।

৪৮। 'শব্দার্থ প্রকাশিকা', শ্রী ক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য, প্রকাশক- শ্রী অক্ষয়কুমার রায় এণ্ড কোং- কলিকাতা- ১২৯৬।

৪৯। শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা- ১৯৪০।

৫০। অধ্যাপক সুকুমার সেন, ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০মে ২০০৩।

৫১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার- ঢাকা, ফাল্গুন- ১৪১৪।

৫২। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডি. লিট, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা- এপ্রিল- ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

A½xKvi bvgv

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ" এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক গবেষণা কাজটি করেন নাই। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন পত্র-পত্রিকাতে এ অভিসন্দর্ভ পত্রের কিয়দংশও প্রকাশ করি নাই। অভিসন্দর্ভটি জমা প্রদানের পর আইনগত কোন জটিলতা বা পরীক্ষণে বিলম্ব ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব আমি নিজে বহন করবো। এর জন্যে গবেষণা তত্ত্বাবধয়ক বা অন্য কেউ দায়ী থাকবে না।

b‡f¤i, 2013

†gvt Rwn‘j Kexi

রেজিষ্ট্রেশন নং ও সেশন- ১৭/২০০৯-২০১০

পিএইচ.ডি (গবেষক)

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

fwUqvjx Mv‡bi D™e I weKvk

ZËveavqK

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dc¯vcb

মোঃ জাহিদুল কবীর

পিএইচ.ডি (গবেষক)

রেজিষ্ট্রেশন নং ও সেশন- ১৭/২০০৯-২০১০

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

KZÁZv ¯xKvi

আমার গবেষণা পত্রটি উপস্থাপনার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার পূর্বতন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। লোকসঙ্গীত ও ভাটিয়ালী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে তিনি আমাকে অশেষ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আমার গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে অনেক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার শিক্ষক ও সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান শাহনাজ নাসরীন ইলা গবেষণা কার্যে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন।

যে সকল গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠান থেকে আমি গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহ করেছি সে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. করুণাময় গোস্বামী আমাকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রদান করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণা কর্মটির মুদ্রণ কাজ এগিয়ে নেওয়া ও এ বিষয়ে বইপত্রাদি সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন চৌধুরী, স্বরাজ কুমার দেব, কবি দ্রাবিড় সৈকত ও ফারজানা মোস্তফা ইলোরা। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

XvKv, b‡f¤i- 2013

†gvt Rwn‘j Kexi

পিএইচ.ডি (গবেষক)

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qb cÎ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ জাহিদুল কবীর, রেজিস্ট্রেশন নং ও সেশন-১৭/২০০৯-২০১০ সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত 'ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষণা কর্মটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতোপূর্বে কেউ উপস্থাপন করেননি।

†iRIqvbv †PŠaix eb¨v

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ জাহিদুল কবীর

পিএইচ.ডি

অভিসন্দর্ভ

সংগীত বিভাগ

নভেম্বর- ২০১৩